সব কিছু ভেঙে পড়ে

হুমায়ুন আজাদ

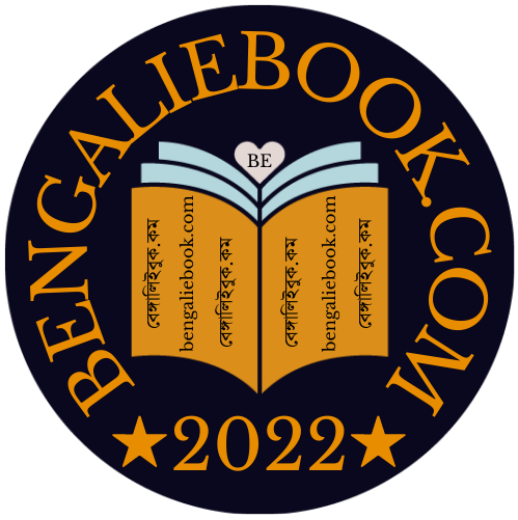

সূচিপত্র

১. আমি ব্রিজ বানাই.....2

২. মকবুল অনেক খবর রাখে.....38

৩. সন্ধ্যার পর ঘরটিতে আমরা তিনজন.....69

৪. আমি নদীর দিকে হাঁটতে থাকি.....105

৫. ফিরোজার একটি দেবর জন্ম নিয়েছে.....147

৬. মাহমুদা রহমানের বাসায় গিয়ে.....189

৭. হাঁটতে ইচ্ছে করছে আমার.....224

৮. এখন যে-ফোনটি বাজছে.....246

১. আমি ব্রিজ বানাই

আমি ব্রিজ বানাই; বলতে পারতাম সেতু বানাই, তবে সেতু কথাটি, অন্যদের মতোই, সাধারণত আমিও বলি না, বলি ব্রিজ;–ব্রিজ বললেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হয় আমার কাছে, চোখের সামনে ব্যাপারটি আর বস্তুটি দাঁড়ানো দেখতে পাই। সেতু বললে এখন আর কিছু দেখতে পাই না। বড়ো কয়েকটি ব্রিজ আমি বানিয়েছি, এখনও একটি বানাচ্ছি; কিন্তু সব সময় আমি ভয়ে থাকি ওই ব্রিজগুলো হয়তো এ-মুহূর্তেই ভয়ঙ্কর শব্দ করে ভেঙে পড়বে। তবে জানি এ-মুহূর্তে পড়বে না, যদিও পড়বে; ভবিষ্যতে ভেঙে পড়ার শব্দ এখনই আমি শুনতে পাই, দেখতে পাই তার দৃশ্যও। ছোটোবেলায় আমি একটি সাঁকো, বাঁশের পুল, নিয়ে ভেঙে পড়েছিলাম; আমার বানানো ব্রিজগুলোর পাশে সেটা কিছুই নয়, কিন্তু সব ব্রিজকেই আমার ওই সাঁকোটির মতো নড়োবড়ো মনে হয়। ব্রিজ একটি কাঠামো; সব কিছুই আমার কাছে কাঠামো;–বিশতলা টাওয়ার, জানালার গ্রিলে বৃষ্টির ফোঁটা, রাষ্ট্র, শিশিরবিন্দু, সভ্যতা, বুড়িগঙ্গার ব্রিজ, সমাজ, সংসার, বিবাহ, পনেরো বছরের বালিকা, তার বুক, দুপুরের গোলাপ, দীর্ঘশ্বাস, ধর্ম, আর একটি পর একটি মানুষ-পুরুষ, নারী, তরুণী, যুবকের সাথে আমার সম্পর্ক, অন্যদের সম্পর্ক, সব কিছুই আমার কাছে কাঠামো। কাঠামোর কাজ ভার বওয়া; যততদিন ভার বইতে পারে। ততোদিন তা টিকে থাকে; ভার বইতে না পারলে ভেঙে পড়ে। কোনো কাঠামোই চিরকাল ভার বইতে পারে না। কাঠামোগুলো যখন তৈরি করা হয়, তখন একটা ভারের হিশেব থাকে; কিন্তু দিন দিন ভার বাড়তে থাকে সেগুলোর ওপর, একদিন বাড়তি ভার আর সহ্য করা সম্ভব হয় না সেগুলোর পক্ষে। তখন ভেঙে পড়ে। সত্য হচ্ছে ভেঙে পড়া, কাঠামোর কাজ ওই ভেঙে পড়াকে, চরম সত্যকে, কিছু কালের জন্যে বিলম্বিত করা; কিন্তু একদিন সব কাঠামোই ভেঙে পড়বে। আমার পেশা ভেঙে পড়াকে একটা চমৎকার সময়ের জন্যে বিলম্বিত করা। আমার

বন্ধু কলিমুল্লাহ কবিতা পছন্দ করে;–কবিতা একদিন আমিও পছন্দ করতাম–সেও ব্রিজ বানায়, কথায় কথায় সে বলে ব্রিজ হচ্ছে নদীর ওপর লোহার সঙ্গীত, বিম-পিয়ার-স্প্যানের লিরিক; তখন আমি সঙ্গীত আর লিরিকের কাঠামোর কথা ভেবেও ভয় পাই, সঙ্গীত ও লিরিকের প্রচণ্ডভাবে ধ্বংস হওয়ার শব্দ শুনতে পাই, ভেঙে পড়ার দৃশ্য দেখতে পাই।

ব্রিজ বানাতে বানাতে আমি চারদিকে ব্রিজ দেখতে পাই, ব্রিজ খুঁজি; কোনো মানুষকে দেখলেই তার ব্যক্তিগত ব্রিজের অবস্থা কী;–সে কার সাথে কেমন ব্রিজ দিয়ে নিজেকে যুক্ত করেছে, তার খালের বা নদীর এপার-ওপারের সম্পর্ক কী, তার কতোগুলো ব্রিজ নড়োবড়ো, কতোগুলো ব্রিজ ভেঙে পড়েছে, কতোগুলো সে আবার নতুনভাবে তৈরি করার চেষ্টা করছে, তা জানতে ইচ্ছে করে; তার মুখের দিকে তাকালে অনেক ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্রিজের কাঠামো দেখতে পাই। তবে আমি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করি না। প্রত্যেকেই এমন ভাব করে যে তার প্রত্যেকটি ব্রিজ চিরকাল ধরে ঠিক আছে, চিরকাল ধরে ঠিক থাকবে; কিন্তু আমি যেহেতু কাঠামো নিয়ে কাজ করি, কী উপাদান, কতোটা টেকসই, তা আমার মোটামুটি জানা, তাই তাদের ভান দেখে আমার দুঃখ হয়। আমার ব্রিজগুলোই কি আমি ঠিকমতো রাখতে পেরেছি? নদীর ওপর বানানো আমার ব্রিজগুলোর কোনোটি আজো ভেঙে পড়ে নি; কিন্তু সেগুলোর থেকেও শক্ত উপাদানে আমি যে-সব ব্যক্তিগত ব্রিজ বানিয়েছিলাম, তার অনেকগুলোই ধসে পড়েছে; যে-ব্রিজগুলো আমার জীবনকালে হয়তো ধসে পড়বে না, সেগুলোর বিমে ফাটল ধরেছে, স্তম্ভে ভয়ঙ্কর চাপ পড়ছে; সেগুলোকে আমি টিকিয়ে রাখতে পারবো না, যদিও সবাই চায় আমি ওগুলো টিকিয়ে রাখি; কিন্তু সেগুলো যে নিরর্থক হয়ে গেছে, তা আমি ভালো করেই জানি। আমার ওই ব্রিজগুলো আছে, কিন্তু সেগুলোর ওপর দিয়ে কোনো। চলাচল নেই; তাই ওগুলো থাকার কোনো অর্থ হয় না।

কিন্তু ব্রিজ, অর্থাৎ সাঁকো, আমার ভালো লাগে। খাল, নদী, পরিখা, পুকুর হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা; ব্রিজ হচ্ছে সম্পর্ক ছেলেবেলায় সাঁকোর ওপর দিয়ে যাওয়ার জন্যে অনেক পথ ঘুরে আমি ইস্কুলে গেছি, মামাবাড়ি যাওয়ার সোজা পথে কোনো সাঁকো ছিলো না বলে সোজা পথ দিয়ে না গিয়ে আমি অনেক পথ ঘুরে গেছি, সে-পথ দিয়ে যাওয়ার সময় প্রথম একটি কাঠের সাঁকো পড়তো, তারপর অনেক দূর হাঁটার পর পড়তে একটা বড়ো লোহার পুল। মাঘ মাসেই কাঠের পুলটির নিচের খাল শুকিয়ে যেতো, সেখান দিয়ে একটা রাস্তা হতো; সবাই ওই রাস্তা দিয়েই যেতো, পুলটি দাঁড়িয়ে থাকতো। শুকনো কঙ্কালের মতো, তখন সেটি দেখে আমার কষ্ট হতো। আমি তখনও পুল দিয়েই যেতাম, যদিও যেতে আমার ভালো লাগতো না; যে-পুলের নিচে পানি নেই, তাকে পুল। মনে হতো না, তাই এক সময় আমিও পুলের নিচের রাস্তা দিয়েই যেতাম, পুলটির। দিকে তাকিয়ে কষ্ট পেতাম। লোহার পুলটি যে-দিন ভেঙে পড়লো, সেদিন আমার কষ্টের সীমা ছিলো না; ছেলেবেলায় যা কিছুকে আমার অবিনশ্বর মনে হতো, তার প্রথমেই ছিলো লোহার পুলটি;–অমন শক্ত কাঠামো তখন আমি আর দেখি নি, আমার বিশ্বাস ছিলো ওটা কখনো ভেঙে পড়বে না। লোহার পুলের কথা মনে হলেই আমার। বাবাকে মনে পড়ে, এখনও মনে পড়ছে; তার সম্পর্কে বড়ো হওয়ার পর আমি কিছু ভাবি নি, কিন্তু যখন কিশোর আমি তখন বাবাই ছিলেন আমার ভাবনার বড়ো বিষয়, ওই। লোহার পুলটির মতোই। বাবা দেখতে লোহার পুলটির মতোই বিরাট আর শক্ত ছিলেন; লুঙ্গি আর দামি পাঞ্জাবি পরতেন, হাঁটতেন সামনের দিকে একটু ঝুঁকে; কোথাও যাওয়ার। সময় তার পেছনে আমাদের শক্ত চাকরটা যেতো, তাছাড়া আরো দু-চারজন লোক তার দু-পাশে থাকতো সব সময়ই। বাবার পাশে লোকগুলোকে মানুষই মনে হতো না, নেড়ি কুকুরের মতো দেখাতো; তবে ওই লোকগুলোর মুখে আমি কোনো যন্ত্রণার ছাপ দেখতে পেতাম না, কিন্তু বাবার মুখে দেখতে পেতাম। ওই লোকগুলোর যন্ত্রণাবোধেরই শক্তিই সম্ভবত ছিলো না। রাবার সম্ভবত কোনো ব্রিজ ছিলো

না; তাঁর কাছে যারা আসতো তারা এতো সামান্য ছিলো যে বাবার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক হতেই পারে না। বাবার মুখের দিকে তাকালে আমি ব্রিজহীনতার কষ্ট দেখতে পেতাম। ছোটোবেলায়ই আমি। বুঝতে পেরেছিলাম আমরা প্রত্যেকেই খালের একপার,– খালের রূপকটিই আমার মনে হতো যেহেতু আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে একটি বড়ো খাল চলে গিয়েছিলো, তাই। অন্যপারের সাথে, অন্য কারো সাথে, অন্য অনেকের সাথে সাঁকো বাধা.দরকার; কিন্তু বাবা কোনো সাঁকো বাঁধতে পারেন নি।

আমাদের পুবের পুকুরটি বেশ বড় ছিলো, সেটি ঘিরে ছিলো অনেকগুলো ঘাট। আমাদের ঘাটটির থেকে দক্ষিণে, পুকুরটি যেখানে পুব দিকে বাঁক নিয়েছে, সেখানে। ছিলো মোল্লাবাড়ির ঘাট; ওই ঘাটে একদিন খুব ভোরবেলা, আমার যখন আট বছর বয়স হবে, আমি ওই বাড়ির একটি নতুন বউকে গোসল করতে দেখি। সে-দিন খুব। ভভারে ঘুম ভেঙে গেলে আমি আমাদের দোতলা ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুকুরের দিকে তাকাই, শুপুরি আর নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে দেখি নতুন বউটি গোসল করছে। সেটা শীতকাল ছিলো, জলের ওপর ধুয়োর মতো কুয়াশা উড়ছিলো, শিশিরে শুপুরি আর নারকেলগাছগুলো ভিজে গিয়েছিলো, সে-কনকনে ঠাণ্ডায় এতো ভোরে বউটি কেনো গোসল করে ভেবে আমি অবাক হই। বউটি গোসল করে শাড়ি বদলায়, পরার শাড়িটি পানিতে ছুঁড়ে মেরে দু-তিনবার ধোয়, তারপর শাড়িটি দু-হাতে চেপে একটি বলের। মতো বানিয়ে সিঁড়ির মাথায় রেখে দিয়ে বাড়ির দিকে চলে যায়। সে কেনো অতো ভোরে গোসল করলো? মাকে কি জিজ্ঞেস করবো ঘুম থেকে উঠলে? কিন্তু ছোটোবেলা থেকেই জিজ্ঞেস করে কোনো সত্য জানতে আমার ইচ্ছে করে না, সত্য আমি নিজে। জানতে চাই, নিজে বের করতে চাই। বিকেলবেলা আমি একবার মোল্লাবাড়ি যাই; মাঠে যাবো বলে আমি বেরিয়েছিলাম, কিন্তু মোল্লাবাড়ি গিয়ে উঠি। বউটিকে আমি আগেও দেখেছি, একদিন সে আমাদের বাড়ি এসেওছিলো; আমাকে দেখেই

সে ঘর থেকে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে। তার জড়িয়ে ধরা আমার ভালো লাগে, কিন্তু আমি নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করি। বউটি আমাকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরে, এবং আমার আরো ভালো লাগতে থাকে।

আপনি এতো ভোরে গোসল করেন কেনো?

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করি।

বউটি অবাক হয়, বিব্রত হয়, এবং হেসে ফেলে।

আমি ভোরে গোসল করি তুমি জানো কীভাবে? বউটি নিচু গলায় বলে।

ভোরে ঘুম ভাঙলে আমি বারান্দায় দাঁড়াই, তখন দেখি আপনি গোসল করছেন, আমি বলি।

নতুন বউরা ভোরেই গোসল করে, বউটি হেসে হেসে আমার গাল টিপতে টিপতে বলে, তোমার বউও ভোরে গোসল করবে।

আমি তার বাহু থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে দৌড় দিই।

নতুন বউরা কেনো ভোরবেলা গোসল করে?–প্রশ্নটি ঘুরতে থাকে আমার মাথার মধ্যে। নতুন বউরা সুন্দর থাকতে চায়, ভোরবেলা গোসল করলে বউরা সুন্দর হয়ে ওঠে; নতুন বউদের চামড়া খুব ঝলমল করে, ভোরবেলা গোসল করে বলেই হয়তো, এমন একটা

উত্তর আমার ভেতরে তৈরি হয়ে যায়। পরের দিন ভোরেও তাকে আবার আমি গোসল করতে দেখি, কুয়াশার ভেতরে সে গায়ে পানি ঢেলে গোসল করছে, তার শরীর থেকে ধুয়োর মতো কুয়াশা উড়ছে, সে বদনা দিয়ে মাথায় পানি ঢালছে, বাঁ হাত দিয়ে বারবার বুক ঘষছে, তার দু-পায়ের মাঝখানে তলপেটের দিকে পানি ঢালছে, ঘষছে, কুয়াশা উড়ছে; আমার শরীর কেনো যেনো হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে; আমি ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ি। পরে আমি বুঝতে পারি বউটির সাথে তার পুরুষটির একটি সাঁকো তৈরি হয়েছে। বিয়ে একটা ব্রিজ, এমন একটা ধারণা আমার তখনি হতে থাকে; বউটির বাড়ি শিমুলিয়া আর লোকটির বাড়ি দক্ষিণের মোল্লাবাড়ি, তাদের কখনো দেখা হয় নি, কিন্তু একটা সাঁকো তৈরি হয়ে গেছে তাদের মধ্যে, তাই তারা এখন এক ঘরে। ঘুমোয়, আর বউটি প্রত্যেক ভোরে উঠে কুয়াশার মধ্যে গোসল করে। আমি বুঝে উঠতে থাকি মানুষ দু-প্রকার, পুরুষ আর মেয়েমানুষ, আর তাদের মধ্যে একটা রহস্যজনক সাঁকো তৈরি হয়। তখন থেকে পৃথিবী আমার চোখে দু-ভাগে ভাগ হয়ে যায়, মেয়ে আর পুরুষমানুষ, এবং আমি তাদের মধ্যের ব্রিজগুলো খুঁজতে থাকি, দেখতে থাকি, মাঝেমাঝে আগুনের মতো জ্বলে উঠি আর কখনো বরফ হয়ে যাই।

পাশের বাড়ির মোহাম্মদ আবদুর রহমানদের ঘর ছিলো একটি। মোহাম্মদ আবদুর রহমানের বাবা ছিলো মৌলভি, সিলেটে চাকুরি করতো; বাড়ি আসতো আট-দশ মাস। পরপর; রহমানকে সে বাবা মোহাম্মদ আবদুর রহমান বলে ডাকতো, আমরা রহমানকে রহমান বললে আমাদের ডেকে বুঝিয়ে দিতো যে সে রহমান নয়, সে মোহাম্মদ আবদুর রহমান, তাকে ওই নামেই ডাকা উচিত, নইলে কবিরা গুনাহ হবে; সে-মোহাম্মদ। আবদুর রহমানের বাবা বাড়ি এলে একটা ঘটনা ঘটতো। মোহাম্মদ আবদুর রহমানের মাও মৌলভি ছিলো মনে হয়; মোহাম্মদ আবদুর রহমানের বাবা বাড়ি এলেই সে লম্বা। করে ঘোমটা

দিতো, সন্ধ্যার আগেই সুন্দর করে চুল আঁচড়াতো, চোখে সুরমা পরতো, আর সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর মোহাম্মদ আবদুর রহমান, তার একটি ছোটো ভাই ও একটি বড়ো বোন আমাদের পশ্চিমের ঘরে ঘুমোনোর জন্যে কাঁথাবালিশ নিয়ে উঠতো। বোনটি আমার থেকে বড়ো ছিলো, বালিশ নিয়ে এসে আমাদের ঘরে ঘুমোতে সে লজ্জা পেতো। মোহাম্মদ আবদুর রহমানের বাবা বাড়ি এলেই মোহাম্মদ আবদুর রহমানের মা। ভোরবেলা গোসল করতো, উঠোনের তারে শাড়ি ঝুলিয়ে দিতো; মোহাম্মদ আবদুর রহমানের বোনটি মায়ের ঝোলানো শাড়ি দেখে লজ্জা পেতো। কিছু দিন পর মোহাম্মদ আবদুর রহমানের বোনটির বিয়ে হয়, সেও ভোরবেলা গোসল করতে শুরু করে। ভোরবেলা গোসল করে তার কালো রঙ ঝলমল করে ওঠে। মোহাম্মদ আবদুর। রহমানের মা আর বোন কিছু দিন ধরে একই সাথে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে থাকে, ঘাটে গিয়ে একসাথে গোসল করতে থাকে; মোহাম্মদ আবদুর রহমানের বোনের গালে অনেকগুলো দাঁতের দাগ ফুটে থাকতে দেখি আমি, তবে তার মায়ের গালে কোনো দাগ দেখতে পাই না।

আমি বেড়ে উঠেছি সবুজের মধ্যে-আমাকে ঘিরে ছিলো গাছপালা; আমি বেড়ে উঠেছি নীলের নিচে-আমার মাথার ওপর ছিলো জমাট নীল রঙের আকাশ; আমি বেড়ে উঠেছি জলের আদরে-আমাকে ঘিরে ছিলো নদী, আষাঢ়ের খাল আর ভাদ্রের বিল; এবং আমি বেড়ে উঠেছি নারীপুরুষের মধ্যে আমাকে ঘিরে ছিলো নারী, পুরুষ, তাদের শরীর, কাম, ভালোবাসা। আমি গাছপালার ভেতরে ঢুকতে পেরেছি, আকাশের নিচে হাঁটতে পেরেছি, জলে সাঁতার কাটতে পেরেছি; কিন্তু নারী আর পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে ঢুকতে পারি নি; আমি বুঝতে পেরেছি ওটি নিষিদ্ধ এলাকা, ওই এলাকায় সরাসরি ঢুকতে পারা যাবে না, কারো কাছে কিছু জানতে চাওয়া যাবে না, শুধু দূর থেকে দেখতে হবে, দেখে চোখ বুজে ফেলতে হবে, এবং চোখ বুজে দেখতে হবে। আমারও একটি শরীর ছিলো, আমার

শরীরেরও কতকগুলো একান্ত ব্যাপার ছিলো-ছোটোবেলা থেকেই আমি তা বোধ করে এসেছি, কিন্তু সেগুলোর কথা কাউকে বলতে পারি নি। ক্ষুধা লাগলে বলেছি, সাথে সাথে সাড়া পড়ে গেছে; মাথা ধরলে বলেছি, তাতে আরো সাড়া পড়েছে; কিন্তু ওই ক্ষুধা আর মাথা ধরার থেকেও ভয়ঙ্কর অনেক পীড়ন আমি টের পেয়েছি আমার শরীরের ভেতর, তা আমি কাউকে বলতে পারি নি। আমি বুঝতে। পেরেছি শরীর এক মারাত্মক আগুন, প্রত্যেকটি মানুষ বয়ে বেড়ায় একেকটি লেলিহান অগ্নি। আমি পুরুষ-অগ্নি দেখেছি, নারী-অগ্নি দেখেছি, তাদের গোপন দাউদাউ জ্বলা দেখেছি, নিভে যাওয়া দেখেছি; আমার মনে হয়েছে মানুষ সম্ভবত অন্যের সাথে সবচেয়ে নিবিড় সাঁকোটি তৈরি করে শরীর দিয়ে। মানুষের শরীর খুব মারাত্মক ব্যাপার, ছোটোবেলায়ই বুঝেছি আমি। আমি শরীর দেখে, নারীর আগুন দেখে প্রথম কবে কেঁপে উঠেছিলাম? আমার মনে নেই, কারোই হয়তো মনে থাকে না; কিন্তু আজো চোখ বুজলে ঝিলিকের পর ঝিলিক দেখতে পাই। চোখ বুজে তাকালে আমি মাছরাঙা দেখতে পাই, আমের বোল দেখি, টিয়েঠুটো আমগাছে সিঁদুর দেখি, চিল দেখি, আর দেখতে পাই আমাদের কাজের মেয়ে, যে আমার থেকে অনেক বড়ো ছিলো, কদবানের বুক। ভরে দুটি সবুজ পেঁপে,–সে ঘর ঝাট দিচ্ছে, তার সবুজ পেঁপে কাঁপছে, সে গোসল। করে আমার সামনেই লাল গামছা দিয়ে মুছছে পেঁপে, আমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি। আমার অন্ধ চোখের কথা কেউ জানে না, কদবান কখনো টেরও পায় নি।

পুরুষদের আমি ছোটোবেলা থেকেই এক বিস্ময়কর প্রাণী হিশেবে দেখে এসেছি; মনে হয়েছে এর ক্ষুধাতৃষ্ণা কখনো মিটবে না। আমারও একদিন এমন ক্ষুধা দেখা দেবে ভেবে আমি ভয় পেয়েছি, উল্লাসও বোধ করেছি। আমাদের বুড়ো চাকরটি তার বউকে বেশ মারতো, তার রোগা বউটি তার ভয়ে কাঁপতো, বউর সামনে সে কখনো হাসতো না; কিন্তু কদবানকে দেখলে সে গলে যেতো, তার ভাঙা গাল হাসিতে ভরে উঠতো। কদবানের

গোসল করার সময় সে ঘাটের পাশের মরিচ আর কচু খেত নিড়াতে শুরু করতো, কচুপাতার আড়াল থেকে তাকিয়ে থাকতো কদবানের দিকে, এমনভাবে তাকাতো যেনো কিছু সে দেখতে পায় না। কদবানও তাকে খাটাতো, এবং কদবান তাকে খাটালে তার সুখের শেষ থাকতো না। কোনো কোনো দিন গোসলের পর কদবান তাকে ডাকতো, সে দৌড়ে ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হতো। কদবান তাকে শাড়ি ধুয়ে দেয়ার আদেশ দিতো, আর সে আনন্দের সাথে কদবানের শাড়ি ধুতে শুরু করতো, মনে হতো কদবানের যদি গোটাদশেক শাড়ি থাকতো তাহলে সন্ধ্যে পর্যন্ত সেগুলো ধুয়ে তার প্রাণমন ভরে উঠতো। কদবানকে একটু ছোঁয়ার জন্যে তার হাত কাপতো। কদবানের হাত থেকে হুঁকো নেয়ার সময় তার হাত কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে পড়তো কদবানের। হাতের ওপর, তখন তার হাত আর নড়তো না; কদবান ঠেলা দিয়ে তার হাতে হুঁকো। ধরিয়ে দিতো। দক্ষিণের বাড়ির শালু ফুপুর দিকে কে চঞ্চল হয়ে তাকাতো না? শালু ফুপুকে দেখলে আমি মাটির দিকে তাকিয়ে থাকতাম। চকচকে কালো ছিলো তার গায়ের রঙ, বুক দুটি সাংঘাতিকভাবে উঁচু, আর পেছনের দিকটা ভয়ঙ্কর; সে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি ঝড়ের বেগে যেতো, তার বুক ঢেউয়ের মতো কাঁপতো, তার পেছনটা নৌকোর মতো দুলতো; সে গিয়ে দাঁড়াতে কারো রান্নাঘরের দরোজায়, কারো বড়ো ঘরের দরোজায়, উঁচু গলায় কথা বলতো; আবার ঝড় জাগিয়ে অন্য কোনো বাড়িতে যেতো। আমি একদিন শুনতে পাই বাবা তাকে ডাকছেন কালো শশী বলে। শশী শব্দের অর্থ তখন আমি জেনে গেছি, কিন্তু কালো শশী শোনার পর আমার ভাবনাগুলো কেমন এলোমেলো হয়ে যায়, কালো চাঁদের কথা ভাবতে ভাবতে আমার রক্তনালি ভরে উজ্জ্বল অন্ধকার ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

ছোটো খালা বেড়াতে এলে আমাদের খুশির শেষ থাকতো না, এবং বাবাকেও খুব খুশি দেখাতো। ছোটো খালা আমাদের বাড়ি দু-এক মাস পরপরই বেড়াতে আসতো, তাকে

দেখলে আমরা সবাই খুশি হয়ে উঠতাম। তার ঝলমলে রঙ আর গোলগাল মুখ দেখে আমাদের বুক ভরে উঠতো, কেননা ছোটো খালা মানেই ছিলো আদর, আরো আদর, এবং আরো আদর। আমি তখন বড়ো হয়ে গেছি, তবু খালা আমাকে ঘষে ঘষে গোসল করিয়ে দিতো, চুল আঁচড়ে দিতো; ইস্কুলে খাওয়ার জন্যে আধুলি বা টাকা দিতো। চমৎকার চমৎকার রান্না তৈরি করতো ছোটো খালা, আনন্দে আমাদের বাড়িটা। ঝলমল করে উঠতো। সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন বাবা, যদিও তা দেখা যেতো না, কিন্তু আমি দেখতে পেতাম; ছোটো খালার নাম ধরে বাবা ডাকতেন, একটা সুর ঝরে পড়তো বাবার গলা থেকে; ছোটো খালা পাখির মতো উড়ে গিয়ে উপস্থিত হতো, কখনো পান নিয়ে কখনো তামাক নিয়ে, কখনো শুধুই একটা ঝলমলে মুখ নিয়ে। মায়ের নাম ধরে ডাকতে বাবাকে কখনো শুনি নি। মায়ের সাথে বাবার আসলে কোনো কথাই হতো না। বাবার সাথে মায়ের কোনো ঝগড়া ছিলো না, মাকে বাবা কখনো গালাগালিও করতেন না, মাকে অনেকক্ষণ না দেখলে তোর মা কইরে বলে আমার। কাছ থেকে মায়ের খবর নিতেন; কিন্তু মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বাবার মুখে কখনো আভা ফুটে উঠতে দেখি নি, আর মাকেও কখনো চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখি নি বাবাকে দেখে বা না দেখে। বাবা ও মায়ের মধ্যে যতোটুকু কথা হতো, তার সবটাই কাজের। কথা; আর কাজের কথা মানুষের বেশি থাকে না বলে তাদের বিশেষ কথাই হতো না। আমি আরো কয়েকটি বাবা আর মা দেখেছি; রফিকের, সিরাজের, রোকেয়ার মা ও বাবাকে দেখেছি, দেখে বুঝেছি মা ও বাবার কাজ মা ও বাবা হওয়া, এবং তাদের মধ্যে

এর বেশি আর কোনো সাঁকো না থাকা। রফিকের বাবা মাঝেমাঝেই মারতো ওর মাকে, আর রফিকের মা ওর বাবাকে খাইনকার পো বলে গালি দিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার জন্যে বাক্স গোছাতো, কিন্তু তার যাওয়া হতো না। অথচ ওই রফিকের বাবাই আমাদের

বাড়ি এসে মাকে ভাবিছার বলে মধুরভাবে ডাকতো, কদবানকে। তামাক সেজে আনতে বলতো, কদবানের হাত থেকে হুঁকো নেয়ার সময় অনেকক্ষণ ধরে তার বুকের দিকে তাকিয়ে থাকতো। সিরাজের বাবা সকালের খাবার খেয়েই বাজারে চলে যেতো, দুপুরের পর বাড়ি ফিরতো, আবার খেয়েই বাজারে চলে যেতো; আমরা যখনই যেতাম দেখতাম সে চায়ের দোকানে বসে আছে, চা খাচ্ছে গল্প করছে বিড়ি টানছে। সব সময়ই হাসি হাসি তার মুখ। কিন্তু সিরাজের মায়ের সাথে ধমক না দিয়ে সে কথা বলতো না।

তখন থেকেই আমার সন্দেহ হতে থাকে, সন্দেহটা গম্ভীর হতে থাকে যে বাবা ও মা হওয়ার মধ্যে কোনো একটা গভীর সংকট রয়েছে; এ-কাঠামোটি ভেতরে ভেতরে। দুর্বল, বাইরে থেকে তাকালেই শুধু মনে হয় বাবা ও মায়ের মধ্যে একটা শক্ত ব্রিজ। রয়েছে, কিন্তু ভেতরে ঢুকলে দেখা যায় অনেক আগেই ব্রিজটা নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কোনো ব্রিজ নেই, তাদের মধ্যে একটা প্রথা রয়েছে। বাবার সঙ্গে মায়েরও কোনো ব্রিজ ছিলো না, কিন্তু ছোটো খালার সাথে বাবার একটা ব্রিজ ছিলো, তা দুজনের মুখ। দেখলেই বোঝা যেতো। মাও তা বুঝতো বলেই মনে হয়, তবে মায়ের তাতে কোনো আপত্তি ছিলো বলে মনে হয় না। আমি আমাদের দোতলার দক্ষিণ দিকের একটি ঘরে থাকতাম, বাবা থাকতেন উত্তর দিকের একটি ঘরে, মা ও আমার ছোটো বোনটি একতলায় থাকতো। দোতলায় আরো একটি ঘর ছিলো, মা তাতে থাকতে পারতো, বাবা তাকে সেখানেই থাকতে বলতো, বা বাবার সাথে একই ঘরে থাকতে পারতো, কিন্তু মা বোনটিকে নিয়ে একতলায় থাকতেই পছন্দ করতো। ব্রিজ তৈরিতে মায়ের কোনো আগ্রহ আমি দেখি নি। খালাকে মা-ই মানুষ করেছে, বিয়েও দিয়েছে, খালাকে মা নিজের মেয়ের মতোই আদর করতো; এবং আমি দেখেছি খালাকে মা বাবার ঘরে পাঠিয়ে দিতো মাঝেমাঝেই কখনো পান হাতে, কখনো বাবার ঘরটি গুছিয়ে দেয়ার জন্যে, কখনো বাবার হাতপা টিপে দেয়ার জন্যে। অবশ্য

আমাদের বাড়িটা ছিলো। খালারই বাড়ি, ছোটোবেলা থেকেই আমাদের বাড়িতে আছে খালা, শুধু বিয়ে হওয়ার পর একটু দূরে সরে গেছে; তাই খালা আমাদের বাড়ির কোথায় যাবে বা যাবে না, সেটা কারো বলে দিতে হতো না; আর সে কোন ঘরে কখন কী করবে, তাও কারো বলার অপেক্ষা করতো না। আর খালার সব কিছুই এতো ঝলমলে ছিলো যে তাকে দেখলে সবাই ঝলমল করে উঠতো। আমি ঘরে ফিরে যখন দেখতাম আমার ঘরটি ঝকঝক করছে, বুঝতাম খালা আমার ঘর ঘুরে গেছে; এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই যে। খালাকে দেখতে পাবো, তাতেও নিশ্চিত থাকতাম। খালা এসে হাজির হতো, হাতে কোনো খাবার।

হাসান ভাই, মেজো কাকার ছেলে, পড়তো কলেজে, তাকে আমি তখন আমার। স্বপ্নের নায়ক মনে করতাম। তার চুল আঁচড়ানোর ভঙ্গি আমাকে মুগ্ধ করতো, হাঁটার সময় বাঁ হাতে যেভাবে লুঙ্গি ধরে হাঁটতো, তাতে মুগ্ধ হতাম। আমি তার মতো চুল আঁচড়ানোর স্বপ্ন দেখতাম, আর ঠিক করে রেখেছিলাম যখন লুঙ্গি পরবো, তখন হাসান ভাইয়ের মতো বাঁ হাতে লুঙ্গি ধরে হাঁটবো। হাসান ভাই তৃতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করেছিলো, তখন আমি তৃতীয় বিভাগ কাকে বলে বুঝতে পারি নি; ভেবেছিলাম আমি যেমন ক্লাশে থার্ড হয়েছি, হাসান ভাইও তেমনি থার্ড হয়েছে। আমাদের বাড়িতে। যে-আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছিলো, তাতে আমার সন্দেহ ছিলো না যে হাসান ভাই থার্ড হয়েছে। হাসান ভাই মুনশিগঞ্জ থেকে ফিরে এসে পাগল করার মতো গল্প শোনাতে লাগলো আমাকে। একটি মেয়ের ছবি দেখিয়ে বললো, এর নাম সুচিত্রা, সিনেমার নায়িকা। জানিস চাইলে এই মেয়েটিকে আমি বিয়ে করতে পারি। মেয়েটির মুখ দেখে। আমার বুক কাঁপছিলো, অতো সুন্দর মুখ আমি আর দেখি নি, আমার একটু ঈর্ষা হলো; কিন্তু হাসান ভাইকে আমি অবিশ্বাস করতে পারলাম না, আমার খুবই বিশ্বাস হলো যে হাসান ভাই চাইলেই ওই মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারে। হাসান ভাই বললো, তবে সিনেমার নায়িকা আমি বিয়ে

করবো না, কলেজের কতো ভালো ভালো মেয়ে আমার পেছনে ঘোরে। আমার রক্ত ঝলক দিয়ে উঠলো। তখন থেকে হাসান ভাই ঘর থেকে বেরোলেই আমাকে ডাকে, আমি তার পেছনে আর পাশেপাশে হাটি; হাসান ভাই। আমাকে একের পর এক মেয়ের গল্প শোনাতে থাকে। হাসান ভাই আমার বুকের ভেতরে মেয়ের পর মেয়ে ঢুকিয়ে দেয়, মেয়েদের মুখ ঠোঁট চুল বাহু আমার চোখে। নতুনভাবে রূপ ধরতে শুরু করে। তখন হাসান ভাইয়ের জগত মেয়েতে ভরে গেছে, মেয়ে ছাড়া তার আর কোনো কিছুতে স্বাদ নেই, কোনো কথা বলে সুখ নেই; আমিও তার কথা শোনার জন্যে ব্যাকুলতা বোধ করতে শুরু করেছি। বিকেল হলেই আমাকে বলতো, চল। কখনো সড়ক দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, কখনো নদীর পারে বসে হাসান, ভাই আমাকে তার বুক বোঝাই মেয়েদের গল্প শোনাতো।

হাসান ভাই, আপনি সব সময় মেয়েদের গল্প করেন কেনো? আমি কখনো জিজ্ঞেস করতাম।

তুই বুঝবি নারে মেয়েরা কী জিনিশ, হাসান ভাই বলতো, এই বয়সে মেয়ে ছাড়া আর কিছু ভালো লাগে না।

হাসান ভাই সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলতো, মেয়েদের কথা না ভাবলে ভাত খেতে ইচ্ছে করে না, রাতে ঘুম হয় না।

হাসান ভাইয়ের সিগারেটের গন্ধটা আমার ভালো লাগতো। এখন আমি প্রচুর সিগারেট খাই, দামি বিদেশি সিগারেট ছাড়া খাই না, কিন্তু সিগারেটে আমি কোনো স্বাদ পাই না; যখন আমার সিগারেটে স্বাদ পেতে ইচ্ছে করে তখন আমি ভাবতে থাকি হাসান ভাই নদীর

পারে বসে সিজর্স সিগারেট খাচ্ছে, আমি পাশে বসে আছি, তার সিগারেটের ধোয়ার অদ্ভুত গন্ধে আমার বুক ভরে যাচ্ছে। হাসান ভাই শেফালির গল্প করছে, নুরজাহানের গল্প করছে, বকুলের গল্প করছে, আমার রক্ত ঝিরঝির করছে। শেফালির গল্পটা তার প্রিয় ছিলো– শেফালি অর্থাৎ রবি সাহার মেয়ে শেফালি, যে হাসান ভাইয়ের সাথে পাশ করে বসে আছে, হাসান ভাই যাকে ইচ্ছে করলেই বিয়ে করতে। পারে, যে হাসান ভাইয়ের সাথে পালিয়ে যেতে চায়। শেফালিকে আমি দেখেছি, তাকে দেখতে আমারও ভালো লাগে, কার ভালো লাগে না শেফালিকে দেখতে? স্যারদেরও ভালো লাগে শেফালিকে দেখতে। হাসান ভাই শেফালির গল্প বলতে শুরু করে। শেফালি একদিন সন্ধ্যায় হাসান ভাইকে তাদের বাড়িতে যেতে বলেছে, হাসান ভাই গিয়ে দেখে বাড়িতে আর কেউ নেই-পুজো দেখার জন্যে সবাই বাজারের মন্দিরে গেছে; শেফালি হাসান ভাইয়ের জন্যে উঠোনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শেফালি চুল আঁচড়ে। বুকের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে। হাসান ভাই যেতেই শেফালি তার হাত ধরে তাকে ঘরে নিয়ে যায়, হাসান ভাই বুঝতে পারে শেফালি কী চায় হাসান ভাইয়ের কাছে। হাসান ভাই শেফালিকে জড়িয়ে ধরে, শেফালির ব্লাউজ খুলে ফেলে, দুধে হাত দিয়ে দেখে মাখনের মতো নরম। আমার চোখ তখন সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছে, কান বধির হয়ে গেছে; হাসান ভাইয়ের কোনো কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না। অন্ধকারের ভেতর কী। যেনো আমার চোখের সামনে ধবধব করছে, অন্ধকারের মধ্যে এক অসহ্য কোমলতা আমাকে ঢেকে ফেলছে।

হাসান ভাইকে আমার হিংসে হয়; আমি একবার শেফালিদির পেছনে পেছনে ইস্কুলে গিয়েছিলাম, মাথা নিচু করে হাঁটছিলাম, শেফালিদির ধবধবে পা মাটিতে পড়ছে আর উঠছে দেখে দেখে আমার চোখ দুধের রঙে ভরে গিয়েছিলো। শেফালিদির আর কিছু দেখার কথা ভাবার আমার সাহস হয় নি, কিন্তু হাসান ভাই সব দেখেছে, সব ছুঁয়েছে, আমার হিংসে

হতে থাকে। কিন্তু তখনও মেয়ে আমার রক্তের মধ্যে ঢোকে নি; কোনো মেয়ের কথা ভাবার থেকে তখনও আমি বেশি সুখ পাই মেঘের কথা ভাবতে, যে-পাখিটি গতকাল আম গাছের ডালে এসে বসেছিলো, দুটি বড়ো হলদে ডানা। ঝাঁপটাতে ঝাঁপটাতে উড়ে গিয়েছিলো, তার ডানার হলদে রঙের কথা ভাবতে। আমার, কোনো কষ্ট নেই, কিন্তু হাসান, ভাইয়ের খুব কষ্ট, আমি বুঝতে পারি; এবং আমার ভয় লাগতে থাকে একদিন আমারও এমন কষ্ট হবে। আমি দেখতে পাই আমাদের গ্রামের সবাই খুব কষ্টে আছে; বাবা কষ্টে আছেন, হাসান ভাই কষ্টে আছে, সিরাজের রফিকের বাবারা কষ্টে আছে, আমাদের শক্ত চাকরটি আর বুড়ো চাকরটি কষ্টে আছে। হাসান ভাইয়ের সাথে আমার আর বেরোনোর সাহস হয় না; বেরোলেই আমি হয়তো আরো। ভয়ঙ্কর কথা শুনতে পাবো, তাতে আমারও কষ্ট হবে। শেফালির কথা শোনার পর থেকে আমিও যেনো কষ্ট পেতে শুরু করেছি, সে-রাতে ঘুমোতে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিলো।

আমি বড়ো হতে থাকি, একের পর এক ঘটনা দেখতে পাই; ওই ঘটনাগুলো আমাকে প্রস্তুত করতে থাকে। আমি বুঝতে পারি জীবন স্তরে স্তরে সাজানো, আর ওই স্তরগুলোর মধ্যে বাইরের স্তরগুলো হচ্ছে প্রথাগত সত্য, ভেতরের স্তরগুলো আরো সত্য, যা আমরা স্বীকার করতে চাই না। আমাদের বাড়ির উত্তরে গভীর জঙ্গল, অনেক বড়ো বড়ো গাছ– আম, শিমুল, নিম, তেঁতুল, গাব, নারকেল, আর লম্বা লম্বা ঘাস, তার পর ছিলো একটি মাঠ। ওই মাঠে অনেকেই গরু চরাতো, আম্বিয়াও সেখানে গরু চরাতে। মেয়েটা একেবারেই অন্য রকম ছিলো, ওর বাবার সাথে আমাদের বাড়ি কখনো দুধ কখনো চিংড়ি মাছ বেচতে আসতো। ওর বাবা ছিলো একেবারে বুড়ো, খালে চিংড়ি ধরে বেচতো, দুধও বেচতো; গরু চরানোর দায়িত্ব ছিলো আম্বিয়ার। কাউকে দেখলেই

সে ফিকফিক করে হাসতো, ঠিকমতো কথাও বলতে পারতো না। একটা ছেঁড়া কাপড় পরতো সে, তার বুক পিঠ সবই দেখা যেতো। আমার সমান বয়সই তার, আমার। বয়সের মেয়েদের বুক উঁচু হয়েছে সারা গ্রাম ভরে, তারা যত্নের সাথে বুক ঢেকে রাখছে, কিন্তু আম্বিয়ার কোনো বুক ছিলো না; তাই ঢাকার কথাও সে ভাবে নি। তার মুখটা বাঁকা। তার দিকে তাকাতেও ইচ্ছে হতো না। এক দুপুরে আমি ওই মাঠে গেছি, গিয়ে দেখি আমাদের গ্রামের কয়েকটি বড়ো বড়ো ছেলে, যাদের আমি দাদা বলি, আম্বিয়াকে কোলে করে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আম্বিয়া চিৎকার করছে না, গালি দিচ্ছে মাঝেমাঝে। তারা আম্বিয়াকে নিয়ে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে গেলো। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, কোনো চিৎকার শুনতে পেলাম না। কিছুক্ষণ পর ওই ছেলেরা আর আম্বিয়া জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। আমি ভেবেছিলাম সে কাঁদতে থাকবে, কিন্তু। দেখি সে খলখল করে হাসছে। আমাকে দেখে বললো, তুই আইলি না ক্যান, তর। ইচ্ছা অয় না? সে খলখল করে হাসতে হাসতে তার গরুটাকে নতুন জায়গায় গোছর। দিতে দিতে বলে, কাইল তুইও আহিছ।

মামুন ছিলো ছোটো খালার ছেলে, দেখতে আমারই মতো, আমার থেকে পাঁচ বছরের ছোটো। মামুনকে আমি খুব ভালোবাসতাম দেখতে আমার মতোই ছিলো। বলে; ও আমাদের বাড়ি বেড়াতে এলে আমার পেছনেই লেগে থাকতো সব সময়। মামুনের একটা বড়ো গৌরব ছিলো সে দেখতে আমার মতো। আমি এতোবার শুনেছি যে মামুন দেখতে আমার মতো তাতে আমার ধারণা হয়ে গিয়েছিলো যে দেখতে আমার মতো হওয়া গৌরবের বিষয়। বাবা মামুনকে আমার মতোই আদর করতেন। মামুন। এলে আমরা দুজন এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি, এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গল, এক মাঠ থেকে আরেক মাঠে ছুটে বেড়াতাম। পথে পথে শুনতাম, ওরা দেখতে একই রকম; যেনো এক মায়ের পেটের ভাই।

খালা বলতো, মামুন তোর আপন ভাই, তুই ওকে দেখে রাখবি।

আমি বলতাম, আচ্ছা।

এক বিকেলে মামুন আর আমি নদীর পারের কাশবনের ভেতর দৌড়োদৌড়ি করছিলাম, তখন একটি বুড়ী আমাদের ডাকে। সে একটা বোঝা তার কাখ থেকে নামিয়ে বিশ্রাম করছিলো, এখন আর বোঝা কাঁখে তুলতে পারছে না, আমাদের সে। ডাকে তার বোঝা কাঁখে তুলে দিতে। আমি আর মামুন তার বোঝা তুলে দেয়ার পর সে দোয়া করতে করতে আমাদের ভালোভাবে দেখে। বুড়ী বাইচ্চা থাক বলে আমাদের দোয়া করে, আমার ও মামুনের মুখে হাত বুলোয়, এবং জানতে চায় আমরা একই মায়ের পেটের ভাই কিনা। আমি তাকে বলি যে আমরা একই মায়ের পেটের ভাই নই, খালাতো ভাই। বুড়ী আমাদের মুখের দিকে চেয়ে থেকে পথে চলতে শুরু করে। তার বিড়বিড় করে নিজের সাথে কথা বলার অভ্যাস ছিলো, যেমন থাকে গ্রামের সব। বুড়ীরই। আল্লার দুনিয়ায় কত দেহুম, বুড়ী ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটতে হাঁটতে বলতে থাকে, খালাতো ভাইরা দ্যাকতে একরকম, তয় মাগী দুইডা অইলেও বাপ একটাই। কত দ্যাকলাম। শুনে আমি চমকে উঠি, মামুন কিছু বুঝতে পারে নি বলে চমকায় না। নদীর পারে কাশবনে আমি গুচ্ছগুচ্ছ অন্ধকার দুলতে দেখতে থাকি, মামুনকে আমার অচেনা মনে হতে থাকে। মনে হয় আমি আর বাড়ি ফিরে যেতে পারবো না, নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। আমি বসে পড়ি, মামুন অবাক হয়ে আমার পাশে বসে। জোনাকিরা দেখা দিতে থাকে, সেগুলোকেও আমার কয়লার টুকরো মনে হয়।

রাতে ঘুমোতে আমার কষ্ট হয়, আমি ঘুমোতে পারি না। মামুন ঘুমিয়ে আছে, ওর কোনো কষ্ট হচ্ছে না। বড়ো হলে, বুঝতে পারলেই কষ্ট বাড়ে। চারপাশে অনেক রাত, এক গাছ থেকে আরেক গাছে বাদুড় উড়ে যাওয়ার শব্দ পাচ্ছি, আমি ঘর থেকে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই, পুকুরের দিকে তাকিয়ে থাকি, কোনো নতুন বউকে গোসল করতে দেখি না, বোঝা কাঁখে একটি বুড়ীকে হেঁটে যেতে দেখি। তখন দেখতে পাই। বাবার ঘর থেকে কে যেনো বেরোচ্ছে, অন্ধকারে তাকে ছায়া বলে মনে হয়, কিন্তু তাকে আমি চিনতে পারি। তার শাড়ির আঁচল জড়ানোর ভঙ্গি, হাঁটার ভঙ্গি আমি চিনতে পারি। মনে হয় সুখে ভেঙে পড়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলো। আমি চিৎকার করে উঠতে পারতাম, কিন্তু তখন আমার কণ্ঠে কোনো শব্দ ছিলো না, শরীরে কোনো রক্ত ছিলো না। বাবার মুখ আমার মনে পড়ে, তখন আমার অন্য রকম ভাবনা হয়। আগে আমার মনে হতো বাবার কোনো সাঁকো নেই, এখন মনে হতে থাকে বাবার একটি সাঁকো আছে, একথা ভেবে আমার ভালো লাগতে থাকে। তখন আমার ঘুম পায়, আমি ঘুমিয়ে পড়ি, আমার কোনো কষ্ট হয় না। ভোরে উঠে আমি, বাবাকে দেখি, ইচ্ছে করেই খালাকে দেখি; দুজনকেই আমার খুব সুখী মনে হয়, যেমন সুখী মনে হয় সাঁকোর দু-পারকে। বাবাকে আমার খারাপ লাগে না, খালাকে আমার খারাপ লাগে না। তবে কয়েক দিন ধরে ওই ঘটনাটি আমি ভাবি, আমার মনে হতে থাকে মানুষ এমনই; মনে হয় মানুষ বাইরে এক রকম, তার বাইরেরটা সত্য নয়; মানুষ ভেতরে অন্য রকম, তার ভেতরেরটাই সত্য; কিন্তু ভেতরেরটা কেউ দেখতে দেয় না। বাবার ভেতরেরটা কেউ জানে না, বাইরেরটা জানে; তার বাইরেরটা দেখে কেউ। তার সামনে কথা বলতে পারে না। ভেতরেরটা জেনে ফেললে কি সবাই বাবাকে ঘেন্না করবে, বিপদে ফেলবে? না, বাবার ভেতরেরটা আমি কাউকে জানতে দেবো না; বাবাও কখনো জানবেন না যে আমি তার ভেতরেরটা জানি।

আমার দাদা খুন হয়েছিলেন, ছোটোবেলা থেকেই আমি তার কথা শুনে এসেছি। তিনি খুন হয়েছিলেন বলে তাকে আমার মহাপুরুষ মনে হতো; আমি মনে করতাম। কেউ খুব বড়ো হয়ে গেলে ছোটোরা তার বিরুদ্ধে চলে যায়, তাকে সহ্য করতে পারে না, তখন ছোটোরা তাকে খুন করে। খুন করে ছোটোরা নিজেদের বড়ো করে তোলে নিজেদের কাছে। দাদার যে-বর্ণনা বারবার আমি শুনেছি তাতে তাকে মহাপুরুষ না। ভাবার কোনো উপায়ই আমার ছিলো না। তিনি দেখতে বড়ো ছিলেন, চারপাঁচজন তার সাথে জোরে পারতো না; তিনি অল্প বয়সেই ধানের ব্যবসা করে অনেক টাকা। করেছিলেন, ওই টাকা দিয়ে বিলে কিনেছিলেন কানি কানি জমি আর দিঘি। তার খুনের পর পঞ্চাশটা সিন্দুক ভেঙে পুলিশের লোকেরা মনের পর মন রুপোর টাকা বের। করেছিলো, ঘোড়ায় করে সেগুলো নিয়ে গিয়েছিলো। এক রাতে তিনি খুন হয়ে যান। সে-সন্ধ্যায় তিনি খাওয়াদাওয়া করে বাইরে যান, রাতে জঙ্গলের পাশের পথে খুনীরা। তাকে খুন করে ফেলে রাখে। তার গলা থেকে শরীর আলাদা করে দেয়। তবে তাঁকে খুন করার জন্যে কেউ শাস্তি পায় নি, কেউ ধরা পড়ে নি। একদিন আমি একটা সিন্দুক খুলে কতকগুলো পুরোনো কাগজ পাই, মোটা মোটা মসৃণ ঘিয়ে রঙের কাগজ, তার। ভেতরে আরো কতকগুলো কাগজ। কাগজগুলো খুলে দেখি দাদার খুনের মামলার কাগজপত্র ওগুলো। আমি পড়তে শুরু করি, একজায়গায় এসে আমি চঞ্চল হয়ে উঠি।

উকিল দাদীকে জিজ্ঞেস করছে, আপনার স্বামী সেই সন্ধ্যায় কী খেয়েছিলেন?

দাদী বলছেন, মাছ, ভাত, দুধ, মধু।

উকিল বলছে, আপনার স্বামীর পেটে পিঠা পাওয়া গেছে, আপনি কি তাঁকে পিঠা খাইয়েছিলেন?

দাদী বলছেন, না।

উকিল বলছে, ধর্মাবতার, এই লোকের চরিত্র ভালো ছিলো না। এই লোক সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গ্রামেরই কোণায় তার উপপত্নীর বাড়ি যায়। সইজুদ্দিন জোলার বউ তার উপপত্নী ছিলো একথা গ্রামের সবাই জানে।

দাদার দুটি বউ ছিলো, এক দাদীকে আমিও দেখেছি–বেশ সুন্দর; তবু তিনি সইজুদ্দিন জোলার বউয়ের কাছে যেতেন এটা আমাকে অবাক করে। সইজুদ্দিন জোলার বউ বেঁচে আছে, তাকে আমি দেখেছি; কালো কুচকুচে, ঘেন্না হয়। দাদা তার কাছে যেতেন, কেনো যেতেন? সইজুদ্দিন জোলার বউর কী ছিলো যে দাদা দুটি বউকে রেখে তার কাছে যেতেন? দাদাও কি কোনো সাঁকো ছিলো না, তিনি তো দুটি সাঁকো বাঁধার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু একটিও বাঁধতে খারেন নি? কোনো পুরুষই কি ঠিকমতো সকো বাঁধতে পারে না? নাকি বাঁধা সাঁকো তাকে আর আকর্ষণ করে না? তখন দিকে দিকে ছুটতে থাকে? বাবার সাথে খালার একটা সাঁকো আছে, মায়ের সাথে বাবার। কোনো সাঁকো নেই; বাবার জন্যে আমার মায়া হয়, মায়ের জন্যে আমার মায়া হয়। নবম শ্রেণীতে ওঠার পর থেকে আমি প্রায় সবই বুঝি, কিন্তু আমি কাউকে বুঝতে দিই নি যে আমি বুঝি; তাতে তারা বিব্রত বোধ করতো, তাদের গোপনে গড়ে তোলা সাঁকোগুলো নড়োবড়ো হয়ে উঠতো। তখন থেকেই আমার এমন একটি বোধ জন্মে যে মানুষের কোনো স্খলন দেখেই উত্তেজিত হওয়ার কোনো অর্থ

হয় না, মানুষ এমন প্রাণী যা কোনো ছক অনুসারে চলতে পারে না। কিন্তু মানুষ ছকের কথা বলতে, আর ছক। তৈরি করতে খুব পছন্দ করে।

সে-সন্ধ্যায় হাসান ভাইয়ের ঘরে না গেলে ভালো হতো, কিন্তু আমি যে গিয়েছিলাম এতে আমার কোনো অপরাধবোধ হয় নি; বরং মনে হয়েছে না গেলে আমি জীবনের। একটি সোনালি খণ্ড হারাতাম। এমন সুন্দর একটি দৃশ্য কখনো দেখতে পেতাম না। সে-দিন ঈদের চাঁদ উঠেছিলো, আমার রক্তে ঝলক লেগেছিলো; চাঁদ ওঠার সন্ধ্যায়। আমি বন্ধুদের সাথে বাড়ি বাড়ি বেড়ানোর অধিকার পেতাম। বাড়ি বাড়ি বেড়িয়ে সন্ধ্যার বেশ পরে ঘরে ফিরে দেখি বাবা নেই, মা শুয়ে আছে, ঈদের সব আয়োজন করা হয়ে। গেছে, এবং আমার কিছু করার নেই। তখন আমি হাসান ভাইদের দোতলায় যাই, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠি, হাসান ভাইয়ের ঘরের দরোজা ঠেলে ঢুকি। আমি ঢুকতেই হাসান। ভাই আর কদবান মেজে থেকে লাফিয়ে ওঠে। দুজন উলঙ্গ মানুষকে লাফিয়ে উঠতে। দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিলো। হাসান ভাই তার লুঙ্গিটা ধরে খাটের ওপর উঠে দুটি বালিশ জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ে। আমি দাঁড়িয়ে থাকি। কদবান তার শাড়ি আর। ব্লাউজ পরার চেষ্টা করে। তার নতুন লাল শাড়ি আর ব্লাউজ থেকে একটা অদ্ভুত সুগন্ধ ভেসে আসতে থাকে আমার দিকে। কদবান শাড়ি পরতে গিয়ে বারবার ভুল করে, তার শাড়ি খসে পড়ে যেতে থাকে। তার বুকের সবুজ পেপে দুটি দেখে আমার চোখ মুগ্ধ। হয়, এই প্রথম আমি চোখের সামনে সম্পূর্ণ মুক্ত বুকের পেঁপে দেখতে পাই। কদবান কিছুতেই ব্লাউজ পরে উঠতে পারে না, পরার চেষ্টা করতেই তাঁর সবুজ পেঁপের বাগান ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে ওঠে। কদবানের পেঁপের দিকে লক্ষ বছর ধরে আমার থাকিয়ে থাকার ইচ্ছে হয়; কিন্তু আমি বেরিয়ে আসি।

আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাসান ভাইয়ের সুচিত্রা, শেফালি, নুরজাহান, বকুলের কথা ভাবতে থাকি। তারা কি সত্য হাসান ভাইয়ের জীবনে? শেফালিদির সাথে এক সন্ধ্যায়। তার যা ঘটেছিলো, তা কি সত্য? তা কি সত্য নয়? শেফালিদিদের বাড়ি কি হাসান ভাই কখনো গেছে। আমার মন বলতে থাকে, হাসান ভাই কখনো ওই বাড়িতে যায় নি। শেফালি হাসান ভাইয়ের জন্যে কখনো কোনো সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে থাকে নি, হাসান ভাই কখনো শেফালির শাড়ির ভেতর হাত দেয় নি। সত্যি কি দেয় নি? আমি জানি না, আমি জানি না। এমন সময় হাসান ভাই আমার ঘরে ঢোকে। হাসান ভাই আমার দু-হাত তার দু-মুঠোতে ধরে মাথা নিচু করে বসে থাকে, কোনো কথা বলতে পারে না। আমি তার মুখের দিকে তাকাই; হাসান ভাইয়ের মুখ দেখে আমার কষ্ট হয়।

কোনোদিন বলবো না, আমি বলি।

হাসান ভাই আমার হাত ধরে মাথা নিচু করে বসে থাকে। তার মাথা নিচু থেকে আরো নিচুতে নামতে থাকে; আমার মনে হয় নামতে নামতে হাসান ভাইয়ের মাথা আমার পায়ের কাছে নেমে যাবে। আমার খুব কষ্ট হতে থাকে, হাসান ভাইয়ের মাথা। আমি এতো নিচুতে দেখতে চাই না।

কোনোদিন বলব না, আমি আবার বলি।

আমি কদবানকে বিয়ে করবো, হাসান ভাই বলে। তার চোখের জলের ফোঁটা আমার হাতে লাগে।

কেউ রাজি হবে না, আমি বলি।

একমাসও যায় নি তারপর, কদবান একদিন রান্নাঘরের মেজের ওপর পড়ে যায়, বমি করতে থাকে। দু-দিন আমাদের বাড়িটা বেশ থমথম করে। তার পরদিন ভোরে উঠে দেখি কদবান নেই। কিন্তু আমরা কেউ কোনো প্রশ্ন করি নি। কেউ কারো কাছে। জানতে চায় নি কদবান কোথায়? কদবানের এক ভাই আমাদের বাড়িতে মাঝেমাঝে কাজ করতো, সেও কখনো কদবানের নাম উচ্চারণ করে নি। আমি কখনো কদবানের নাম বলি নি, মা কখনো কদবানের নাম বলে নি, বাবা কখনো কদবানের নাম বলেন। নি। আমাদের বাড়িতে যারা আসতো, তারা কখনো কদবানের নাম বলে নি। যেনো কদবান পৃথিবীতে কখনো ছিলো না। মাঝেমাঝে আমার মনে প্রশ্ন জাগতো, কদবান কি পৃথিবীতে এখনো আছে? কদবানের জন্যে শোকে আমার বুক ভরে গিয়েছিলো, আমি তার ঝকঝকে কালো রঙের সৌন্দর্য দেখে দেখে বেড়ে উঠেছিলাম, তার সবুজ পেঁপে আমার চোখে রূপের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলো। কদবানকে মনে হলে আজো আমার চোখের সামনে সবুজ পেঁপেভরা পেঁপে গাছ দুলে ওঠে।

যাকে দেখে প্রথম আমি সৌন্দর্যকে দেখি তার নাম তিনু আপা। তাঁর হাতপামুখ। ছিলো ঘন দুধ দিয়ে তৈরি, আমার তাই মনে হতো; এবং আমার মনে হতো তার শরীরে কোনো হাড় ছিলো না। চাঁদের থেকেও ধবধবে আর গোল ছিলো তার মুখ। একটি খালের উত্তর পাশে ছিলো তাদের বাড়ি, শুপুরি আর নারকেল গাছ দিয়ে ঘেরা। তিনু আপা বিকেলে সুন্দর শাড়ি পরে সামনের দিকে ফুলিয়ে চুল আঁচড়িয়ে মুখভরা মিষ্টি হাসি স্থির করে রেখে তাদের ডালিম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে খাল ও খাল পেরিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। আমি কোনো কোনো বিকেলে তাঁদের বাড়ির ভেতরের পথ দিয়ে যেতাম, দেখতাম তিনু

আপা দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে মিষ্টি করে হাসতেন তিনু আপা। আমি মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকাতাম, দেখতাম তার পায়ের পাতার আলোতে মাটি দুধের মতো হয়ে গেছে। তিনু আপা কখনো হাত উঁচু। করে ডালিম গাছের ডাল ধরে কথা বলতেন আমার সাথে, আমি দেখতাম তার লাল ব্লাউজ উপচে ঘন দুধ গলে পড়ছে। তিনু আপা একবার আমার হাত দেখতে চেয়েছিলেন, আমি হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম, তার আঙুলগুলো আমার আঙুল আর। মুঠোতে ঘন দুধের মতো জড়িয়ে যাচ্ছিলো; আমি মনে মনে চাইছিলাম তিনু আপা যেনো আমার হাত কখনো না ছাড়েন। তিনু আপার সাথে আমি এক্কাদোক্কা খেলতাম কখনো কখনো, আমি মনপ্রাণ দিয়ে খেলতাম, কিন্তু আমার খেলার থেকে তিনু আপার। খেলা দেখতেই বেশি ভালো লাগতো। তিনু আপা যেভাবে চাড়া ছুঁড়তেন, তার ডান হাত যেভাবে নিচু থেকে ওপরের দিকে উঠতো, চাড়া কোনো ঘরে পড়ার পর তার ঠোঁট যেভাবে নড়তো, তাতে আমার নিশ্বাস থেমে যেতে চাইতো। সবচেয়ে সুন্দর ছিলো ঘর থেকে ঘরে তাঁর লাফিয়ে চলা। তিনি যখন ঘর থেকে ঘরে লাফিয়ে যেতেন, একটুও শব্দ হতো না; তার পা একরাশ শিউলিফুলের মতো মাটির ওপর ঝরে পড়তো, তিনু আপা মাটির ওপর শিউলি ঝরিয়ে ঝরিয়ে ঘর থেকে ঘরে লাফিয়ে যেতেন। লাফানোর সময় তার শরীরটি ঢেউয়ের মতো দুলতো, আমি চোখের সামনে দুধসাগরের ক্ষীরসাগরের ঢেউ দেখতে পেতাম; বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়ার পরও আমার চোখে দুধসাগর ক্ষীরসাগর দুলতে থাকতো। দুধের ঢেউয়ের মতো আমার চোখে ঘুম। নামতো।

তিনু আপার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে–খবরটি আমি এক বিকেলে জানতে পাই, আমার বুক হঠাৎ কেঁপে ওঠে, আমি খুব কষ্ট বোধ করি। আমি ভেবেছিলাম তাঁকে ডালিম গাছের নিচে দেখতে পাবো, কিন্তু পাই না, তার বদলে খবরটি পাই; আমার বিকেলটি ঘোলা হয়ে উঠতে থাকে। মাঠে না গিয়ে আমি নদীর পারের দিকে চলে। যাই, গাছপালা নদীর ঢেউয়ে আমি

কোনো সৌন্দর্য দেখতে পাই না। আমি তিনু আপার ঠোঁট দেখতে পাই, মনে হতে থাকে নদীর আকাশে তিনু আপার ঠোঁট ঝিলিক দিয়ে। উঠছে; আমি তার বাহু দেখতে পাই, নদীর ঢেউয়ে তার বাহু দুলে উঠতে দেখি; তার। ধবধবে দুধের মতো দেহটি আমার সামনে ঘর থেকে ঘরে লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে। থাকে। আমি দেখতে পাই তিনি লাফিয়ে চলছেন আর তার পেছনের দিকটি নদীর ঢেউয়ের ওপর সোনার কলসির মতো দুলছে। সে-রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখি; দেখতে পাই তিনু আপাকে নিয়ে আমি খুব দূরে কোথাও চলে গেছি; তিনু আপা বলছেন, তুমি আমাকে নিয়ে খুব দূরে কোথাও চলো, আমি তাঁকে নিয়ে দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছি, দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। তিনু আপা আর হাঁটতে পারছেন না, আমার হাত ধরে হাঁটছেন; শেষে আমার বুকের ওপর লুটিয়ে পড়লেন।

সেই প্রথম আমি বিষণ্ণতা বোধ কৃরি, এর আগে এমন কিছু আমি অনুভব করি নি। আগে আমি আনন্দ আর সুখ বোধ করেছি, শরীরে আর মনে কষ্টও পেয়েছি, কিন্তু কোনো কিছু ভালো না লাগার অনুভূতি আমার হয় নি। তখন আমি সব কিছু অস্পষ্ট। দেখতে থাকি, আমার চোখের ওপর একটি কুয়াশার পর্দা লেগে থাকে সব সময়, মনে হতে থাকে আমি কাউকে চিনি না, আমার কোনো বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই। বড়ো একলা লাগতে থাকে। আমি নদীর পারে একা একা হাঁটতে থাকি, বই পড়তে পারি না, ঘুমোতে আমার কষ্ট হয়। আমার শরীর ব্যথা করতে শুরু করে; তখন আমি আর তিনু। আপাকে দেখতে পাই না, একটা অচেনা লোককে দেখতে পাই, দেখি লোকটি তিনু আপার পাশে শুয়ে আছে। আমার খুব কষ্ট হতে থাকে, আমি ঘুমোতে চাই, ঘুমোতে পারি না; মনে হতে থাকে জীবনেও আমার কখনো ঘুম আসবে না। কিন্তু আমাকে ঘুমোতে হবে, নইলে আমি বাঁচবো না। আমি আমার শরীরের ওপর হাত বুলোতে থাকি; মাথা, মুখ, বাহু, উরুতে হাত বুলোতে থাকি; এক সময় আমার হাত দু-পায়ের মাঝখানের অঙ্গটির ওপর গিয়ে পড়ে। আমার হাত ওটির

কঠিনতা বোধ করতে শুরু করে, এর আগে আমি ওটি ছুঁতে লজ্জা পেয়েছি, কিন্তু আজ ওর কঠিনতা থেকে আমি সরে আসতে পারি না, আমি ওকে বারবার ছুঁতে থাকি, তিনু আপা একবার যেমন করে আমার আঙুল নেড়েছিলেন, আমি তেমনভাবে নাড়তে থাকি, আমার ঘুম পেতে থাকে, নদীর ঢেউয়ে আমি ভাসতে থাকি। আমার আকাশে বিদ্যুৎ ঝলক দিয়ে উঠতে থাকে, আমি ক্ষীরসাগরে সাঁতার কাটতে থাকি, এক সময় আকাশপাতালসূর্যচাঁদ ভেঙেচুড়ে আমি কাঁপতে থাকি, আমার ভেতর থেকে সূর্যচাঁদরা গলগল করে বেরোতে থাকে। আমি কোমল আগুনের শিখার ওপর ঘুমিয়ে পড়ি।

সেবার আমি একলা বেড়াতে যাই রাজবাড়ি, মেজো বোনের বাসায়। এর আগে দুবার আমি ওই শহরে গেছি, তাই একলা আমি যেতে পারবো এতে কেউ সন্দেহ করে না; আমারও ভালো লাগে যে আমি একলা যাচ্ছি। বাঘড়া থেকে আমি গাজি ইস্টিমারে উঠি, বাবা আমাকে ইস্টিমারে উঠিয়ে দিয়ে যান। আমি ওপরের ডেকে উঠে কোনো জায়গা পাই না, দিকে দিকে সবাই বিছানা পেতে শুয়ে আছে, বসে আছে; কোথাও একটু জায়গা নেই। আমি সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকি। একটি লোক আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। লোকটি দেখতে বেশ ভালো, মুখে অল্প দাড়ি আছে, মাথায় টুপিও রয়েছে। বয়সে বাবার মতোই হবে। লোকটিকে আমার ভালোই লাগে। আমি কেনো দাঁড়িয়ে আছি সে জানতে চায়। সে আমাকে বলে তার বিছানার পাশে জায়গা আছে, আমি। সেখানে গিয়ে বিছানা পেতে শুতে পারি। নানা দিক ঘুরে, অনেক মানুষ পেরিয়ে, সে ডেকের শেষ দিকে নিয়ে যায় আমাকে; সেখানে তার বেশ বড়ো বিছানাটি পাতা। রয়েছে। বিছানার পাশে জায়গাও রয়েছে। সে তার বিছানাটি কিছুটা গুটিয়ে আরো। জায়গা করে দেয়; আমি সেখানে আমার বিছানা পাতি। সে চা আনায়, আমি তাকে বলি যে আমি চা খাই না; কিন্তু কুকিজটি খেতে সে আমাকে বাধ্য করে। সে জাহাজের রেস্টুরেন্টের লোকটিকে বারবার ডেকে কুকিজ আনতে

বলে, কুকিজটি সে আমার হাতে গুঁজে দেয়, সেটি না খেলে খুব খারাপ দেখায় বলে আমি সেটি খাই। কুকিজ খেতে। অবশ্য আমার সব সময়ই ভালো লাগে। লোকটিকেও আমার খারাপ লাগে না। লোকটি বলে আমার সমান তারও একটি ছেলে রয়েছে, সেও টেনেই পড়ে। তখন বেশ রাত, ইস্টিমারের শব্দ আর ঘোলাটে আলোতে সব কিছু আমার অদ্ভুত লাগছে। লোকটি গৃমিয়ে পড়েছে মনে হয়, কিন্তু আমার শুতে ইচ্ছে করছে না। দিকে দিকে লোকেরা ঘুমিয়ে পড়ছে, তাদের ঘুমোনোর ভঙ্গি দেখে মনে হয় তারা সারাজীবনে ঘুমোয় নি, আজই প্রথম ইস্টিমারে উঠে ঘুমোনোর সুখ পেয়েছে। আমিও এক সময় ঘুমিয়ে পড়ি। একটু শীত লাগে, ঘুমের ঘোরে আমার মনে হয় কে যেনো আমার গায়ে চাদর বিছিয়ে দিচ্ছে, তাতে আমার ঘুমিয়ে পড়তে আরো ভালো লাগে। ঘুমের ঘোরে আমি টের পাই একটি হাত আমার হাফপ্যান্টের সামনের দিকের বোতাম খুলছে, আমি হাত দিয়ে হাতটি সরিয়ে দিই; কিন্তু হাতটি আবার সামনের দিক দিয়ে ঢুকে আমার অঙ্গটিকে। নাড়তে থাকে। আমি হঠাৎ উঠে বসে আমার হাফপ্যান্টের সামনের দিকে হাত দিই, লোকটি দ্রুত হাত সরিয়ে নেয়, দেখি আমার হাফপ্যান্টের বোতামগুলো খোলা। আমি ঘুম থেকে উঠে বসে থাকি, লোকটি অন্য দিকে মুখ দিয়ে ঘুমোতে থাকে। ভোর হলে সে অজু করে নামাজ পড়ে, আমার সাথে কোনো কথা বলে না।

আমার বোনের বাসা ছিলো রেলকলোনির পাশে। আমি তখন সাইকেল চালাতে শিখেছি। দুলাভাইয়ের একটি সাইকেল ছিলো, সেটি নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়তাম; খুব ভালো লাগতো আমার রেলকলোনির পাশের গুঁড়োগুড়ো কয়লাবিছানো পথে সাইকেল চালাতে। খুব মসৃণ ছিলো ওই পথ, একটুও ঝাঁকুনি লাগতো না। একদিন সাইকেলের চেইন পড়ে যায়, একটি লোক এসে আমাকে চেইন লাগাতে সাহায্য করে। তার সাহায্য আমি চাই নি, সে নিজেই আসে, চেইন লাগিয়ে দেয়, এবং আমাকে পাশের দোকানে নিয়ে চা খাওয়াতে চায়।

লোকটির কথা শুনে আমি বুঝতে পারি সে বিহারি, আমার ভয় লাগে, আর চা আমি খাইওনা, তাই তার সাথে আমি যাই নি। লোকটি বলে সে রেলে কাজ করে, আমি চাইলে সে আমাকে ট্রলিতে করে বেরিয়ে আনতে পারে। ট্রলিতে চড়ার সখ ছিলো আমার;– সাইকেল চালাতে চালাতে আমি দেখেছি। রেলের লোকেরা ট্রলিতে করে সাঁই সাঁই করে ইস্টিশনের দিকে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। একদিন বিকেলে সে আমাকে ট্রলিতে করে বেড়াতে নিয়ে যায়; তার সাথে আমি কয়েকবার ইস্টিশনের দিকে যাই, আবার ফিরে আসি। তাকে আমার বেশ ভালো লাগে। পরের দিন দুপুরে সে আমাকে তার বাসায় নিমন্ত্রণ করে। ওই কলোনির সব বাসাই ছিলো মূলিবাঁশের, আমাকে সে তার বাসাটি দেখিয়ে দেয়। পরের দিন দুপুরে আমি তার বাসায় যাই। আমি ঢুকতেই সে ঠেলে দরোজা বন্ধ করে দেয়, আমি অবাক হই; এবং সে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ভয় পাই, সে আমাকে নিয়ে মেজের ওপর গড়িয়ে পড়ে; আমি টের পাই সে তার একটি বিশাল শক্ত অঙ্গ আমার গায়ে লাগাতে চাচ্ছে। আমি তার অঙ্গটিকে ডান মুঠোতে শক্ত করে ধরে ফেলি, নখ বিধিয়ে দিই; বাঁ হাত দিয়ে তার অণ্ড দুটিকে চেপে ধরি। গো গোঁ করে সে মেজের ওপর উল্টে পড়ে। আমি দরোজা খুলে বাইরে বেরোই, আস্তে আস্তে বাসার দিকে হাঁটতে থাকি।

আমার পনেরো বছর হতে না হতেই অনেক কিছুই ভেঙে পড়ে আমার চোখের সামনে, আমার মনের ভেতরে। আমি, সব সময়ই, চারপাশে অনেক ভালো ভালো কথা শুনতে পাই, শুনে আমার কেমন হাসি পায়, যদিও আমি হাসি না। বইয়েও আমি অনেক ভালো ভালো কথা পড়ি, পড়ে আমার হাসি পায়। আমার মনে হতে থাকে মানুষ ভালো ভালো কথা বলতে পছন্দ করে, এটা মানুষের স্বভাব; কিন্তু মানুষ দুর্বল প্রাণী। আমাদের বাড়ি থেকে তাকালে উত্তর দিকে একটা মঠ দেখা যেতো, আমার মনে হতো মঠটি এখনই ভেঙে

পড়বে; একবার আমি একটি মসজিদে শিরনি দিতে গিয়েছিলাম, মৌলভির হাতে গামলাটি দিয়েই আমি দৌড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম, মনে হচ্ছিলো ওই পুরোনো দালানটি এখনই ভেঙে পড়বে। ওই দুটির কোনোটিই হয়তো এখনো ভেঙে পড়ে নি, হয়তো পড়েছে, অনেক দিন ওগুলোর কথা আমার মনে পড়ে নি।

আমার ভেতর একটি লাল ক্ষুধা জেগে উঠছে, তার সাথে পেরে উঠছি না আমি, টের পাচ্ছি আমি ভাঙছি; আমার ভেতরে ভাঙন শুরু হয়েছে, আমি তার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ওই ভাঙনের শব্দ অত্যন্ত মধুর, আমি সারাক্ষণ ব্যাকুল হয়ে থাকছি ওই ভাঙনের শব্দ শোনার জন্যে। সব কিছু আমার অন্য রকম লাগতে শুরু হয়েছে। মা সব সময় শুয়ে থাকে, যখনই ঘর থেকে বেরোই দেখি শুয়ে আছে, যখন ফিরি দেখি শুয়ে আছে। মা খুব ক্লান্ত, মা সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। মা অনেক সময় মেজেতে শুয়ে থাকছে, রান্নাঘরের খাটালেও শুয়ে থাকছে কখনো। অথচ মার জন্যে আমার মায়া হচ্ছে না; আমি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছি আসছি, তাকে ডাকতেও ইচ্ছে করছে না। মাও আমাকে বেশি ডাকছে না আজকাল, মা খুব ক্লান্ত। বাবাকে বাড়িতে দেখি না, বাবাও ভেঙে গেছেন আরো; তারা ভেঙে গেছেন, এবং আমি ভাঙছি। আমার ভাঙন তাঁদের ভাঙনের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি রক্তে কাপন বোধ করছি, আমার রক্ত উলঙ্গ পাগল হয়ে গেছে, আমি তার কলকল প্রবাহের শব্দ শুনছি; রক্তের ঘর্ষণে আমার গায়ের ত্বক অ্যালিউমিনিআমের মতো উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। আমি যেখান দিয়ে যাই, আমার মনে হয়, সেখানকার বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠছে আমারই রক্তের মতো; পুকুরে নামলে মনে হয়। পুকুর হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠলো, পুকুরের পানি গর্জন করে উঠলো আমার রক্তের মতো।

আমি নিজে নিজে সুখ পেতে শুরু করেছি; নিজের শরীরের ভেতরে যে এতো শিমুল বন ছিলো, সেখানে মধুর চাক ছিলো, তাতে এতো মধু ছিলো, সে-মধুর চাক ভাঙতে যে এতো সুখ, তা আমার জানা ছিলো না। জানার পর আমি আমার ভেতরের মধুর চাক। ভাঙতে শুরু করি, ভেতর থেকে জমাট মধু বের হয়ে আসতে থাকে। বোশেখের রোদে হেঁটে হেঁটে একবার আমি বিলের ভিটায় যাই, চারপাশে গলানো পারদের মতো রোদ, ভিটায় একটি বড়ো কাঠবাদামের গাছ, তার পাশে একটি ঝোঁপ, আর ঝোঁপের পাশে সবুজ ছায়ার অন্ধকার। আমি সে-ছায়ায় বসে রোদ পান করতে থাকি, আমি রোদের স্তরের ওপর রোদের স্তর দেখতে থাকি, রোদ রসের মতো লোমকূপের ছিদ্র দিয়ে আমার ভেতরে ঢুকতে থাকে। দূরে অনেকগুলো গরু চরছে, কোনো রাখাল দেখা যাচ্ছে না, বোরোধানের খেতের ভেতরে সবুজ আগুন জ্বলছে। আমার ভেতরে আগুন লেগে যায়। আমি আমার মধুর চাকে হাত দিই, বিলকিসকে মনে পড়ে, যাকে আমি দু-দিন আগে। পুকুরে গোসল করতে দেখেছি, কদবানের পেঁপে দুটিকে আমার সবুজ মনে হতো, বিলকিসের দুটিকে আমার সবুজ মনে হয় নি, পেঁপে মনে হয় নি, শ্রাবণের আকাশের ভেজা চাঁদ মনে হয়েছে, আমার ভেতর থেকে গলগল করে মধু বেরিয়ে আসতে থাকে। কাঠবাদাম গাছের পাশের ঝোপে আমি মধুর প্লাবনে ডুবে যাই।

আমার রক্তের মধু প্রাণ ভরে পান করেছি আমি, আমার রক্তমাংস আষাঢ়ের আকাশের মতো বস্ত্র ও বিদ্যুতে খানখান ফালাফালা হয়ে গেছে, আমার ভেতর থেকে নালি বেয়ে বেয়ে মধু ঝরেছে। একটি ধর্মের বই তখন হাতে আসে আমার, তাতে আমি পড়ি ওইভাবে চাক ভেঙে মধু বের করা পাপ, তখন আমার ভয় লাগতে থাকে, দোজগের আগুন দেখতে পাই, কেননা বইটি ভরেই জ্বলছিলো দোজগের আগুন। কিন্তু পাপ আর দোজগের আগুন ওই মধুর প্লাবনে বারবার নিভে যেতে থাকে। সুন্দরের মধ্যে গেলেই আমার ইচ্ছে হতো

চাক ভাঙতে। একবার দুপুরে আমার ডাব খেতে ইচ্ছে হয়; আমি আমাদের নারকেল বাগানে যাই। একটি নারকেল গাছ বেয়ে বেয়ে আমি উঠতে থাকি। গাছটিকে জড়িয়ে ধরতেই আমার কেমন যেনো লাগে, একটু ওপরে উঠতেই আমার ভালো লাগতে থাকে গাছটিকে জড়িয়ে ধরে থাকতে, আমি খুব কোমলভাবে গাছটিকে জড়িয়ে ধরি, কোমলভাবে একটু একটু করে ওপরের দিকে উঠি, গাছটিকে। আমার আর গাছ মনে হয় না, বিলকিস মনে হয় কদবান মনে হয় তিনু আপা মনে হয়, আমি চোখে জ্বলজ্বলে অন্ধকার দেখতে থাকি, আমার সমগ্র জগত অন্ধকার হয়ে ওঠে, আমার তীব্র আলিঙ্গনে গাছটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, আমি গাছটিকে জড়িয়ে ধরে। গাছের গায়েই যেনো ঘুমিয়ে পড়ি। একবার পদ্মার পারে বিকেলবেলা গিয়ে দাঁড়াই। আমি। আমার পেছনে নারকেল গাছের সারি, আমার পায়ের নিচে কোমল বেলেমাটি, দূরে নদীতে ছোটো ছোটো নৌকো ভাসছে-জেলেরা ইলিশ ধরছে। কিছুক্ষণ পর তাকিয়ে। দেখি পদ্মার জল গলানো সিঁদুরের মতো হয়ে গেছে, পশ্চিমের আকাশ ছুঁয়ে সিঁদুরের ঢেউ উঠছে; সেই সিঁদুরগোলানো পানির ঢেউ লেগে পশ্চিমের আকাশ ভিজে গেছে, আমি ভেজা আকাশের দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠি। আমার লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয় পশ্চিমের আকাশের পানিতে, ওই পানির সমস্ত সৌন্দর্য মাংস দিয়ে অনুভব করার। তীব্রতা বোধ করি আমি, কিন্তু বুঝতে পারি কোনো কিছুই চরমভাবে অনুভব করার শক্তি আমার শরীরের নেই, তখন আমি নারকেল গাছের শেকড়ের ওপর বসে পড়ি; পদ্মার পশ্চিম পারের মতো রঙিন মধু ঝরতে থাকে আমার রক্ত আর মাংস থেকে।

সোনামতির প্যাট অইছে, খবরটা মাকে দিচ্ছিলো কালার মা; আমি পাশের ঘর থেকে শুনছিলাম।

তুমি শুনলা কার কাছে? মা জিজ্ঞেস করলো।

চৈদ্দগ্রামের কে না জানে, কালার মা বলছিলো, বাইরে ত এই কিচ্ছায় কান পাতন যায় না।

কে এই কাম করল? মা জিজ্ঞেস করে।

কে আর করব, ইদ্রিসসা জোয়াইনকাই করছে, কালার মা বলে, অই ভাদাইমা ছাড়া আর কে করব।

কালার মা খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে; পাড়া থেকে পাড়ায় ছড়ানোর মতো একটি ঘটনা সে পেয়ে গেছে, পেয়ে খুব তৃপ্তি পাচ্ছে; কিন্তু আমি কোনো চঞ্চলতা বোধ করছি না, শুধু সোনামতি আপার মুখটা আমার মনে পড়ছে, যাকে আমি মুখোমুখি আপাই বলি, আর মনে পড়ছে ইদ্রিসদার মুখটাও। তারা দুজনে মিলে একটা খুব খারাপ কাজ করে ফেলেছে, আমি বুঝতে পারি, বিয়ে না করে এমন কাজ করা তাদের ঠিক হয় নি। সোনামতি আপাদের বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে, কলাপুরিনারকেল গাছ দিয়ে ঘেরা, আর তার পাশেই, একটি ছোটো খালের পাড়ে, ইদ্রিসদাদের বাড়ি, সেটিও ঘেরা কলাপুরিনারকেল গাছ দিয়ে। অনেক দিন তাদের বাড়ি আমি যাই নি, আজ বিকেলে একবার যাবো। সোনামতি আপা আর ইদ্রিসদা একটা খুব খারাপ কাজ করেছে। খুব খারাপ কাজ করেছে তারা?, আমার মনে এমন একটি প্রশ্ন আসছে, অনেকক্ষণ ধরে প্রশ্নটিকে আমি তাড়াতে পারছি না। আমাদের গ্রামের কে কে এমন। খারাপ কাজ করতে রাজি নয়? সোনামতি আপা রাজি হলে কে কে এমন কাজ করতো না? তারপর পালিয়ে যেতো না? বিকেলে

আমি সোনামতি আপাদের বাড়ি গিয়ে দেখি তিনি দক্ষিণের ঘরে তার মায়ের পাশে বসে আছেন। তার মা খুব অসুস্থ, বাঁচবে না। আমাকে দেখে বিষণ্ণভাবে হাসলেন সোনামতি আপা; আমার চোখে পড়লো বেশ বড়ো পেট হয়েছে তাঁর। দাঁড়াতে তার কষ্টই হচ্ছিলো। তখন ইদ্রিসদা এলেন। আমাকে তিনি দেখতেও পেলেন না যেনো, পাগলের মতো লাগছিলো তাকে; তিনি, চিৎকার করছিলেন, গ্রামের যেই শালারপোই যেই কথা কউক না ক্যান, আমি সোনামতিরে বিয়া করুমই। ইদ্রিসদা পালিয়ে যায় নি দেখে ভালো লাগলো আমার।

বিচার হবে সোনামতি আপা আর ইদ্রিসদার;–বিচার আমি দেখতে পাবো না, ছোটোদের ওই বিচারে থাকতে দেয়া হবে না। আমার খুব ইচ্ছে বিচার দেখার; মকবুল আর হান্নানেরও খুব ইচ্ছে। ওরাই আমার কাছে প্রস্তাবটি নিয়ে আসে। বিচার হবে। সোনামতি আপাদের উঠোনে, সন্ধ্যার পর; উঠোনের পাশে রয়েছে রান্নাঘর, আমরা চুপ করে রান্নাঘরের বেড়ার আড়ালে লুকিয়ে বিচার দেখতে পারবো। কোনো শব্দ না করলেই চলবে, বড়োরা আমাদের খেয়ালও করবে না, তারা ব্যস্ত থাকবে বিচার নিয়ে। বিচার পেলে বড়োদের আর কোনোদিকে খেয়াল থাকে না। ওই বড়োদের অনেককেই। আমরা তখনই বড়ো বলে বিশেষ মান্যগণ্য করছি না; তাদের দেখলে যদিও সালাম। দিই, আড়ালে অনেককে ছাগল, পাগল, মুরগিচোরা, টাউট বলতে শুরু করেছি। যেমন তোতাখা আর কফিল মাতবরকে বছরখানেক ধরে আমরা সালাম দিই না, পথে দেখা হলে মাথা নিচু করে অন্য দিকে চলে যাই। কিন্তু তোতাখা আর কফিল মাতবর মাঝেমাঝে আমাদের ডাকে।

কি মিয়ারা, সিয়ানা অইয়া গ্যাছ বুঝি, তারা বলে, আইজকাইল আর সেলামআদাব দেও না।

সালামাইকুম, বলে আমরা কেটে পড়ি।

তারা থাকবে বিচারে, তারা বিচার করবে। বাবাও থাকবেন, মকবুল আর হান্নানের। বাবাও থাকবেন। কিন্তু আমাদের বিচার দেখতে হবে।

বিচারটা দেখতেই হবে, কোনোদিন তো আমাদের নিয়েও এমন বিচার হতে পারে, মকবুল বলে।

আমি মকবুলের কথা শুনে ভয় পাই, আমাকে নিয়ে এমন বিচার হচ্ছে ভাবতে পারি না।

তুই কার পক্ষে? মকবুল আর হান্নান আমাকে জিজ্ঞেস করে।

এতে আবার পক্ষ নিতে হবে নাকি? আমি জিজ্ঞেস করি।

যদি হয়? ওরা জানতে চায়।

আমি সোনামতি আপা আর ইদ্রিসদার পক্ষে, আমি বলি।

হ, আমরা সোনামতি আপা আর ইদ্রিসদার পক্ষেই, ওরা বলে। মকবুল একটু বেশি করেই জোর দেয় কথাটির ওপর, এবং একটি সিগারেট ধরায়, আমি অবাক হই।

বাবার পকেট থেকে চুরি করেছি, মকবুল হাসতে হাসতে বলে।

সোনামতি আপাদের রান্নাঘরের বেড়ার আড়ালে সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকিয়ে আমরা বিচার শুনছি, দেখতে পাচ্ছি না বেশি; তবে তাদের সবার গলাই চেনা আমাদের, কে। কথা বলছে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। আবুল হাশেমের গলাটাই শোনা যাচ্ছে বেশি। বুড়োরা অত্যন্ত অশ্লীল কথা বলতে পারে, তারা তা অবলীলায় বলে যাচ্ছে। খানকি শব্দটি। তাদের বেশ প্রিয়, বারবারই বলছে। হাশেম জোরে চিৎকার করে বলছে তার চোখেই প্রথম ঘটনাটি ধরা পড়ে;–একরাতে সে দেখতে পায় সোনামতি আর সোনামতির মা যে-ঘরে থাকে, ইদ্রিস সে-ঘরের দরোজায় এসে আস্তে হাঁটু দিয়ে তিনবার টু দেয়। তখন ওই ঘরের দরোজা খুলে যায়। আবুল হাশেম ঘটনাটি পরীক্ষা করেও দেখে। একরাতে সে নিজে সোনামতির মায়ের ঘরে গিয়ে তিনবার হাটু দিয়ে টু দেয়, তখন। সোনামতি দরোজা খুলে দেয়; তাকে দেখে সোনামতি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। সে। সোনামতিকে জিজ্ঞেস করে সোনামতি কেনো দরোজা খুলেছে, সোনামতি মিথ্যা কথা বলে যে বাইরে যাওয়ার জন্যে সে দরোজা খুলেছে। আবুল হাশেমের সাথে আরো। তিনচারজন চিৎকার করতে থাকে। সোনামতি আর তার মা যে-ঘরে থাকে, হাশেম সে-ঘরটির বিস্তৃত বর্ণনা দেয়। সে বলে ঘরটিতে কোনো খাট নেই চৌকি নেই, মাটিতে দুটি বিছানা রয়েছে; একটিতে থাকে সোনামতির আধমরা মা, যার মরার বেশি বাকি নেই, যার হুঁশ নেই; অন্যটিতে থাকে সোনামতি। হাশেম চিৎকার করে বলে যে ইদ্রিস আর সোনামতি মায়ের পাশে শুয়ে কবিরা গুনা করেছে, তাদের লাজলজ্জার বালাই নেই: আর সোনামতির মায়েরও লাজলজ্জা নেই, নিজের পাশে শুয়ে সে নিজের মেয়েকে জিনা করতে দিয়েছে। সোনামতির মাকে ডাকা হয়, কিন্তু তার কোনো হুঁশ নেই; হাশেম বারবার জিজ্ঞেস করে, সে যা বলেছে তা সত্য কিনা; সোনামতির মা কোনো কথা বলে না, হয়তো সে কিছু শুনতে পায় নি। তোতাখা চিৎকার করে বলে যে

খানকির ঘরে তো খানকিই হবে, সোনামতির বাপ বছরের পর বছর জাহাজে কাজ করেছে, আর। খানকিটা বছরের পর বছর যারেতারে দিয়ে পেট বানিয়েছে; তার মেয়ে তো খানকিই হবে। এবার মনে হলো সোনামতি আপার মা শুনতে পাচ্ছে, সে আস্তে আস্তে উত্তর দিতে চেষ্টা করছে; সে বলছে, আমি জুদি বছর বছর সোনামতির বাপ ছাড়া অন্যের লগে পেড বানাইয়া থাকি, তয় ত আমি বিদাশ থিকা মরদ ভাড়া কইর‍্যা আনি নাই, আপনাগো কারো লগেই পেড বানাইছি। একটা হৈচৈ পড়ে যায় চারপাশে, সোনামতির মা আর কথা বলে না। বিচার ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। ইদ্রিসদা চিৎকার করে ওঠেন, জিনা আমি বুঝি না, সোনামতির লগে আমার ভাব হয়েছে, আমি তারে বিয়া। করুম। সোনামতির পেটের পোলা আমার। তার দু-দিন পর দু-বাড়িতে সারাদিন ধরে কোরান পড়া হলো, সোনামতি আপার আর ইদ্রিসদার বিয়ে হয়ে গেলো।

২. মকবুল অনেক খবর রাখে

মকবুল অনেক খবর রাখে, প্রত্যেক ঘরের খবর তার মুঠোর ভেতরে। একদিন সে বললো, আমাদের গ্রামে কমপক্ষে দশটা জারজ আছে। শুনে আমার ভয় লাগলো না, বরং মনে হলো ভাগ্য ভালো জারজ দেখে চেনা যায় না; চেনা গেলে খুব ভয়ঙ্কর হতো। তার মতে বুড়োগুলো কি কম শয়তান, এখন একেকটা দাড়ি রেখে মুরব্বি সেজেছে, টুপি মাথায় দিয়ে নামাজ পড়ে কপালের চামড়া তুলে ফেলছে, কিন্তু সেগুলো কি কম শয়তান ছিলো? সুবিধা পেলে এখনো কি কম শয়তানি করে যাত্রার সময় তারা কী। করে, আমরা জানি না? মকবুল একটি একটি করে জারজের নাম শোনাতে। থাকে-আবুল হাশেম, ইসমাইল মোল্লা...। নামগুলো সে তার দাদীর কাছে শুনেছে, তার দাদী গ্রামে কার সাথে কে শুয়েছে তার পঞ্চাশ বছরের সব খবর রাখে। মকবুল বলতে। থাকে, ওই যে জাহাজে যারা কাজ করে, যারা আসাম আর দিনাজপুর থাকে, বছর বছর বাড়ি আসে না, তাদের বউদের ছেলেমেয়ে হয় কেমনে? যারা সারারাত ইলিশ ধরে। পদ্মায়; তাদের বউগুলো কি একলা থাকে? আমি শুনি আর চোখের সামনে ভেঙে পড়া দেখতে থাকি; পদ্মার পার যেমন করে ভাঙে তেমন করে ভেঙে পড়তে থাকে-কী যেনো ভেঙে পড়তে থাকে, কী সব যেনো ভেঙে পড়তে থাকে, আমি বুঝে উঠতে পারি না; কিন্তু ভাঙনের দৃশ্যে আমার চোখ ভরে যায়।

রওশনদের বাড়ি আমি অনেক বছর যাই নি, যার সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তাম; তারপর সে শহরে চলে গিয়েছিলো শহরের ইস্কুলে বেশি ভালো করে পড়বে বলে, আবার ফিরে এসেছে; ফেরার পর আর দেখা হয় নি। রওশনের উচ্চশিক্ষা কি শেষ হয়ে গেলো? দূর থেকে রওশনকে মাঝেমাঝে দেখি আমি, যখন ইস্কুলে বা খেলার মাঠে যাই, দেখি রওশন নারকেল গাছের পাশে দাঁড়িয়ে মাঠ দেখছে বা দেখছে আমাকে, বা পুকুরের পানি

দেখছে, বা আকাশ দেখছে বা কিছুই দেখছে না, শুধু আমি দেখছি। তাকে। রওশন কী দেখতে পছন্দ করে, তা আমি জানি না; তবে দূর থেকে তাকে দেখে আমরা ধন্য হচ্ছি। গ্রামে রওশন ভিন্ন ছিলো; আমাদের বয়সের একমাত্র সে-ই শুধু। শহরে গেছে, আর ফিরে এসেছে শহর থেকে, এবং সে সালোয়ারকামিজ পরে, গলায় দোপাট্টা ঝুলিয়ে রাখে, শাড়ি পরে না। আর সে সুন্দর। তাকে দেখার জন্যে মকবুল মাঝেমাঝে এমনভাবে ঘুড়ির সুতো ছিঁড়ছে, যাতে ঘুড়িটি গিয়ে ওদের নারকেল গাছে আটকায়। মকবুলের ঘুড়ি মকবুলের কথা শুনছে চমৎকারভাবে, উড়ে গিয়ে আটকে যাচ্ছে রওশনদের নারকেল বা আমগাছে; মকবুল ঘুড়ি আনতে গিয়ে কখনো দেখতে পাচ্ছে রওশনকে, আর যতোক্ষণ দেখতে পাচ্ছে না ততোক্ষণ সে কিছুতেই ঘুড়ি ছাড়াতে পারছে না। আমি ওদের বাড়ি যাওয়ার কথা ভাবছি না; কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমি ইস্কুলে যাওয়ার সময় রওশন আকাশ দেখার জন্যে এসে উপস্থিত হচ্ছে নারকেল গাছের গোড়ায়, ফেরার সময় সে পুকুরের জলে ঢেউ আর হাঁসের সাঁতার দেখার জন্যে এসে দাঁড়াচ্ছে বাঁধানো ঘাটে। ওই সময় আকাশ আর পুকুরের ঢেউ আর হাঁস ওর নিশ্চয়ই সুন্দর লাগছে সারাদিনের আকাশ আর জলের ঢেউ আর হাঁসের সাঁতার থেকে। কিন্তু। ওকে দেখার পর আমি আর হাঁটতে পারি না; কয়েক দিন আমি অনেক পথ ঘুরে ইস্কুলে গেছি, ঘুরে ফিরেছি, আর মাঠে যাই নি। তারপর খুব শূন্য লাগছে। শূন্য লাগার থেকে। অনেক ভালো সোজা পথে ইস্কুলে যাওয়া, ঠিক সময়ে মাঠে যাওয়া, আর কারো আকাশ আর পুকুরের জলের ঢেউ দেখাকে বিষাক্ত না করা।

শওকত এখন কোথায় কেমন কী করে জানি না, কিন্তু ওকে আমার মনে পড়ে; ও-ই আমাকে স্বপ্নের খুব কাছে নিয়ে গিয়েছিলো। একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। আমার;–সাধারণত স্বপ্ন দেখি না আমি, কিন্তু দেখলে রওশনকেই দেখি। আমার অন্য কোনো স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু অন্য কিছুই আমি দেখি না, কয়েক মাস পর হঠাৎ স্বপ্ন দেখি, দেখি রওশন,

এবং সে দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে; আমার ঘুম ভেঙে যায়, আমি নারকেল গাছের নিচে, অগ্নিগিরির জ্বালামুখের ওপর, একলা পড়ে থাকি। শওকত, রওশনের ছোটোভাই, এক বিকেলে আমাকে ওদের বাড়ি নিয়ে যায়, আমি যেতে চাই নি আর না গিয়েও পারি নি; আমরা বসার ঘরে ক্যারোম খেলতে থাকি। শরৎ শেষ হয়ে আসছে, হেমন্ত দেখা দিচ্ছে, বিকেলটি কোমলতায় ভরে গেছে, পৃথিবীতে এতো কোমল বিকেল হয়তো আর আসে নি; আমি এক সময় অনুভব করি পেছনের জানালা দিয়ে একটি হাত তার পাঁচটি কোমল আঙুল আমার চুলের ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ওই অনির্বচনীয় আঙুলগুলো তারপর স্থির হয়ে থাকে আমার মাথার। মাঝখানে, আমার শরীর জুড়ে কোমলতা ছড়িয়ে পড়তে থাকে, আর আমি খুব ধীরে আমার বাঁ হাত উঠিয়ে আমার পাঁচটি আঙুল রাখি ওই অঙ্গুলিমালার ওপর, এবং পেছনের দিকে ফিরে তাকাই। রওশন হাত সরিয়ে নিয়ে শরতের চাঁদের মতো হাসে। এতো কাছে থেকে আগে কখনো আমি চাঁদ দেখি নি, আমার জানালার এতো কাছে এর আগে কখনো চাঁদ ওঠে নি। রওশন একটু পর ঘরে এসে ঢোকে; শওকত আর খেলবে না, রওশন আর আমি খেলতে থাকি। রওশন যখন স্ট্রাইক করে তার চুল ছড়িয়ে পড়ে, মাঝখানে একটি চাঁদ ভাসতে থাকে; রওশন যখন স্ট্রাইক করে, তার আঙুল ফুলের মতো দল মেলে। স্ট্রাইকার ফেরত নেয়ার সময় আমার আঙুলে লাগে রওশনের আঙুল, আর রওশনের আঙুলে লাগে আমার আঙুল; আমরা মুখে কথা না বলে আঙুল দিয়ে কথা বলতে থাকি। রওশনের প্রতিটি আঙুলের নিজস্ব কণ্ঠস্বর রয়েছে, তাদের গলা থেকে গলগল করে সোনা ঝরতে থাকে, আমি সেই সব স্বর শুনতে পাই; এর আগে আমি কখনো স্পর্শের স্বর শুনি নি। আমার মনে হতে থাকে এর আগে আমাকে কেউ ছোঁয় নি, আর আমিও কখনো কিছু ছুঁই নি, কাউকে ছুঁই নি।

আঙুল, আঙুলের রূপ, আঙুলের স্বর, আমার সন্ধ্যাটিকে এক কোটি দশ লাখ সুরে। ভরে দেয়; আমি যখন বেরিয়ে আসি চারপাশে মহাজগত ভরে কুয়াশায় গাছের পাতায় পাখির ডানায় আমি পাঁচটি আঙুলের স্বর শুনতে পাই। আমার রক্তে ওই স্বর ঢুকে যায়, চারপাশের বাতাসকে আশ্চর্যরকম মসৃণ পরিসুত মনে হয়, নিজেকে এতো হাল্কা লাগে। যে আমি হেঁটে বাড়ি না ফিরে মেঘলোকের ওপর দিয়ে নক্ষত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে বাড়ি ফিরি; তার আগে একবার নদীর দিকে যাই, মনে হতে থাকে পাঁচটি আঙুল নদী হয়ে বয়ে যাচ্ছে, আর জড়িয়ে আছে আমার পাঁচটি আঙুলের সাথে, মনে হতে থাকে পাঁচটি আঙুল এখনো আমার চুলের ভেতর পাঁচটি স্রোতের মতো ঢুকছে, ঢুকে স্থির হয়ে আছে, সেখান থেকে কোমলতা ছড়িয়ে পড়ছে আমার মাংসের ভেতর রক্তের ভেতর নদীর ভেতর। গাছপালার ভেতর কুয়াশার ভেতর। আমার আঙুলগুলোর দিকে তাকাই আমি, বারবার, দেখে মনে হয় ওগুলো অন্য রকম হয়ে গেছে, জন্মান্তর ঘটে গেছে ওগুলোর, সোনা হয়ে গেছে, ওগুলোর গায় কখনো আর ময়লা লাগবে না। ওইটুকু স্পর্শ নিয়েই আমি বিভোর হয়ে ছিলাম, আর কোনো স্পর্শ আমার জীবনে দরকার পড়বে বলে মনে হয় নি; যতোদিন বাঁচবো ততোদিন ওই স্পর্শ আমি আমার আঙুলে আমার রক্তে বয়ে বেড়াতে পারবো। তাই আমি মেঘের ওপর মেঘে বেড়াতে থাকি, একদিন দু-দিন তিনদিন চারদিন; রওশনের মুখ আমি ভুলে যাই, আঙুলগুলোকে ভুলে যাই, শুধু তার স্পর্শ বয়ে বেড়াতে থাকি। রওশনদের বাড়ির সামনের পথ দিয়ে যাওয়ার সময় আমার চোখ অন্ধ হয়ে আসতে থাকে, কিছু দেখতে পাই না আমি, শুধু স্পর্শ দেখতে পাই; এবং একদিন বিকেলে যখন আবার চোখে দেখতে পাই দেখি রওশন হাত তুলে ডাকছে আমাকে।

অনেক বছর ধরে যেনো আমি দুর্গম পথ হাঁটছি বা এখনো হাঁটতে শিখি নি, এমন করে আমি হাঁটতে থাকি রওশনদের সড়ক ধরে, রওশনদের বাড়িতে ঢোকার পথের। নারকেল

গাছগুলোকে নতুন করে দেখি; রওশনদের বসার ঘরের পাশে একটি বাঁধানো কবর আছে, সেটিকে দেখি অনেকক্ষণ ধরে, এই প্রথম দেখছি বলে মনে হয়, এবং দেখতে পাই রওশন দাঁড়িয়ে আছে। রওশনের সাথে বসার ঘরে ঢুকি আমি, আমাকে বসতে বলে রওশন বেরিয়ে যায়; আমি জানালার পাশের চেয়ারটিতে বসে লক্ষ লক্ষ বছর কাটাতে থাকি, একসময় দেখি রওশন আমার পাশে দাঁড়ানো, এবং আমার বা হাতটি তার ডান হাতের মুঠোর ভেতর। আমি রওশনের মুখের দিকে তাকাই, জ্যো ৎস্নায় আমার চোখমুখ শীতল হয়ে ওঠে; এতো জ্যোৎস্না আমার মুখের ওপর আগে আর কখনো ঝরে পড়ে নি। আমি যদি অনেক আগেই অন্ধ না হয়ে যেতাম তাহলে ওই জ্যোৎস্নায় আমার দু-চোখ সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যেতো। কিন্তু জ্যোৎস্নার থেকে আরো অসামান্য ঘটনা রওশনের মুঠোতে আমার বা হাত;–আমি বুঝে উঠছি না আমার হাত নিয়ে আমি কী করবো, সেটিকে কি আমি অনন্তকাল ওই মুঠোতেই রেখে দেবো, ওই মুঠোতে থাকলেই কি সেটি সবচেয়ে শান্তি পাবে? কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না আমি। রওশন আমাকে ধরেছে, রওশন আমাকে ছুঁয়েছে; আমি এখনো ধরি নি, আমি এখনো। দুই নি। রওশন আস্তে বলল, আমাকেও ধরো। আমি তার মুখের দিকে তাকালাম, রওশন তাকালো আমার মুখের দিকে; আমার আঙুলগুলো সজীব হয়ে উঠলো একটু একটু করে, অমনি কী যেনো রওশনের আঙুল থেকে আমার আঙুলে আর আমার আঙুল থেকে রওশনের আঙুলে বইতে শুরু করলো–তা বিদ্যুৎ নয়, বিদ্যুতের থেকে তীব্র ও আলোকময়; তা কার্তিকের কুয়াশা নয়, কার্তিকের কুয়াশার থেকে অনেক কোমল। অনেক কাতর। আমরা সারা বিকেল হাতে হাত রেখে জীবন যাপন করলাম, আমাদের মনে হলো আমাদের হাত দুটি পরস্পরের মুঠোতে থাকলেই শুধু বেঁচে থাকে। রওশন শুধু মাঝেমাঝে বাইরে তাকিয়ে দেখছিলো কেউ আসে কিনা কেউ উঁকি দেয় কিনা। সেই বিকেলে আমরা দুজন বদলে গেলাম, আমরা দুজন আবার জন্ম নিলাম।

আমি যখন চলে আসি তখনো মনে হচ্ছিলো রওশন আমার হাত ধরে আছে, আমি রওশনের হাত ধরে আছি; কিন্তু লেবুঝোঁপের পাশে এসেই আমার হাত আর বুক খুব শূন্য লাগতে শুরু করে, রওশনের হাত আরেকবার ধরার পিপাসা বুকে বোশেখের রোদের মতো কাঁপতে থাকে। রওশনের হাত একবার ধরার পর তারপর না ধরে থাকা কী কঠিন কী কষ্টকর তা আমি লেবুঝোঁপের পাশে দাঁড়িয়ে মর্মেমর্মে অনুভব করি। আবার ফিরে যাবো, গিয়ে আরেকবার রওশনের হাত ধরবো? কেউ কি দেখে ফেলবে না? রওশন কি কিছু ভাববে? না, আমাকে ফিরে যেতে হবে, ওই হাত আরেকবার ছুঁতেই হবে, নইলে আমি বাড়ি ফেরার পথ খুঁজে পাবো না। সন্ধ্যা নেমে গেছে, আমি আবার রওশনদের বসার ঘরের দিকে পা বাড়াই; রওশন দাঁড়িয়ে আছে বাঁধানো কবরের পাশের ডালিম গাছের নিচে। রওশনের হাতও কি রওশনকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে ডালিম গাছের নিচে? আমি কাছে যেতেই আমাদের হাত কখন যে পরস্পরকে ধরে ফেলে, তা আমরা কেউ জানতে পারি না। কোনো কথা বলি না আমরা, আমাদের কোনো কথা নেই, কথা আছে আমাদের হাতদের, তারা কথা বলতে থাকে, তাদের গলা থেকে সোনা ঝরতে থাকে। আমাদের হাতদের কথা অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়, আমি বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করি। এক দুই তিন চার, কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি আর রওশন গৌণ হয়ে যাই, আমরা কেউ নই, আমাদের কোনো অস্তিত্ব নেই; অস্তিত্ব আছে শুধু দুজনের হাতের, রওশনের ডান হাতের আর আমার বাঁ হাতের। আমি গিয়ে রওশনদের বসার ঘরে বসলেই রওশনের ডান হাত আমার বাঁ হাতকে মুঠোতে তুলে নেয়, আমার ডান হাত রওশনের বা হাতকে মুঠোতে তুলে নেয়; আমরা চুপ করে থাকি, হাতেরা কথা বলে। হাতদের কথা বলায় আমরা কোনো বাধা দিই না, আমরা কথা বলে হাতদের কথা বলায় কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করি না; আমরা শুধু চাই ওরা ঝোঁপের আড়ালে বসে নিজেদের অন্তরঙ্গতম কথাগুলো বলুক; আর চাই

তাতে যেনো আর কেউ ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে। আমরা দুজন প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে থাকি;–আমি জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি কেউ আসে কিনা, তাকায় কিনা; রওশন দরোজা দিয়ে তাকিয়ে দেখে কেউ আসে কিনা, কেউ তাকায় কিনা। হাতেরা যখন একে অন্যের সাথে কথা বলে তখন তারা বাইরের কিছু দেখতে পায় না, তাদের হয়ে দেখি আমি আর রওশন, আমাদের হাতেরা কথা বলে একে অন্যের সাথে।

পাহারা দেয়া, বুঝতে পারি আমরা, খুব কঠিন কাজ; পাহারা দিতে গিয়ে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রখর হয়ে ওঠে, ধারালো হয়ে ওঠে শান দেয়া ছুরিকার মতো; দূরে, কোথাও পাতা খসে পড়লে শুনতে পাই, ছায়া কেঁপে উঠলে দেখতে পাই,-অমনি আমাদের হাত সরে যায় পরস্পরের থেকে; যখন বুঝতে পারি ওটি পাতা খসার শব্দ ওটি ছায়া কাঁপার দৃশ্য, তখন আমাদের হাত আবার পরস্পরকে বুকে তুলে নেয়। রওশনের আব্বা মাঝেমাঝেই এদিক দিয়ে বাইরে যান, আবার ফিরে আসেন, তখন আমাদের হাত খুব দূরে সরে যায়রওশনের আম্মা কখনো উঠোনে আসেন, পুকুরের। দিকে যান, তখন আমাদের হাত সরে যায়; আর আছে শওকত, তার কাজ আসাযাওয়া, এই ঘরে ঢুকছে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে, তাই আমাদের হাত এই ঠুচ্ছে পরস্পরকে আবার দূরে সরে যাচ্ছে একে অন্যের থেকে। দূরত্ব সম্পর্কে একটি অনুভূতি হয় আমাদের। আমরা বুঝতে পারি দু-ইঞ্চি দূরত্ব আর দু-কোটি মাইল দূরত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; আমাদের হাত যদি পরস্পরকে না ধরে থাকে তখন এক ইঞ্চি দূরত্ব আর এক কোটি মাইল দূরত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যখন আমরা না ছুঁয়ে থাকি তখন আমরা অনন্তের থেকেও বেশি দূরে। আমাদের চোখেরাও তখন সুন্দর ছাড়া আর কিছু দেখতে ভুলে গেছে, আমি রওশনের দিকে তাকাই, দেখি সুন্দর; রওশন আমার দিকে তাকায়, সেও দেখে সুন্দর; যদি সে সুন্দর না দেখতো তাহলে অমন করে এতোক্ষণ ধরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারতো না। এর আগে

সবচেয়ে বেশি সময় ধরে আমি তাকিয়েছিলাম একটি ফুলের দিকে, দীর্ঘ কয়েক মিনিট তাকিয়ে ছিলাম, অতো সময় ধরে আর কোনো কিছুর দিকে আমি তাকাই নি; অতো সুন্দর ফুলের। দিকেও কয়েক মিনিটের বেশি আমি তাকিয়ে থাকতে পারি নি; কিন্তু রওশনের দিকে। মুখের দিকে আমি সারা বিকেল তাকিয়ে থাকতাম, যেমন রওশন তাকিয়ে থাকতো। আমার মুখের দিকে। রওশন তাকিয়ে থাকতে বলে আমার মুখটি তখন সুন্দর হয়ে উঠেছিলো।

সন্ধ্যা হলে চলে আসতাম আমি। সন্ধ্যার পর বাইরে থাকা নিষেধ ছিলো আমার; তবে কোনো কোনো দিন, প্রায় প্রত্যেক দিন, শওকত আর রওশন দুজনেই আমাকে থাকতে বলতো আরো কিছুক্ষণের জন্যে, ওদের সাথে পড়ার জন্যে, এবং আমি নিষেধ সত্ত্বেও ওদের সাথে, সপ্তাহে দু-এক দিন-বিশেষ করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়, না থেকে পারতাম না। টেবিলে মুখোমুখি বসতাম রওশন ও আমি, ডান দিকে বসতো শওকত; তখন আমরা বেশ দূরে, আমাদের হাত ধরতে পারতো না পরস্পরকে, আমাদের মনে হতো আমরা দুই গ্রহে রয়েছি। রওশন এক বিস্ময়কর আবিষ্কারক, রওশনই তখন স্পর্শের নতুন রীতিটি বের করে। প্রথম সন্ধ্যায়ই, যখন আমি রওশনের থেকে লাখ লাখ আলোকবর্ষের দূরত্বে থাকার কষ্টে কাতর হয়ে উঠছি আর রওশন তা বুঝতে পেরে আরো কাতর হয়ে উঠছে, তখন আমার ডান পায়ের পাতার ওপর আমি অনুভব করি একপ কোমলতার লঘুতা, এবং সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি রওশনের চোখ দুটি কথা বলছে। আমার চোখ তার চোখের কথা সাথেসাথেই বুঝে ফেলে, আমি তখন আমার বাঁ পা রাখি রওশনের ডান পায়ের পাতার একরাশ কোমল মসৃণতার ওপর। আমাদের পা কথা বলতে থাকে। এর পর যে-সন্ধ্যায়ই আমি ওদের সাথে থেকেছি, আমার ডান পায়ের পাতার ওপর রওশন রাখতে তার বা পা, আর রওশনের ডান। পায়ের পাতার ওপর আমি রাখতাম আমার বাঁ পা। কথা

বলতো আমাদের পায়েরা। পায়েরাও চমৎকার কথা বলতে পারে, পায়েরাও কোমল হতে হতে গন্ধরাজ হয়ে উঠতে পারে, আমাদের পা গন্ধরাজ হয়ে টেবিলের তলদেশকে সুগন্ধে ভরে দিতে, থাকে। আমাদের দুজনের পায়ের পাতা থেকে সুগন্ধ উঠছে, আমরা তাতে বিভোর হয়ে আছি, সে-গন্ধে আমাদের রক্ত পাগল হয়ে উঠছে মাতাল হয়ে উঠছে বুলবুলি হয়ে উঠছে প্রজাপতি হয়ে উঠছে পদ্ম হয়ে উঠছে চাঁদ হয়ে উঠছে রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে উঠছে। শওকত একদিন আমাদের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে টেবিলের নিচে আমাদের পায়েরা মাতাল হয়ে গেছে। কিন্তু সে তো আর টেবিলের নিচে অকারণে উঁকি দিতে পারে না! তাকে একটি যুক্তিসঙ্গত কারণ বের করতে হয় টেবিলের নিচে উঁকি। দেয়ার জন্যে;–সে তার হাতের পেন্সিলটি নিচে ফেলে দিয়ে হ্যারিকেন নিয়ে টেবিলের নিচে পেন্সিল খুঁজতে থাকে, আমাদের পায়ের পাতা দূরে সরে যায়; আর তখন। টেবিলের ওপরের অন্ধকারে আমাদের হাত খুঁজে পায় একে অন্যকে, শান্তিতে ভরে যায় তাদের প্রতিটি আঙুল, আঙুলের মাংস, নখ, আঙুলের হৃদয়। শওকত হঠাৎ মাথা তোলে টেবিলের নিচে থেকে, আর অমনি আমাদের হাতেরা দূরে সরে যায়, যেনো তারা। কখনো কাছাকাছি আসে নি, আসার কোনো সাধ নেই তাদের; এবং তখন টেবিলের নিচে আমার ডান পায়ের ওপর এসে পড়ে একপ কোমলতার লঘুতা, আর আমার বা পায়ের পাতা গিয়ে পড়ে একস্তূপ কোমল মসৃণতার ওপর। শওকত বারবার পেন্সিল ফেলতে ফেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আর আমাদের পায়েরা একে অন্যের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখতে থাকে।

রওশন আর আমি বোবা নই, আমরা যে কোনো কথা বলি নি, তা নয়; অনেক কথাই আমরা বলেছি, কিন্তু আমাদের কোনো কথাই যেনো কোনো অর্থ প্রকাশ করতো না যতক্ষণ আমাদের হাত ধরতে পারতো না পরস্পরকে, আমাদের পায়ের পাতা স্পর্শ করতে না একে অন্যকে। রওশন আর আমি তখন ত্বক আর মাংসের অবর্ণনীয় সুখের। ভেতরে বাস

করছি। রওশনের আঙুলগুলো ছিলো দীর্ঘ আর কোমল, যে-কোমলতা, মেঘের নয় পালকের নয় রেশমের নয় গোলাপের নয় বাতাসের নয় জলের নয়, যা শুধু। রওশনের; তার হাতের তালুতে কোমল মাংস, আমার আঙুল ওই দুগ্ধফেনার ভেতর ডুবে যায়; তার ত্বক কচুরি ফুলের পাপড়ির মতো মসৃণ; ওই কোমল মসৃণতা পেরিয়ে। রওশনের হাত থেকে আরেক কোমলতা সঞ্চারিত হয় আমার হাতে, যার কোনো পরিচয় আমি জানি না; হাত বেয়ে ত্বকের ওপর দিয়ে রক্তের ভেতর দিয়ে মাংসের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে, আর আমার শরীর অলৌকিক হয়ে ওঠে। ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয় আমার, মনে হয় চাঁদ গুড়োগুড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে আমার রক্তে; রওশনের মুখের দিকে তাকিয়েও তার চোখ ভরে মুখ ভরে ভুরুর ওপরে ঠোঁটের। মাঝখানে ঘুমের ঘোলাটে জ্যোৎস্না ছড়ানো দেখতে পাই।

তুমি কেমন আছো? আমি জানতে চাই, বা আমি জানতে চাই না, আমি শুধু জেগে থাকতে চাই। অবাক হয়ে আমি লক্ষ্য করি রওশনকে আমি তুমি বলছি, আমরা তো তুইই বলতাম একে অন্যকে।

ভা-লো, রওশন বলে, কী যে সুখ লাগে তোমাকে ছুঁলে! সেও প্রাণপণে চেষ্টা করে জেগে থাকার, বলে তোমার লাগে না? রওশনও তুমি বলছে আমাকে। আমরা তুই থেকে তুমি হয়ে উঠি।

ঘুম পায় আমার এতো ভালো লাগে, আমি বলি।

চিরকাল ছুঁয়ে থাকবো আমরা, তুমি আমি, রওশন বলে।

তারচেয়েও বেশি, আমি বলি, তারচেয়েও অনেক বেশি।

তুমি সুন্দর, রওশন বলে। আমি খুব বিব্রত বোধ করি, কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে আমি সুন্দর, রওশন যা বলে তা কখনো মিথ্যা হতে পারে না।

না, তুমি সুন্দর, আমি বলি।

না, তুমি সুন্দর, রওশন আবার বলে; গানের মতো বলে রওশন, বলতে থাকে। রওশন, তুমি সুন্দর, এতো সুন্দর, কী যে সুন্দর।

রওশনের কথা শুনে আমার মেঘের ওপর ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়, আমি ঘুমিয়েই পড়ি, বলি, না, তুমি সুন্দর, রওশন, শুধু তুমিই সুন্দর পৃথিবীতে।

আরো সুন্দর হয়ে ওঠে রওশন,-আমার ওষ্ঠ থেকেও তাহলে উচ্চারিত হচ্ছে চরম সত্য, রওশনের মুখের দিকে তাকিয়ে আমিও অধিকার পেয়েছি চরম সত্য বলার;–রওশনের মুঠো আরো কোমল হয়ে ওঠে, ওই কোমল মুঠোর ভেতর আমার। আঙুলগুলো আমার হৃৎপিণ্ডের মতো কাঁপতে থাকে। রওশনের মুখের দিকে তাকাই। আমি, জ্যোৎস্নায় ভেসে যেতে থাকে আমার মুখমণ্ডল। মনে হয় শরতের পূর্ণিমা চাঁদের নিচে আমি নৌকো বেয়ে চলছি, বৈঠার শব্দ উঠছে; মনে হয় হেমন্তের পূর্ণ চাঁদের নিচে। পাকা আমন ধানের খেতের পাশে আমি নৌকো লাগিয়ে বসে আছি, শাদা কুয়াশা নেমে আসছে, আমার চুলে শিশির জমছে, কাশবন দুলছে, বাঁশির শব্দ ভেসে আসছে, আর বহুদূরে আড়িয়ল বিলের উত্তরে

জ্বলছে একটি আকাশপ্রদীপ। রওশনের শরীর থেকে জ্যোৎস্নার গন্ধ এসে লাগতে থাকে আমার নাকে, কুয়াশার গন্ধ এসে লাগতে থাকে আমার নাকে, ধানের গন্ধ এসে লাগতে থাকে নাকে; আমার শরীর কুয়াশার মতো। ছড়িয়ে পড়তে থাকে ধানখেতের ওপর, আখখেতের ওপর, কাশবনে, নারকেল গাছের পাতায়, দূরের উঁচু উঁচু তালগাছগুলোর পাতায়। রওশন ঝুঁকে পড়ে আমার গ্রীবার ওপর, তার নাক লাগে আমার গ্রীবায়, তার গাল লাগে আমার গালে; আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে হাসে। আমি তখন আর কিছু দেখতে পাই না, চোখ বন্ধ করে ফেলি, এবং বন্ধ আর অন্ধ চোখে দেখতে পাই আকাশজোড়া লাল রঙ।

আমি আর নিজের শরীরের মধু আহরণ করি না, নিজের শরীরের চাক ভাঙি না, ভাঙতে ইচ্ছে করে না; বিস্মিত হই আমি-রওশনের হাতে হাত রাখার আগে নিজের। শরীরের মধুর স্বাদ আমি প্রাণভরে পান করেছি, কিন্তু এখন ইচ্ছে করে না, ঘেন্না লাগে, ওই কথা মনেই পড়ে না। আমি রওশনের হাতের মধু পান করেছি, অন্য কোনো মধু আর আমার কাছে মধুর লাগে না, একমাত্র মধু হচ্ছে রওশনের আঙুলের ছোঁয়া, রওশনের পায়ের পাতায় আমার পায়ের পাতার স্পর্শ, যা আমাকে মেঘের ওপরে। উড়ালের সুখ দেয়। একদিন আমাদের বিয়ে হবে, এমন ভাবনা আসে আমার মনে, তখন আমরা কী করবো? আমি ভাবতে চেষ্টা করি–তখন আমরা হাতে হাত রেখে সারাদিন বসে থাকবো, তখন আমরা হাতে হাত রেখে সারারাত জেগে থাকবো, রওশনের মুখের দিকে আমি তাকিয়ে থাকবো, রওশন তাকিয়ে থাকবে আমার মুখের দিকে। আমরা আর কিছু করবো না। রওশনের শাড়ি থেকে আমার নাকে এসে গন্ধ লাগবে, আমরা হাঁটতে বেরোবো, তখন রওশনের শাড়ির পাড় বাতাসে উড়বে, আমার মুখে এসে পড়বে। আমরা পাশাপাশি শুয়ে থাকবো, রওশনের শরীরের ছোঁয়া লাগবে আমার শরীরে, রওশনের গালে আমি আমার

আঙুল বুলোবো, রওশন আমার নাকের ওপর তার আঙুল রাখবে, আর আমরা সারারাত কথা বলবো। আমরা কি আর কিছু করবো? রওশন তখন ব্লাউজ পরবে, লাল ব্লাউজ পরবে, ব্লাউজের ওপর দিয়ে তার গলা দেখা যাবে, তার গ্রীবা দেখা যাবে। আমি কি কখনো তার ব্লাউজ খুলবো? না, না, না; আমি কখনো তার ব্লাউজ খুলব না, রওশন কী মনে করবে, রওশন আমাকে খুব। খারাপ মনে করবে; আমরা অতো খারাপ হবো না। বিয়ে হলে লোকেরা ন্যাংটো হয়ে শোয়, তারা খুব খারাপ কাজ করে, রওশন আর আমি কখনো ন্যাংটো হবো না, কোনো খারাপ কাজ করবো না; আমরা চুমো খাবো-রওশন আস্তে আমার গালে ঠোঁট ছোঁয়াবে, আমি আস্তে রওশনের গালে ঠোঁট ছোঁয়াবো, তাতেই আমাদের ঘুম এসে যাবে, আমরা পাশাপাশি ঘুমিয়ে পড়বো, জেগে উঠে দেখবো আমরা পাশাপাশি শুয়ে আছি, আমাদের একজনের হাতে আরেকজনের হাত। রওশন যদি কখনো ব্লাউজ পরতে গিয়ে পরতে না পারে, যদি আমার চোখের সামনে তার দুধ দুলে ওঠে? আমি চোখ বন্ধ করে ফেলবো, আমি অতো অসভ্য হতে পারবো না, আমরা কোনো অসভ্য কাজ করবো না, আমরা শুধু হাত ছুঁয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবো, আমরা শুধু ভালোবাসবো।

রওশন একটি চিঠি লিখেছে আমাকে, প্রথমে আমি বুঝতেই পারি নি ওটি কী; আমাকে সে চোখ বন্ধ করতে বলে, আমি চোখ বন্ধ করি, অমন সময় শওকত এসে ঢোকে, আর রওশন বলে ওঠে, চোখ খোলো, খোলো; আমি চোখ খুলে শওকতকে দেখে একটু বিব্রত হই, কিন্তু রওশন বলে, আমরা আজ চোখ খোলা চোখ বন্ধ করা। খেলছি। শওকতও চায় চোখ ভোলা চোখ বন্ধ করা খেলতে। রওশন শওকত ও আমাকে চোখ বন্ধ করতে বলে, আমরা চোখ বন্ধ করি; আমি টের পাই রওশনের হাত ঢুকছে আমার বা পকেটে, রওশন কী যেনো রাখছে। শওকত চোখ বন্ধ রেখে অস্থির। হয়ে ওঠে, বলতে থাকে, চোখ তো বন্ধ করেছি, কিন্তু খেলা তো হচ্ছে না। যে-খেলাকে আমার মনে হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলা,

যা খেলার জন্যে আমি সারাজীবন চোখ বন্ধ করে রাখতে পারি, তা খেলাই মনে হচ্ছে না শওকতের! রওশন আমার পকেট থেকে হাত বের করে বলে, এবার বলো টেবিলের ওপর কী রেখেছি। শওকত বলে, পেন্সিল; আমি বলি, চাঁদ; তখন রওশন একবার আমার হাত ধরে, তার হাত থেকে আমার হাতে অলৌকিক শিখা সঞ্চারিত হয়, রওশন হাত ছেড়ে দিয়ে আমাদের চোখ খুলতে বলে। টেবিলে পেন্সিল দেখে খুব খুশি হয় শওকত, এবং পেন্সিল নিয়ে। বেরিয়ে যায়। রওশন আমার হাত ধরে বলে, বাড়ি গিয়ে দেখবে কী আছে, এখন কিন্তু দেখবে না। না, আমি দেখবো না; আমার পকেটে এখন রয়েছে চিরকালের চরম। বিস্ময়, কোনো অসম্ভব শূন্যোদ্যান বা পিরামিড বা তাজমহল; সবচেয়ে দামি মাণিক্য, পরশপাথর, যার ছোঁয়ায় আমার পকেট সোনা হয়ে যাচ্ছে, মাণিক্য হয়ে যাচ্ছে, তা দেখার জন্যে আমি যুগযুগ অপেক্ষা করতে পারি। একটি অদ্ভুত কাজ করে রওশন আজ; সে তার দু-মুঠোতে আমার হাতটি পুজোর ফুলের মতো ধরে ওপরে উঠোতে থাকে, আমার হাত বিবশ হয়ে যায়, অঞ্জলিতে আমার হাত নিয়ে রওশন তার ঠোঁটে ছোঁয়ায়, ধীরেধীরে তার বুকের মাঝখানে কোমলভাবে ধরে রাখে। কোমলতা, কোমলতা, কোমলতা; আমার জগৎ কোমলতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়, আমি বোধ করতে থাকি দুটি কোমল গোলাকার স্বর্গীয় গন্ধমের মাঝখানে স্থাপিত রয়েছে আমার হাত, স্থাপিত রয়েছি আমি; আমার পক্ষে ওই কোমলতা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, আমি ফেটে পড়তে থাকি, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাই, আমি গলে যাই, আমি ঝরনা হয়ে বইতে। থাকি। রওশন আমার হাত ছেড়ে দিলে আমি টেবিলে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে আবার আমি হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে থাকি।

আমার বয়স পনেরো, রওশনেরও পনেরো; পাঠ্যবইয়ের বাইরে আমি বেশি কিছু পড়তে পাই নি; রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা পড়েছি চয়নিকায়, তাঁর গল্পও পড়েছি; শর ৎচন্দ্রের

চারপাঁচটি উপন্যাস পড়েছি; ওগুলো পড়ে আমার বুক সুখে ভরে গিয়েছিলো; রওশনের চিঠি পড়ার পর মনে হতে থাকে এ-পর্যন্ত আমি যা কিছু পড়েছি তা খুবই তুচ্ছ, খুবই বানানো; রওশনের মতো কখনো কেউ কিছু লিখতে পারে নি। রওশনের। প্রতিটি শব্দ নতুন মনে হয় আমার, ওই সমস্ত শব্দ এর আগে কেউ কখনো ব্যবহার করে নি, রওশন আমার জন্যে নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছে, এবং প্রতিটি শব্দকে মধু মেঘ অমৃত চাঁদ শিশির পাখির পালক ঘুঘুর ডাক কোকিলের গান রজনীগন্ধা শিউলি জ্যোৎস্না জলের শব্দে ভরে দিয়েছে। আমি রওশনের চিঠি পড়তে শুরু করি, একনিশ্বাসে পড়ে ফেলি; লাল লাইন টানা কাগজে মাত্র একপাতা লিখেছে রওশন, হাজার পাতা লিখলেও আমার পড়তে একনিশ্বাসের বেশি লাগতো না। বারবার আমি তার চিঠি পড়ি, একটু পরই আমার মুখস্থ হয়ে যায়; মায়ের ডাক শুনে আমি রওশনের চিঠির ভাষা বুকের ভেতরে আবৃত্তি করতে করতে ভাত খেতে নিচে নামি, খাওয়ার সময়ও বুকের ভেতর তার চিঠি আবৃত্তি করতে থাকি, আমার ভয় করতে থাকে মা হয়তো আমার বুকের আবৃত্তির শব্দ শুনে ফেলবে, খাওয়া শেষ করে টেবিলে ফিরে এসে আবার তার চিঠি মুখস্থ করি। আমি কোনো পবিত্রগ্রন্থের পাতা পড়ছি, যেনো এইমাত্র একটি নতুন পবিত্রগ্রন্থের পাতা আকাশ থেকে পড়েছে, এমন মনে হয় আমার; তার একটি অক্ষরও ভুল পড়া যাবে না, একটি শব্দও ভুল করা যাবে না, তাকে বুকের ভেতর এমনভাবে ধারণ করতে হবে যাতে জন্মেজন্মে অসংখ্য মৃত্যুর পরও কোনো ভুল না হয়। আমার হৃৎপিণ্ড রওশনের চিঠি মুখস্থ করে, আমার রক্তকণিকারা রওশনের চিঠি মুখস্থ করে, আমার ওষ্ঠজিভ রওশনের চিঠি মুখস্থ করে, আমার মাংস রওশনের চিঠি মুখস্থ করে; এবং তারা সবাই সম্মিলিতভাবে আমাকে ঘিরে ওই অলৌকিক শ্লোক আবৃত্তি করতে থাকে; ওই অলৌকিক ধ্বনিপুঞ্জে আমার সত্তা মুখর হয়ে ওঠে।

কয়েক মাসে আমরা কয়েক শো চিঠি লিখি, হয়তো চার শো বা পাঁচ শো হবে, বেশিও হতে পারে। প্রথম আমরা প্রতিদিন একটি করেই চিঠি লিখি, কিন্তু তিনচার দিন পর মনে হয় একটি চিঠিতে আমাদের প্রকাশ করা অসম্ভব। এটা রওশনই প্রথম বোধ করে। আমি বিকেলে যাই রওশনদের বাড়ি, গিয়ে আমার চেয়ারটিতে বসি; শওকত ঘর থেকে বেরোলেই রওশন কোমর থেকে চিঠি বের করে আমাকে দেয়, আমি পকেটে রাখি; আর আমি পকেট থেকে বের করে রওশনকে দিই, সে তার। কোমরে রেখে দেয়। একদিন ফিরে এসে দেখি রওশন তিনটি চিঠি লিখেছে। প্রথম চিঠিটি সে লেখে সকালবেলা, দুপুরেই তার বুকে অনেক কথা জমে যায়, সকাল থেকে দুপুরকে এক বছরের থেকে বেশি দীর্ঘ মনে হয়, তাই দুপুরে দ্বিতীয় চিঠিটি লেখে, এবং বিকেল হতে না হতেই আরেকটি চিঠি লেখে, কেননা দুপুর থেকে বিকেল আরেক বছরের থেকে বেশি দীর্ঘ। তখন থেকে আমরা দিনে দুটি তিনটি চিঠি লিখতে থাকি, লিখতে লিখতে আমাদের হাতের লেখা খুব সুন্দর হয়ে ওঠে। সম্বোধনের একটি অন্তরঙ্গ সূত্র বের করি আমরা, যা আমাদের কোনো ব্যাকরণবইতে নেই। রওশন আর আমি যখন একা, তখন আমরা বলি তুমি, যখন আমাদের পাশে কেউ থাকে, তখন বলি। তুই; আর আমাদের চিঠিতে তুমি ফিরে ফিরে আসে গানের মতো। প্রথম দিকে আমাদের চিঠি ছিলো হৃদয়ের, আমাদের হৃদয় গান গাইতো হাহাকার করতো চিঠি। ভরে, স্বপ্ন দেখতে অক্ষরে অক্ষরে; কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের মাংস কথা বলতে শুরু করে। প্রথম কয়েক দিন আমি আমার শরীরের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, হয়ে উঠেছিলাম সম্পূর্ণ আত্মা বা হৃদয়, আমার যে একটি শরীর আছে এটাই ছিলো। আমার কাছে বিব্রতকর; কিন্তু রওশনই মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের দুজনেরই শরীর আছে। শুরু করে রওশনই, একটি চিঠির শেষে রওশন লেখে, তুমিই পান করবে আমার যৌবন সুধা। আমি একথা পড়ে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠি; এর একটি শব্দও বুঝতে পারি না; তুমি, পান, আমার, যৌবন, সুধা-প্রত্যেকটি শব্দকে আমার অচেনা মনে হয়,

শব্দগুলো আমাকে মথিত করতে থাকে; আমি বুঝতে পারি না কাকে বলে পান করা, আর কাকে বলে যৌবন সুধা; আমি শুধু রক্তে পদ্মার গর্জন শুনতে পাই। হঠাৎ আমার চোখের সামনে রওশনের শরীরটি ভেসে ওঠে, তার শরীরটিকে একটি ধবধবে পানপাত্র বলে মনে হয়, আমি আর ভাবতে পারি না; আবার আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ধবধবে পানপাত্র ও রওশনের শরীর, ওই পানপাত্র আর ওই শরীর পরিপূর্ণ হয়ে আছে সুধায়, যৌবন সুধায়, আমি দু-হাতে ধরে ওই ধবধবে পাত্র থেকে সুধা পান করছি-ভাবতেই আমার সমস্ত শরীর জুড়ে রাশিরাশি বজ্রপাত হতে থাকে। আমি একঝলকে রওশনকে সম্পূর্ণ নগ্ন দেখতে পাই।

তবে আমি অমন অসভ্য হবো না, আমরা অমন অসভ্য হবো না; আমরা শুধু হাতে হাত রাখার বেশি কখনো কাউকে ছোঁবো না। অসভ্যরাই অমন করে। বিয়ে করে। অসভ্য মানুষেরা কী করে? একটি বই পড়েছি আমি, খুব নোংরা বই, না অমন নোংরা কাজ আমরা কখনো করবো না। আমরা যখন বিয়ে করবো তখন কি রওশন ভোরবেলা গোসল করবে? রওশন যদি চায়, তাহলে ভোরবেলা গোসল করবে, আমিও করবো; দুজনে ঘুম থেকে উঠে একসাথে ঘাটে গিয়ে গোসল করবো, সাঁতার দিয়ে আমরা। মাঝপুকুরে চলে যাবো, শাড়িতে জড়িয়ে গেলে আমি রওশনকে জড়িয়ে ধরে সাঁতরে ঘাটে নিয়ে আসবো, আমাদের শরীর থেকে কুয়াশা উঠতে থাকবে, সাবানের গন্ধ। বেরোবে শরীর থেকে, রওশন তার শাড়িটা ঘাটে গোল স্কুপ করে রেখে আসবে, দূর থেকে ওটি দেখে আমার ভালো লাগবে; তার লাল পেড়ে শাড়ি যখন ডালিম গাছের নিচের তারে বাতাসে দুলবে, দেখে সুখে আমার বুক ভরে যাবে। কিন্তু আমরা ভোরবেলা গোসল করবো কেনো? সারারাত জেগে জেগে কথা বলতে বলতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়বে বলে? নাকি বিয়ে করলে ভোরবেলা গোসল করতে হয় বলে? না, ওই বইটায় যে-কথা লিখেছে, সে-জন্যে? আমরা অমন কাজ কখনো করবো

না। কিন্তু রওশন যদি চায়? রওশন কি অতো খারাপ হবে? রওশনের সামনে আমি কখনো কাপড় খুলতেই পারবো না, আমার ভীষণ লজ্জা লাগবে; আমি কখনো রওশনকে উলঙ্গ দেখতে পারবো না। কিন্তু রওশন যে লিখেছে, তুমিই পান করবে আমার যৌবন সুধা, তা আমি পান করবো কীভাবে? কীভাবে রওশন আমাকে পান করতে দেবে তার যৌবন সুধা? যৌবন তো আসবে আমাদের দুজনেরই, এসে যাচ্ছে দুজনেরই, কিন্তু কোথায় জমছে কোথায় জমবে সুধাঃ রওশনের সুধা কোথায় জমবে? আমার হাতে আমি দুটি কোমল গন্ধমের ভয়ঙ্কর কোমলতা অনুভব করি, যেখানে একদিন রওশন স্থাপন করেছিলো আমার হাত, সুধা কি জমবে সেখানে? তাহলে তো রওশনের অনেক সুধা জমে গেছে, সুধা তার বুক হয়ে ফুলে উঠেছে। আমি কি পান করবো ওই সুধা, ওই সুধা পান করবো আমি? আমি আর ভাবতে পারি না, আমার রক্ত এলোমেলো হয়ে যায়।

কাদির ভাই আমাকে পছন্দ করছে না আজকাল, আমাকে দেখলে বিব্রত বোধ। করছে, আমাকেও একটু বিব্রত করতে চাইছে। আগে আমাকে দেখলেই দাঁড়িয়ে কথা বলতো, আমি যে প্রবেশিকায় ইস্কুলের জন্যে গৌরব নিয়ে আসবো, যা আমাদের ইস্কুল কখনো পায় নি, তা আমি এনে দেবো, এমন কথা বলতো; এখন কাদির ভাই আমার সাথে কথাই বলতে চায় না। বেশ মজা লাগছে আমার, তবে কাদির ভাইয়ের মজা। লাগছে না, আমি বুঝতে পারি; তার চামড়া আর চামড়ার নিচের মাংস জ্বলছে বলেই মনে হচ্ছে। কাদির ভাই দু-বার আইএ ফেল করে আমাদের পাশের ইস্কুলে পড়ায়; বিকেলে বাড়ি এসে পড়ায় রওশন আর শওকতকে। রওশনকে পড়ায় বলে সে গৌরব বোধ করে; আমাদের সাথে আগে যখন রওশনের কথা বলতে একটু গর্বই বোধ। করতো, একটু কেঁপে উঠতো। আমি যে আজকাল রওশনদের বাড়ি প্রত্যেক বিকেলে যাচ্ছি, এটা তার ভালো লাগছে না। সে জানে না এটা আমার আর রওশনের খুব ভালো লাগছে; আর এটা যে আমাদের খুব ভালো

লাগছে জানলে তার আরো খারাপ লাগতো। আগে চারটার মধ্যেই তার পড়ানো শেষ হয়ে যেতো, এখন সাড়ে চারটা বাজলেও শেষ হতে চাচ্ছে না, কোনো কোনো দিন পাঁচটা বেজে যাচ্ছে।

আমি একদিন সাড়ে চারটার সময় পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকতেই রওশন চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠে, স্যার, সাড়ে চারটা বাজে, মাহবুব এসেছে, আর পড়বো না। শওকতও তাই বলে

তোমার আরো অনেক পড়া বাকি আছে, কাদির ভাই একটি খাতা দেখতে দেখতে বলে।

সব খাতা তো আপনার দেখা হয়ে গেছে, রওশন বলে।

না, এখনো সব দেখা হয় নি, কাদির ভাই মন দিয়ে খাতা দেখতে থাকে, এবং আমাকে বলে, মাহবুব, তুমি আজকাল পড়াশোনা করো না মনে হয়।

আমি কোনো উত্তর দিই না, উত্তর দেয় রওশন; বলে, মাহবুবের পড়ার আর কিছুই নেই, সব তো মাহবুবের মুখস্থ।

তুমি মাহবুবের খবর রাখো কী করে? কাদির ভাই বলে।

আমি মাহবুবের সব খবর রাখি, রওশন বলে, আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন না, সব খবর বলে দেবো। বলে রওশন আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। আমিও হাসি।

তবু কাদির ভাইয়ের খাতা দেখা শেষ করার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না; সন্ধ্যা হয়ে। গেলেও খাতা দেখতে থাকবে মনে হয়। রওশন আমার দিকে তাকিয়ে হাসে, এবং বলে, স্যার, সেদিন আপনি দুটি অংক ভুল করেছিলেন।

কাদির ভাই চমকে ওঠে, রওশন একটি খাতা বের করে।

স্যার, এ অংক দুটি ভুল হয়েছে। মাহবুব নিচে শুদ্ধ করে দিয়েছে। রওশন একবার আমার দিকে তাকিয়ে খাতাটি কাদির ভাইয়ের সামনে খুলে ধরে। কাদির ভাই খাতাটি ছিনিয়ে নিয়ে নিজের করা অংক দুটি পড়তে থাকে, পড়তে গিয়ে ভুল করে, আবার পড়ার চেষ্টা করে, নিচে আমার করা অংক দুটি পড়তে থাকে, শেষে নিজের করা। অংকের ভুল ধরতে পেরে বলতে থাকে, আইচ্ছা, ক্যামনে এই ভুলটা হইল, আইচ্ছা ক্যামনে এই ভুলটা হইল- বলতে বলতে চেয়ার থেকে উঠে পড়ে। খুব বিপর্যস্ত হয়ে। পড়েছে কাদির ভাই; আমার দিকে তাকাতে পারছে না; প্রত্যেক দিন বেরোনোর সময়

সে একবার রওশনের দিকে তাকায়, আজ রওশনের দিকেও তাকাতে পারছে না। রওশন তাকে সালাম দেয়, কাদির ভাই কেঁপে কেঁপে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, সাথে শওকতও; আর অমনি আমাদের বুক থেকে কলকল করে হাসি বেরোয়, এবং আমাদের হাত একে অন্যকে ধরে সুখী হয়ে ওঠে। ওরা অনেকক্ষণ ধরে বড়ো কষ্টে ছিলো।

জানো, রওশন তার চোখ দুটি আমার দু-চোখের ভেতরে বল্লমের মতো ঢুকিয়ে দিয়ে বলে, কাদির স্যার আজকাল তোমাকে একদম দেখতে পারছে না।

আমি যে খুব খারাপ ছেলে, লেখাপড়া করি না, তাই, আমি হেসে বলি, আর মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি রওশনের চোখের দিকে, তার ঠোঁটের দিকে। রওশন কী চম। কারভাবে যে তার ঠোঁট নাড়ে, নিচের ঠোঁট ছোঁয়ায় ওপরের ঠোঁটের সাথে, আর দাঁত দিয়ে তার ঠোঁট কাটে!

তুমি খুব খারাপ ছেলে হলে আমি খুব খারাপ মেয়ে, রওশন হাসে, আর বলে, কাদির স্যারের আজ খুব শিক্ষা হলো।

এমনভাবে শিক্ষা না দিলেও পারতে, আমি বলি, গুরুজন তো।

না দিয়ে কী করি? প্রত্যেক দিন কাদির স্যার তোমার নিন্দা করে, রওশন বলে, তাই ঠিক করে রেখেছিলাম একদিন স্যারকে ভুল অংক দুটি দেখাবো। ভুল ইংরেজিটা তো বাকিই রইলো। রওশন হাসে, আর আমার দিকে চোখ দুটি স্থির করে বলে, তোমাকে কেউ নিন্দা করলে আমার একদম ভালো লাগে না, কান্না পায়। আমাকে কেউ নিন্দা করলে তোমার ভালো লাগে, বলো?

না, লাগে না, কোনো দিন লাগবে না, আমি বলি।

তোমাকে নিয়ে আমি কত স্বপ্ন দেখি, রওশন বলে, আমাকে নিয়ে কি তুমি স্বপ্ন দেখো?

দেখি, দিনরাত স্বপ্ন দেখি, আমি বলি।

তুমি দূরে চলে যাচ্ছো ভাবলে আমার কান্না পায়, রওশন বলে; এবং আমার। দু-হাতের মুঠো তার মুঠোর ভেতরে নিয়ে তার দু-চোখের ওপর চেপে ধরে; রওশনের দীর্ঘশ্বাসে আমার হাত দুটি কোমল হয়ে ওঠে।

আমি শিউরে উঠে দেখি রওশনের চোখের জলে আর দীর্ঘশ্বাসে আমার আঙুল ভিজে গেছে। রওশনের মুখের দিকে তাকাই আমি; আগে কখনো যা দেখি নি সে-অসম্ভব। সুন্দরকে দেখতে পাই রওশনের চোখে। অশ্রু। শব্দটি আমি জানি; কিন্তু এর সৌন্দর্য আমি কখনো দেখি নি; রওশনের চোখের কোণায় যে-সৌন্দর্য টলমল করে, যা একটি বিন্দু কিন্তু যা মহাসাগরের থেকেও বিশাল, তা-ই অশ্রু। রওশন দুঃখ পাচ্ছে, ওই দুঃখে রওশন সুন্দর হয়ে উঠেছে, আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি তার মুখের দিকে, সুন্দর। দুঃখের দিকে। এতো দিন আমি রওশনের হাসি দেখেছি, তার ঝিলিকে আমার হৃদয় ভরে গেছে, রওশনকে সুন্দর লেগেছে; কিন্তু আজ দেখছি ভিন্ন সৌন্দর্য, যা অশ্রুতে সাজানো; এতো সুন্দর আর কখনো লাগে নি রওশনকে। দুঃখকে আমার সুন্দর মনে হয়, আমি চোখ ফিরিয়ে নিতে পারি না। এক সময় মনে হয় রওশন নিজেই একটি অশ্রুবিন্দু হয়ে গেছে, আমার পাশে টলমল করে কাঁপছে, এখনই গলে কাঠের পাটাতনের ওপর। মিশে যাবে, আমি তাকে কোথাও খুঁজে পাবে না।

আমি কখনো দূরে যাবো না, আমি বলি।

তুমি চলে যাবে, আমি জানি, তুমি চলে যাবে, রওশন বলে, আর কয়েক মাস মাত্র। তখন আমাকে ভুলে যাবে।

কখনো দূরে যাবো না, তোমাকে কখনো ভুলবো না, আমি বলি; আমার মুঠোতে রওশনের হাত কাঁপতে থাকে।

তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না, বাঁচার ইচ্ছে হবে না, রওশন বলে, তুমিই আমার সব।

আমি রওশনের মুখের দিকে তাকাই, তার মুখটি আমি সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছি না, সে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছি তার ঠোঁট কাঁপছে। আমরা দুজন একই বয়সের, কিন্তু এখন রওশন যেভাবে আমার মুঠো ধরে আছে, যেভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে, ঠোঁট কাঁপছে, তাতে রওশনকে মনে হচ্ছে নারী, নিজেকে মনে হচ্ছে পুরুষ। বাড়ি ফেরার সময় এ-অনুভূতি আমাকে আলোড়িত করে তোলে, মনে হতে থাকে আমি পুরুষ, আমি রওশনের সব, রওশন আমাকে ছাড়া বাচবে না। নিজেকে আমার কেন্দ্র মনে হয়; রওশন আমাকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে, আমাকে কেন্দ্র করেই বেঁচে আছে। এখন থেকে আমি রওশনকে হাসাতে পারি, আমি চাইলে সে রৌদ্রের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠবে; আমি রওশনকে কাঁদাতে পারি, আমি চাইলে সে শ্রাবণের মতো কাঁদবে। নিজেকে পুরুষ ভেবে একটা বিস্ময়কর সুখ আমি বোধ করি। রওশনের চোখের জল আমার চোখে সুন্দর লেগেছে, তার আরো চোখের জল দেখতে আমার ইচ্ছে হয়, আগামীকালও তার চোখের জল আমার দেখতে ইচ্ছে হয়। কীভাবে দেখবো? আগামীকাল আমি রওশনদের বাড়ি যাবো না; রওশন নিশ্চয়ই আমার জন্যে অপেক্ষা। করবে, অপেক্ষা করে করে কষ্টে রওশনের বুক ভরে যাবে, তার কান্না পাবে, তার চোখ জলে ভরে উঠবে। পরের দিন বিকেলে আমি যাবো, দেখবো রওশনের চোখে জল। কিন্তু আগামীকাল রওশনকে না দেখে থাকতে আমার কষ্ট হবে, তার হাত না। ছুঁলে আমার কষ্ট হবে; আগামীকাল আমি রওশনদের বাড়ি যাবো, পরে যখন রওশনের চোখের জল দেখতে ইচ্ছে হবে, তখন এক বিকেলে যাবো না; আমার

কথা ভেবে ভেবে কষ্টে রওশনের বুক ভরে যাবে। রওশন, আমার জন্যে অপেক্ষা-করে-থাকা অশ্রুবিন্দু; রওশন, আমার জন্যে বুক-ভরে-ওঠা দীর্ঘশ্বাস; রওশন, আমার জন্যে টলমল-করা সুন্দর দুঃখ।

রওশন আমাকে সৃষ্টি করে চলছে; প্রত্যেক বিকেলে রওশনের সাথে দেখা হওয়ার পরই আমি বদলে যাচ্ছি একটু একটু করে; রওশন আমাকে যেমন দেখতে চায়, আমি তেমন হয়ে উঠছি; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষটি হয়ে উঠছি আমি, রওশন আমাকে তা-ই দেখতে চায় বলে। আমি যে পুরুষ, এটা আমার মনে আসে নি; রওশনই আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে, আমার ভেতরে একটি সিংহকে জাগিয়ে দিয়েছে রওশন। আগে যখন আমরা তুই বলতাম, তখন সমান ছিলাম দুজনেই; কিন্তু তুমি বলার পর থেকে রওশনই একটু একটু করে আমাকে তার থেকে ওপরে উঠিয়ে দিচ্ছে, আমাকে সিংহাসনে বসাচ্ছে, সে বসছে সিংহাসনের পাশে মেঝের ওপর। সিংহাসনে তার বসার। কোনো ইচ্ছে নেই, যেনো সে বসেও সুখ পাবে না; আমাকে বসাতে পারলেই বেশি সুখ পাবে। রওশন কথায় কথায় বলে, তুমি তো ছেলে, তুমি তো পুরুষ; তাই আমি সব। পারি, সব আমার পারা উচিত; রওশন চায় বলেই আমার পারা উচিত বলে আমার। মনে হয়। রওশনের কথায় আমি গর্ব বোধ করি। একদিন আমার হঠাৎ মনে হয় রওশন সব সময় আমার পাশে দাঁড়িয়েই থাকে; আমি চেয়ারে বসে থাকি, রওশন দরোজার পাশে আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, বসে না। রওশনের দাঁড়িয়ে থাকার একটি সুবিধা হচ্ছে আমরা যে হাত ধরে আছি সেটা কেউ দেখতে পায় না উঠোন থেকে; কিন্তু আমি অন্য চেয়ারে গিয়েও দেখেছি, রওশন দাঁড়িয়েই থাকে, খুব দরকার না হলে বসে না।

রওশন, তুমি বসো, আমি বলি।

না, তোমার পাশে আমার দাঁড়িয়ে থাকতেই ভালো লাগে, রওশন বলে।

শুনে আমার ভালো লাগে, এবং আমি জানতে চাই, কেনো?

রওশন হাসে আর হাসে, আমার আঙুল নিয়ে খেলে, আর বলে, তা বলবো না, তা বলবো না।

শুনে আমার আরো ভালো লাগে, অন্তত একজন আছে, তার নাম রওশন, যার। ভালো লাগে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে।

আমি বলি, রওশনকে একটু কষ্ট দেয়ার জন্যেই বলি, যদি না বলো, তাহলে আর আসবো না।

রওশনের চোখে অশ্রুর সৌন্দর্য দেখা দেয়, আমি মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকি।

রওশন বলে, তুমি পুরুষ, তাই এতো নিষ্ঠুর কথা বলতে পারলে, আমি কখনো বলতে পারবো না।

আমি পুরুষ, আমার মনে হতে থাকে, রওশনের থেকে আমার স্থান উঁচুতে; আমি নিষ্ঠুর হতে পারি, রওশন পারে না; নিষ্ঠুরতাকে গৌরবের বলে মনে হয় আমার। আমি পুরুষ, নিষ্ঠুর হবো; রওশন নারী, অশ্রু হবে।

রওশন আমার বুকের সিংহকে আরো জাগিয়ে দেয়; বলে, তোমাকে নিয়ে আমি কতো গর্ববোধ করি! তোমাকে নিয়ে আমার কতো স্বপ্ন!

শুনে আমার বুক স্ফীত হয়ে ওঠে, গর্বে আমি পুরুষ হয়ে উঠি। আমাকে নিয়ে রওশন গর্ব বোধ করে, এটা আমার গর্ব। আমি কি গর্ব বোধ করি রওশনকে নিয়ে? হ্যাঁ, আমিও একরকম গর্ববোধ করি রওশনকে নিয়ে, সেটা হচ্ছে রওশন আমাকে ভালোবাসে, আর কাউকে বাসে না; রওশন আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে, আর কারো জন্যে করে না; আমার মাথায় একটি মুকুট আছে, রওশনকে আমার মুকুটের সবচেয়ে দামি মাণিক্য বলে মনে হয়। বন্ধুরা আজকাল আমাকে খুব বেশি ঈর্ষা করছে। আমি যে প্রথম হই, সবাই জানে খুব ভালো করবো প্রবেশিকায়, কোনো অংক আমার ভুল হয় না, ইংরেজি বাঙলা সব আমার মুখস্থ, ব্যাডমিন্টনও আমি খুব ভালো খেলি, এজন্যে ওরা ঈর্ষা করে না; ঈর্ষা করে এজন্যে যে রওশন, যে সবচেয়ে রূপসী বলে বিখ্যাত আমাদের গ্রামে, তার সাথে আমার বিকেলে দেখা হয়, ওরা বুঝতে পারে। রওশন আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। ওরা আমার কাছে জানতে চায় রওশন আসলেই কতোটা সুন্দর, দূর থেকে তাকে যতো সুন্দর মনে হয় রওশন কি ততোটা সুন্দর? ওরা যে-সুন্দরের কাছে কখনো যেতে পারে নি, যার কাছে একবার যেতে পারলে ওরা আর কিছু চাইতো না মনে হয়, তার কাছে আমি প্রতি বিকেলে যাই, এর জন্যে। আমাকে ওরা ঈর্ষা করছে, আমি এটা উপভোগ করি। রওশন যে আমাকে ভালোবাসে আর আমি যে ভালোবাসি রওশনকে, একথা আমি ওদের বলি না, কখনো বলবো না; কিন্তু ওদের ঈর্ষায় আমি গর্ববোধ করি, রওশন আমাকে এ-গর্বের অধিকার দিয়েছে। আর রওশন আমাকে দিয়েছে জয় করার অভিলাষ। রওশন আমাকে নিয়ে গর্ববোধ করে, তার গর্ব আমার রক্ষা করতে হবে; তাই আমি ওই বিকেলের

সময়টুকু ছাড়া বই ছেড়ে উঠি না। রওশন আমাকে নিয়ে গর্ববোধ না করলে আমি এতো পড়তাম না, পড়ছি। আমি রওশনের জন্যে, সে যেনো আমাকে নিয়ে গর্ব বোধ করে, চিরকাল গর্ববোধ করে, তাই আমি পড়ি, পড়ে আমি সুখ পাই। আগেও আমি পড়েছি, কিন্তু এতো সুখ পাই। নি; পড়া আমার জন্যে আনন্দ হয়ে উঠেছে, রওশনের জন্যে; ফিরে ফিরে পড়া সুখ হয়ে উঠেছে আমার, রওশনের জন্যে, আমি প্রতিটি অক্ষরে রওশনের মুখ দেখতে পাই, প্রতিটি অক্ষরে দেখতে পাই রওশন আমাকে নিয়ে গর্ববোধ করছে। রওশন আমাকে সৃষ্টি করে চলছে, রওশন আমাকে পুরুষ করে চলছে।

রওশন, একটি চিঠিতে লিখেছে, আমাকে তোমার কেমন লাগে, আমার মুখ তোমার কেমন লাগে, আমার ঠোঁট তোমার কেমন লাগে, আমার চুল তোমার কেমন। লাগে, আমার চিবুক তোমার কেমন লাগে, আর আর আর আর আমার আমার আমার আমার আমার আমার বুক তোমার কেমন লাগে? এটুকু পড়ে আমার চারপাশ দপ করে জ্বলে ওঠে, আমি আগুনের মধ্যে পড়ে যাই, জ্বলতে থাকি; আমার মেঘে মেঘে ঘর্ষণ চলতে থাকে, বিদ্যুতের ঝিলিকে আমার আকাশ ফালা ফালা হয়ে যায়। আমি ঘুমোতে পারি না, শুধু স্কুপ স্তূপ শুভ্রতা, রজনীগন্ধার পাহাড়, ঢেউ, খড়ের গম্বুজ দেখতে থাকি; রওশনের চিঠি পড়ি-আর আর আর আর আমার আমার আমার আমার আমার। পরের শব্দটিতে এসে কেঁপে উঠি আমি। আমি কী লিখবো এর উত্তরে? আমি কি লিখবো যা আমার স্বপ্ন তাকে আমার কেমন লাগে এ-অসম্ভব প্রশ্নের উত্তর আমি কীভাবে দেবো? আমার লেখার শেষ নেই এর উত্তরে, আমি হাজার হাজার বছর ধরে এর উত্তর লিখতে পারি। কিন্তু কিছুই আমি লিখে উঠতে পারি না। আমি এই প্রথম কোনো উত্তর দিতে পারি না। আমার আমার আমার আমার ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি আমি, ঘুম থেকে উঠে চারদিকে আমি স্কুপ স্তূপ শুভ্রতা দেখতে থাকি।

বিকেলে রওশনদের বাড়ি যাই, রওশনের মুখের দিকে আমি তাকাতে পারি না। রওশন তার চিঠিগুলো আমার হাতে দেয়, আমি কোনো চিঠি দিতে পারি না।

আমারগুলো? রওশন অবাক আর আহত হয়ে বলে।

লিখতে পারি নি, আমি মাথা নিচু করে বলি। কেননা পারো নি?

রওশন খুব দুঃখ পায়, আর বলে, আমাকে তুমি শুধু কষ্ট দিতে ভালোবাসো।

না, তা নয়, আমি বলি, আমি বুঝতে পারি নি...।

রওশন দু-হাতে আমার মুখ ধরে বলে, আমি জানতে চাই, চাই, চাই, কেমন লাগে তোমার আমার মুখ, আমার চোখ, আমার...।

এমন সময় শওকত এসে ঢোকে, আমি মুক্তি পাই।

কালকে আমরা কান্দিপাড়া বেড়াতে যাচ্ছি, শওকত হাসতে হাসতে বলে, কালকে কিন্তু রওশন মাহবুবকে দেখতে পাবে না।

আমি যাবো না, রওশন বলে; আমার দিকে কোমলভাবে তাকায়।

কেনো যাবে না? আমি জিজ্ঞেস করি।

আমার ইচ্ছে, রওশন বলে, কান্দিপাড়া কী আছে দেখার?

নদী আছে খাল আছে ইলিশ আছে, শওকত হাসে, কিন্তু মাহবুব নেই।

ঠিক আছে, রওশন বলে, তাহলে মনে করো সেজন্যেই আমি যাবো না।

রওশন চিবুকে আঙুল রেখে চুপ করে থাকে, যেনো সে আর কথা বলবে না; তার। চুপ করে থাকার ভঙ্গি দেখে তাকে আমার জড়িয়ে ধরার ইচ্ছে হয়, তার চিবুকে আমার নাক ঘষার ইচ্ছে হয়। রওশন ব্যথা পাচ্ছে, কিন্তু আমার বুক সুখে ভরে ওঠে; রওশন। বেড়াতে যাবে না, আমার জন্যেই যাবে না, কান্দিপাড়া দেখার কিছু নেই আমি সেখানে। নেই বলে। রওশন যদি কথাটি খুব চুপেচুপে আমাকে বলতো, তাহলেই আমার রক্ত। মধু হয়ে উঠতো, বাঁশি বাজতে থাকতো আমার সমস্ত নদীর পারে আর কাশবনে, কিন্তু রওশন চুপেচুপে বলে নি, শওকতকে শুনিয়ে বলেছে, সারা পৃথিবীকে রওশন জানিয়ে দিয়েছে সে কান্দিপাড়া বেড়াতে যাবে না, কেননা সেখানে আমি নেই। আমার ইচ্ছে হচ্ছে বাইরে গিয়ে আমি বন্ধুদের ডেকে জানিয়ে দিই যে রওশন কান্দিপাড়া বেড়াতে যাবে না, কেননা সেখানে দেখার কিছু নেই, কেননা সেখানে আমি নেই। চঞ্চলভাবে ঘর থেকে আমার ছুটে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়, কিন্তু আমি বেরোতে পারি না।

শওকত বেরিয়ে যেতেই রওশন আমার হাত ধরে। আমিও ধরার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ছিলাম, ভেবেছিলাম আজ রওশনের হাত আমিই প্রথম ধরবো, অভিমানে রওশন হয়তো আমার

হাত ধরবে না। বিষণ্ন চাঁদের মতো তার মুখ আমার দিকে তুলে ধরে রওশন। বলে, আজ তোমাকে একটি শাস্তি পেতে হবে।

খুব কঠিন শাস্তি? আমি জানতে চাই।

তোমার জন্যে কঠিনই, রওশন বলে, খুব কঠিন। রওশন আমার দুটি হাতই তুলে নিয়েছে তার হাতে।–আমি তৈরি, আমি হাসি আর বলি, দাও, শাস্তি দাও, খুব কঠিন শাস্তি দিয়ো, তারপর ক্ষমা কোরো।

সন্ধ্যা হলেই, রওশন বলে, তুমি আজ বাড়ি যেতে পারবে না, আমার সাথে সন্ধ্যার পরও অনেকক্ষণ তুমি থাকবে। সন্ধ্যার পরও আমি তোমাকে দেখতে চাই, তোমার মুখ দেখতে চাই, তোমার কথা শুনতে চাই। রওশন একটু থেমে বলে, আর সন্ধ্যার পরও তুমি আমাকে দেখো, আমি চাই।

রওশন আমার দিকে তাকিয়ে ধ্রুবতারার মতো জ্বলতে থাকে, তার চোখ থেকে। মুখ থেকে আলো না শিশির না কী যে ঝরতে থাকে, আমি তা বুঝতে পারি না; আমার শুধু ইচ্ছে করে রওশনের চোখ আর মুখ থেকে যা ঝরে পড়ছে, যার নাম আমি কোনো দিন জানবো না, তার সবটুকু আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্যে ধরে রাখতে। রওশনের দিকে আমি তাকিয়ে থাকি, আমার রক্তমাংস সবুজ কোমল ঘাস হয়ে মাঠের পর মাঠে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

শওকত ফিরে এলেই রওশন বলে, জানো, একটি সুসংবাদ আছে, সন্ধ্যার পরও মাহবুব আমাদের সাথে থাকবে। রওশন এমনভাবে বলে যেনো শওকত এ-সংবাদ শোনার জন্যে বছরের পর বছর অপেক্ষা করে আছে।

শওকত হেসে বলে, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে মাহবুব সারারাত থাকবে না।

তুমি বেশি দুষ্টু হয়ে যাচ্ছো, রওশন রেগে ওঠে, তার রাগ থেকে বোঝা যায় সত্যিই কষ্ট পাবে একজন; তখন কী সুন্দর যে লাগে রওশনকে।

৩. সন্ধ্যার পর ঘরটিতে আমরা তিনজন

সন্ধ্যার পর ঘরটিতে আমরা তিনজন। চারপাশে অন্ধকার, ঘরের চালের ওপর। নারকেলপাতার শব্দ হচ্ছে মাঝেমাঝে, শিরশিরে বাতাস ঢুকছে কাঁঠালপাতার ভেতর দিয়ে। রওশনের আব্বা একবার উঁকি দেন; আমাকে দেখে তিনি খুশি হন, জানালাগুলো লাগাতে লাগাতে বলেন, ওদের একটু দেখিয়ে দিয়ে তো। বাইরে শীতের বাতাস, কিন্তু ভেতরে আমরা, রওশন আর আমি, উষ্ণ হয়ে আছি। আমার ডান পায়ের পাতার ওপর রওশনের বা পায়ের পাতা, রওশনের ডান পায়ের পাতার ওপর আমার বা পায়ের পাতা। মনে হচ্ছে কনকনে শীতের মধ্যে আমরা কোনো চুল্লির পাশে বসে আছি। আমরা একে অন্যের জন্যে শীতের আগুন, একজনের আগুন পোহাচ্ছি আরেকজন, আমাদের কোনো শীত লাগছে না। রওশন টেবিলের নিচ দিয়ে তার ডান হাতটি বাড়িয়ে দিয়েছে, উষ্ণ কোমল দুধের পেয়ালার মতো রওশনের হাত, আমাদের পৃথিবীতে কোনো শীত নেই।

শওকত ডান দিকের চেয়ারে চাদর গায়ে দিয়ে একটু একটু কাঁপছে; আর জানতে চাইছে, তোমাদের শীত লাগে না?

কেনো, এটা শীতকাল নাকি? আমি হাসতে হাসতে বলি।

না, এটা গরমকাল, শওকত বলে, মাহবুবের আর রওশনের জন্যে।

রওশন নিজের চাদরটা শওকতের গায়ে চাপিয়ে দিয়ে বলে, আমার গরম লাগছে, শওকত, তুমি এটিও গায়ে দাও।

শওকত রওশনের চাদরটি ফিরিয়ে দেয়, রওশন সেটি চেয়ারের পাশে রাখে, আমরা সবাই হাসতে থাকি। হারিকেনের আলোতে টেবিলের ওই পারে রওশনকে ধানখেতের ওপারে আখখেতের ওপরে শিমুল ডালের পাশে পৌষের চাঁদের মতো মনে হয়। আজ আমি আমার টেবিলে পড়তে বসি নি, আমার সামনে কোনো টেস্টপেপার নেই মেইড ইজি নেই একের ভেতরে পাঁচ নেই অভিজ্ঞ হেডমাস্টার নেই; আমার চোখের সামনে রয়েছে রওশন, যে সব বইয়ের থেকে ভালো, যার মুখে নাকে গালে চুলে ঠোঁটে আমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পড়ছি, সব অংকের সমাধান পাচ্ছি, পৃথিবীর সব ভাব সম্প্রসারিত দেখছি। কানের পাশ দিয়ে জুলপির মতো একগুচ্ছ চুল ঝুলে আছে রওশনের, মাঝেমাঝে রওশন আঙুলে জড়াচ্ছে ওই চুল, দাঁত দিয়ে কাটছে, তার ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছে, আমার দিকে স্থির করে রাখছে তার প্রদীপের মতো চোখ দুটি, আড়িয়ল বিলের উত্তরে যেমন আকাশপ্রদীপ জ্বলে। আজ সন্ধ্যায় আমি যতো পড়ছি, যতো প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করছি, ততো আর কখনো করি নি।

রওশন বলে, রাতে তুমি দেখতে অন্য রকম।

শওকত সাথে সাথে বলে, হ্যাঁ, চাঁদের মতোন। একটু থেমে বলে, এবার তুমি বলো রওশন রাতে দেখতে কেমন, শোনার জন্যে কিন্তু ইনি পাগল হয়ে আছেন।

রওশন রেগে ওঠে, না, আমি শুনতে চাই না। রওশন একটি কাগজে কী যেনো লিখে আমার হাতে দেয়, তাতে লেখা আছে। আসলে আমি শুনতে চাই আমি রাতে দেখতে কেমন?

আমি কাগজটির উল্টো পিঠে লিখি। চাঁদের আলোর মতো।

রওশন কাগজটি পড়ে হাতে ভাঁজ করে রেখে বলে, আমার কবরে একথাটি লেখা থাকবে।

শওকত বলে, এতো শিগগিরই কবরের কথা!

আমরা সবাই চুপ করে থাকি কিছুক্ষণ; যেনো কোনো প্রিয়জনের জন্যে নীরবতা পালন করি। রওশন নীরবতা থেকে উদ্ধার করে আমাদের।

রওশন বলে, তোমার চাদরটি দেখতে খুব সুন্দর, আমার গায়ে দিতে খুব ইচ্ছে করছে।

গায়ে দিয়ে দেখো না, আমি বলি, তবে চাদরটা খুব খারাপ; এবং পেছন থেকে .চাদরটি তুলে রওশনের হাতে দিই; রওশন চাঁদরের নিচে আমার হাত ধরে থাকে।

রওশন চাদরটি গায়ে জড়ায়, চাঁদরে গাল ঘষে হাত ঘষে, আর বলে, তোমার চাঁদরে মিষ্টি গন্ধ।

শওকত বলে, তিব্বত পাউডারের গন্ধ, মাহবুব তিব্বত পাউডার মাখে।

ওটা আসলে চাঁদের গন্ধ, আমি হাসতে থাকি, মাঝেমাঝে চাদর গায়ে দিয়ে আমি চাদে বেড়াতে যাই।

আমাকে নাও না কেনো? রওশন মধুর হাসিতে টেবিল ভরিয়ে দেয়।

ডানা আছে তোমার, রওশন? আমি জিজ্ঞেস করি, বলি, চাদে যেতে লাখ লাখ ডানা দরকার।

তোমার তো আছে, রওশন বলে, আমাকে তো অন্তত কয়েকটি ধার দিতে পারো। বলো দেবে? আমার চোখের হাজার হাজার মাইল ভেতরে তাকায় রওশন, তাতে আমার চোখ স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।

আমি শুধু টেবিলের নিচে রওশনের হাত আরো কোমল আরো উষ্ণ আরো উষ্ণ আরো কোমলভাবে মুঠোর ভেতরে জড়িয়ে ধরি।

রওশনের হঠাৎ মনে হয় আমার শীত লাগছে, আমি অবাক হই; আমার শীত। লাগছিলো না, আমি তো শুকনো খড়ের মতো জ্বলছিলাম, আমার শীত লাগতে পারে না; তবে আমার শীত লাগছে কি লাগছে না এটা আমার পক্ষে বোঝ হয়তো সম্ভব নয়, বুঝতে পারে শুধু রওশন; তাই রওশন যখন বলে, তোমার শীত লাগছে, তখন সত্যিই আমার শীত লাগতে থাকে। আমি রওশনের দিকে তাকাই, রওশন বুঝতে পারে আমার শীত লাগছে।

রওশন আবার বলে, তোমার শীত লাগছে; আমার চাদরটি তুমি গায়ে দাও।

আমি একটু বিব্রত বোধ করি, শওকত অবাক হয়ে তাকায় আমাদের দিকে। রওশন। চেয়ার ছেড়ে উঠে তার চাদরটি আমার গায়ে জড়িয়ে দেয়, জড়ানোর সময় আমার গ্রীবা

নরমভাবে ছোয়, তাতে আমার শরীর থেকে সব শীত দূর হয়ে যায়। এ-গ্রীবায় আর কোনো দিন শীত লাগবে না। চাদর জড়িয়ে দিয়ে রওশন চেয়ারে গিয়ে বসে টেবিলের। ওপর চিবুক ঠেকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। রাতে আমাকে কেমন দেখায় রওশন তা চোখ ভরে দেখছে।

শওকত বলে, এবার তুমি বলো রওশনের চাঁদরের কেমন গন্ধ।

আমি রওশনের দিকে তাকাই।

রওশন বলে, শওকত যখন জানতেই চায়, বলোই না, নইলে ও কষ্ট পাবে।

আমি বলি, রওশনের চাঁদরে চাঁদের আলোর গন্ধ।

রওশন টেবিলের নিচে তার মুঠোতে আমার মুঠো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে। চাঁদের আলোর গন্ধে আমার বুক ভরে যায়, আমার মাংসের বাগানে কোটি কোটি রজনীগন্ধা। ফুটতে থাকে।

শওকত হারিকেন নিয়ে খেলতে শুরু করেছে, আলো বাড়াচ্ছে আবার কমাচ্ছে; তাতে রওশনকে আরো সুন্দর লাগছে, মনে হচ্ছে সব আলো নিভে গেলে আরো উজ্জ্বল। হয়ে উঠবে রওশন। শওকত আলো বাড়াচ্ছে, কমাচ্ছে, খুব মজা পাচ্ছে; আলো কমাতে গিয়ে হঠাৎ হারিকেন নিভে যায়।

যাও, এবার নিজে হারিকেন ধরিয়ে আনো, রওশন বলে। শওকত দুজনের দিকে তাকিয়ে হারিকেন নিয়ে বেরিয়ে যায়।

শওকত বেরিয়ে যেতেই আস্তে রওশন বলে, এই, তুমি এদিকে আসো তো একটু।

আমি দাঁড়াই, চেয়ার পেছনের দিকে ঠেলে পা বাড়াই, কিন্তু পা বাড়াতে পারি না; রওশন না এক স্বপ্ন যেনো দু-হাতে সারা শরীরে জড়িয়ে ধরে আমাকে।

আমাকেও ধরো, রওশন আস্তে বলে; আমি জড়িয়ে ধরি রওশনকে। স্বপ্নকে এই প্রথম আমি বাহুর ভেতরে পাই।

রওশন আমার গালে গাল ঘষে, একরাশ কোমল পালকের মতো চুল আমার মুখের ওপর ছড়িয়ে দেয়, এবং তুমি কাল দুপুরেই আসবে বলেই আমাকে ছেড়ে দিয়ে আবার চেয়ারে গিয়ে বসে।

আমি, খসে-পড়া এক পালক, চেয়ারে বসি আবার, আমরা কোনো কথা বলতে পারি না; যে-অসম্ভব কোমলতার ভেতর কিছুক্ষণ আগে আমার শরীরটি গিয়ে পড়েছিলো, আমি সেখান থেকে উঠে আসতে পারি না, আমি আরো কোমলতার মধ্যে ডুবে যেতে থাকি। এত দিন ধরে যে-পৃথিবীতে বেঁচে আছি আমি, সেটিকে স্পর্শ। করতে গিয়ে আমার কঠিনতার বোধই হয়েছে সাধারণত; কোমলতা যা বোধ করেছি তা আমাকে জলের, মেঘের, তুলোর, ফুলের বোধের বেশি কোনো বোধ দেয় নি; রওশনের হাত ছোঁয়ার পর আমার ত্বক বুঝেছে আরো এক কোমলতা আছে পৃথিবীতে, কিন্তু আজ আমি পরম কোমলতাকে

পাই বাহুর ভেতরে বুকের ভেতরে। আমার বুক গলে যায়, আমি এখন আর রওশনকে জড়িয়ে ধরে নেই, কিন্তু আমি আমার পাজরে তাল তাল কোমলতা বোধ করছি, রওশন যে আর আর আর আর আমার আমার আমার আমার আমার কথা লিখেছিলো, সে-দুটির কোমলতা আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, পৃথিবীর সব গন্ধরাজ সব গোলাপ সব পালক আমার বুকে জড়ো হলেও এ-কোমলতাকে পাবো না আমি। এ-কোমলতা হচ্ছে রওশন। শওকত হারিকেন নিয়ে ফিরে আসে, আলোতে আমি রওশনকে চিনতে পারি না, রওশনও হয়তো চিনতে পারে না আমাকে।

বেশ রাত হয়েছে, এবার আমি উঠি। রওশন আমার সাথে নারকেল গাছ পর্যন্ত আসে। রওশনদের চাকর বারেক, যে আমার থেকে দশ বছর বড়ো হবে, হারিকেন নিয়ে চলে আমার সাথে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার জন্যে। আমি ডুবে আছি রওশনের বাহুর মধ্যে বুকের মধ্যে তাল তাল কোমলতার মধ্যে; আমি স্বপ্নের সবুজ ঘাসের প্রান্তরে। হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নগ্ধ বালকের মতো হাঁটছি।

বারেক বলে, মাহবুব ভাই, আপনে একটা মাখনের মতন বউ পাইবেন।

আমি কোনো কথা বলি না।

বারেক আবার বলে, রওশন আফা আপনার লিগা পাগল, সারা দিন পত চাইয়া থাকে। আপনে এমুন একটা বউ পাইবেন যা দুইন্নাইতে আর অয় না।

আমি কোনো কথা বলি না, বারেককে থামিয়ে দিতেও ইচ্ছে হয় না, বরং খুব ভালো লাগে বারেকের কথা। আমি চুপ করে থাকি; নইলে, আমার ভয় হয়, বারেক হয়তো বুঝে ফেলবে যে আমি মাখনের মধ্যে ডুবে আছি।

বাসায় ফিরে ভাতে আমি রওশনের কোমলতা বোধ করি, পানি পান করতে গিয়ে পানিতে আমি বোধ করি রওশনের কোমলতা, বই খুলতে গিয়ে বোধ করি ওই। কোমলতা। আমি যদি এখন লোহা ছুঁই, যদি আমার বুকে এসে লাগে কোনো পর্বত থেকে ছুটে আসা প্রকাণ্ড পাথরখণ্ড, তাহলেও আমি কোমলতা বোধ করবো। রওশন কীভাবে উঠে এসেছে চেয়ার থেকে আমি দেখি নি, কীভাবে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে আমি দেখি নি; আমাকে জড়িয়ে ধরার সময় তার মুখ কেমন দেখিয়েছে, ঠোঁট বেঁকেছে কেমনভাবে, তাও আমি দেখি নি; আমি আজ সন্ধ্যায় রওশনকে দেখেছি শুধু আমার ত্বক আর নাসিকা দিয়ে। কোমলতা আর সুগন্ধ আমাকে ঢেকে ফেলেছে। রওশনের মাংস থেকে যে-গন্ধ আমার ভেতরে ঢুকেছে, আমি তার পরিচয় জানি না; ওই গন্ধ হয়তো হরিণের হয়তো বকুলের হয়তো ঘাসের হয়তো আগুনের হয়তো মেঘের হয়তো জ্যোৎস্নার হয়তো রক্তের, আমি জানি না, আমি কোনো দিন জানবো না। আমি বই খুলে বসি, জানালা দিয়ে নারকেল গাছ আর আকাশের দিকে তাকাই, কুয়াশা নেমে। আসছে দেখতে পাই, আমার শরীর আমার পাঁজর তাল তাল কোমলতায় ঢেকে যেতে থাকে।

রওশন যদি বেড়াতে গিয়ে থাকে? রওশনকে কি একা বাড়িতে রেখে যাবে রওশনের মা-বাবা? কি বলে রওশন বেড়াতে না গিয়ে বাড়িতে থাকবে? সকাল থেকেই এসব প্রশ্ন। দেখা দিচ্ছে আমার মনে। পড়তে ভালো লাগছে, পড়তে পড়তে রওশনকে ভাবতে সুখ লাগছে। রওশন যদি বেড়াতে না গিয়ে থাকে, কী করছে তাহলে রওশন? বই পড়ছে?

আমার কথা ভাবছে? চিঠি লিখছে? যদি বেড়াতে গিয়ে থাকে, তাহলে কী করছে? আমার কথা ভাবছে? যদি রওশন বেড়াতে গিয়ে থাকে, তাহলে রওশন কি হাঁটতে পারছে? তার পা কি নদীপারের বালুতে আটকে যাচ্ছে না? না, রওশন বেড়াতে যেতে পারে না; রওশন বলেছে সে বেড়াতে যাবে না, তাই রওশন বেড়াতে যাবে না। আমার জন্যেই যাবে না; আমি কান্দিপাড়ায় নেই, আমি যেখানে নেই রওশন সেখানে কেননা যাবে! সেখানে রওশনের কী সুখ! আজ যদি আমাদের বাড়ির সবাই বেড়াতে যেতো, তাহলে আমি কি যেতাম? যেতাম না, সামনে আমার পরীক্ষা আছে বলে? সেজন্যে নয়, আমি যেতাম না, কারণ সেখানে রওশন নেই। তবে আমি ছেলে, আর সামনে আমার পরীক্ষা, তাই আমি বেড়াতে না যেতে পারি; কিন্তু রওশন যাবে না কেনো? সে মেয়ে, সামনে তার পরীক্ষাও নেই, তাই সে কী করে বেড়াতে না গিয়ে পারবে? ইচ্ছে হচ্ছে। একবার গিয়ে দেখে আসি; কিন্তু না, দুপুরের আগে যাবো না; রওশন দুপুরে যেতে। বলেছে আমাকে, দুপুরেই যাবো; দুপুর পর্যন্ত আমি শুধু রওশনকে ভাববো, আর পড়বো, আর রওশনের তাল তাল কোমলতা অনুভব করবো।

দুপুরে বেরিয়েই ভয় পাই আমি, যদি গিয়ে দেখি রওশন নেই? তখন আমি খুব অন্ধকার বোধ করবো না? আমি কি তখন বাড়ি ফিরে আসতে পারবো? তখন আমি কি কান্দিপাড়ার দিকে হাঁটতে শুরু করবো? পথে পথে রওশনের পায়ের দাগ খুঁজতে খুঁজতে হাঁটতে থাকবো? রওশনের পায়ের দাগ খুঁজতে আমার ভালো লাগবে। গিয়ে দেখি রওশন দাঁড়িয়ে আছে বাধানো কবরের পাশে; কবরটিকে আমার গোলাপবাগান বলে মনে হয়, কেননা তার পাশে এক বিশাল গোলাপের মতো ফুটে আছে রওশন।

সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি, রওশন বলে, তোমার দুপুর এতো দেরি করে হয়!

আমার ভয় হচ্ছিলো তুমি হয়তো নেই, বেড়াতে গেছে, আমি বলি, কী যে ভয় করছিলো!

না থাকলে তুমি কী করতে? রওশন হাসে। কান্দিপাড়ার দিকে হাঁটতে থাকতাম, আমি বলি।

সত্যি? রওশনের চোখে লাল লাল গোলাপ ফুটতে থাকে; বলে, আজ বেড়াতে যেতে হলে আমি পাগল হয়ে যেতাম।

কেনো? আমি জানতে চাই বা আমি জানতে চাই না।

কারণ সেখানে তুমি নেই, রওশন বলে, তুমি যেখানে নেই সেখানে কিছু নেই। বলে আজকাল আমার মনে হয়।

আজকাল তোমার এমন ভুল মনে হয় কেনো? আমি হেসে বলি।

তা তুমি বুঝবে না, রওশন অভিমান করে; এবং আমার ভালো লাগতে থাকে একথা ভেবে যে রওশনের চোখের পাতায় হয়তো অশ্রুর সৌন্দর্য দেখতে পাবো। রওশন বলে, এটা অংক নয় যে তুমি সহজে বুঝবে।

রওশন আমাকে নিয়ে রওশনদের দোতলার দিকে হাঁটতে থাকে; আর বলে, আজ দোতলাটি আমাদের।

আমরা দোতলায় ঢুকি, রওশন দরোজা বন্ধ করে দেয়; সিঁড়ি দিয়ে আমরা ওপরে। উঠি;– আমাদের একজনের হাতে আরেকজনের হাত।

আজ তোমাকে আমার ঘর দেখাবো, রওশন বলে, তোমার একটুও ভালো লাগবে না, খুব বিচ্ছিরি আমার ঘর।

তোমার ঘরে ঢুকলে আমি পাগল হয়ে যাবো, আমি বলি।

কেনো? রওশন জিজ্ঞেস করে, আর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে।

আমি জানি না, বলি আমি।

তোমাকে পাগল দেখতে আমার খুব ভালো লাগবে, হাসে রওশন, তবে একেবারে পাগল হয়ে যেয়ো না।

যদি হয়ে যাই? আমি বলি।

তাহলে পাগলের বউ হয়ে আমাকে থাকতে হবে চিরকাল, রওশন আমার চোখের মণির ভেতরে তার চোখের মণি গেঁথে দিয়ে হাসে।

আমার ভেতরটা কেঁপে ওঠে-বউ! কী সুন্দর শব্দ! রওশন বউ হবে আমার, রওশন নিজে বলছে একথা! সারা পৃথিবীকে, সব চাঁদতারাগ্রহনক্ষত্রকে, চিৎকার করে শোনাতে ইচ্ছে করছে। রওশন আমার খুব কাছাকাছি, আমার মুখোমুখি; দুটি হাত সে আমার। বাহুর ওপর রেখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি বলি, আবার ওই কথাটি বলো।

রওশন মুখ উঁচু করে আমার চোখে চোখ রেখে জলের ঘূর্ণির মতো তার ঠোঁট বাঁকিয়ে বনের সবচেয়ে সুন্দর পাখিটির মতো বলে, বউ।

আমি কাপছি, আরো শুনতে ইচ্ছে করছে আমার, বলি, কার?

রওশন আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, তোমার।

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, আমার পৃথিবী কাঁপছে, চঞ্চল হয়ে নাচছে। আমি রওশনকে খুব আস্তে জড়িয়ে ধরি, তার চুলের ঘ্রাণ নিই, রওশন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

একটি ছোট্ট খাট রওশনের, একটি টেবিল রওশনের, টেবিলে কয়েকটি বই আর পাউডার আর স্নোর কৌটো রওশনের, একটি চেয়ার রওশনের, দুটি জানালা রওশনের, আর জানালা পেরিয়ে একটি বাঁশবাগানের সবুজ দৃশ্য রওশনের। রওশন আমাকে চেয়ারে বসতে বলে, আর সে পা ঝুলিয়ে বসে খাটে।

রওশন আমার হাত দুটি তার হাতে নিয়ে আঙুল দেখতে থাকে, নখ দেখতে থাকে, এবং বলে, এ-আঙুলগুলো কখনো ভালো করে দেখতে পাই নি।

আমি হাত টেনে নিতে চাই, রওশন বলে, এ-হাত দুটি আমার, তোমাকে শুধু রাখতে দিয়েছি, তাই বেশি টানাটানি কোরো না তো বলে হাসে রওশন।

আমি বলি, তোমার নখ সুন্দর।

রওশন বলে, মিছে কথা; তোমার নখ সুন্দর। দেখি তো তোমার নখ বড়ো হয়েছে কিনা?

রওশন আমার নখ খুঁটতে থাকে, আর বলে, তুমি একটু চুপ করে বসো, আমি তোমার নখ কেটে দিই। রওশন টেবিলের ড্রয়ার থেকে ব্লেড বের করে।

তুমি সত্যিই আমার নখ কাটবে নাকি? আমি হাত টেনে নেয়ার চেষ্টা করতে করতে বলি।

তুমি দেখো তো আমি কী করি, রওশন আমার হাত টেনে নিয়ে খুব মসৃণভাবে নখ কাটতে থাকে। নখের টুকরোগুলো সে জমিয়ে রাখে তার বাঁ হাতে; এবং বলে, জানো। এগুলো দিয়ে আমি কী করবো?

জানি না তো, আমি বলি।

একটি ছোট্ট লাল কৌটোতে নখের টুকরোগুলো রাখতে রাখতে রওশন বলে, এগুলো আমি জমিয়ে রাখবো, মাঝেমাঝে খুলে দেখবো এগুলো তোমার নখ, দেখতে আমার ভালো লাগবে।

আমি রওশনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, আর বলি, তুমি তো আমার নখ দেখবে, কিন্তু আমি কী দেখবো?

তোমার কী দেখতে ইচ্ছে করে? রওশন জিজ্ঞেস করে।

আমার ইচ্ছে করে কৌটোয় করে তোমার আঙুল আমার ড্রয়ারে রাখি, একটি আঙুল আমাকে দেবে? আমি বলি।

রওশন দু-হাত বাড়িয়ে বলে, তোমার যেটি ইচ্ছে করে কেটে নাও; বলো, তোমার কোনটি কেটে নিতে ইচ্ছে করে?

আমি আমার মুঠোর ভেতর রওশনের আঙুলগুলো চেপে ধরে রওশনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, বলি, সবগুলো।

রওশন বলে, নাও, এগুলো তোমার।

আমি রওশনের দু-হাতের আঙুলগুলো আমার গালে ঘষতে থাকি, কপালে ঘষতে থাকি, নাকে ঘষতে থাকি।

রওশন তর্জনীর ডগা দিয়ে আমার নাক ঘষতে ঘষতে বলে, তোমার নাকে খুব মিষ্টি মিষ্টি ঘাম জমেছে।

তাতে কী হয়েছে? আমি বলি।

তোমার বউ তোমাকে খুব ভালোবাসবে, রওশন হাসে।

আমার ইচ্ছে করছে রওশনকে জড়িয়ে ধরতে, কিন্তু আমি ধরি না; যদি রওশন কিছু মনে করে।

রওশন বলে, তোমার একগুচ্ছ চুল যদি তুমি আমাকে দিতে!

কী করবে চুল দিয়ে? আমি বলি।

মাঝেমাঝে দেখবো, মনে হবে তোমাকে দেখছি, রওশন বলে, আজকাল সারাক্ষণ তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে। একটু থেমে বলে, আমাকে সারাক্ষণ দেখার ইচ্ছে যদি কারো হতো!

একজনের হয়, আমি জানি, আমি বলি, দিনরাত দেখার ইচ্ছে হয় তার।

রওশন আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, একবার শুধু তুমি তার নাম বলো, আমার কানে কানে একবার শুধু তার নাম বলো।

আমি রওশনের কানে কানে বলি, মাহবুব।

রওশন আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে, তার নাম দুবার বলো, তিনবার বলো, চারবার বলো, একশোবার বলো, সারাদিন বলো, সারারাত বলো, মাহবুব, মাহবুব, মাহবুব।

রওশনের চুলে ঢেকে যাচ্ছে আমার নাকমুখ, সুগন্ধে ভরে উঠছে আমার আত্মা, আমার রক্ত। আমি রওশনের মাথাটি দু-হাতে ধরে চুলের ভেতর চোখ মুখ নাক। ঢুকিয়ে দিয়ে ঘ্রাণ নিই।

তোমার চুলের সুগন্ধে আমার প্রাণ ভরে গেছে, আমি বলি।

ইচ্ছে হলে আরো ঘ্রাণ নাও, রওশন বলে।

আমি রওশনের চুলের ঘ্রাণে আমার প্রাণ আরো ভরে তুলতে থাকি। তারপর রওশনের মুখটি আমি নিই আমার অঞ্জলিতে।

রওশন, তুমি চোখ বোজো, তোমাকে আমি দেখবো, আমি বলি।

রওশন চোখ বোজে; আমি রওশনের মুখের নতুন রূপ দেখে অন্ধ হয়ে যাই। রওশন অনেকক্ষণ পর চোখ খোলে, আমার মনে হয় আমাদের গ্রামে ভোর হলো। এখন ডালে। ডালে পাখি ডেকে উঠবে, ফুল ফুটবে।

রওশন আমার নাকের নিচে আঙুল বুলোয় আর বলে, তোমার গোঁফ উঠছে, কী। নরম। একটু পরে বলে, তুমি কিন্তু গোঁফ রেখো না।

আমি জিজ্ঞেস করি, কেনো? গোঁফ আমার ভাল্লাগে না, রওশন বলে, আর হাত বুলোতে থাকে আমার মুখে, গালে, চিবুকে, গলায়।

তোমাকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে, আমার গলায় হাত বুলোতে বুলোতে রওশন বলে, প্রাণভরে দেখতে ইচ্ছে করছে।

আমি তো তোমার সামনেই বসে আছি, রওশন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না? আমি বলি।

রওশন হাসে, আর বলে, না, শুধু তোমার মুখ দেখছি, তোমাকে তো দেখতে পাচ্ছি না। তারপর বলে, আমি একটু তোমাকে দেখি?

কীভাবে তুমি দেখতে চাও? আমি বলি।

আমার ইচ্ছে করে জামা খুলে তোমাকে দেখতে, আমার খুব ইচ্ছে করে, রওশন বলে, মনে হয় জামার ভেতরে তুমি আরো সুন্দর।

আমার লজ্জা লাগবে, রওশন, আমি বলি।

কিন্তু আমার যে দেখতে ইচ্ছে করে, রওশন বলে, একটু দেখি?

দেখো, আমি বলি।

রওশন একটি একটি করে আমার জামার বোতাম খোলে, আর ডান হাত আমার বুকের ওপর বুলোতে থাকে। রওশন জামাটি খুলে নিতে পারে না, আমি মাথার ওপর। দিয়ে খুলে জামাটি রওশনের হাতে দিই। নিচে গেঞ্জিও আছে, রওশন নিজেই আস্তে। আস্তে গেঞ্জিটি খোলে। শীতকাল, কিন্তু আমার শীত লাগছে না। আমি ভুলে যাচ্ছি আমি কোথায় আছি। রওশন আস্তে আস্তে হাত বুলোতে থাকে আমার শরীরে; আমি কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থাকি।

তোমার শরীর কী যে সুন্দর, রওশন বলে। আমি কথা বলি না।

তোমার এ-তিলটি তুমি কখনো দেখো নি, আমার পিঠের এক জায়গায় আঙুল রেখে রওশন বলে, তিলটি আমি দেখলাম। তিলটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

ওই তিলটি তোমাকে দিলাম, আমি বলি।

রওশন আমার বুকে আঙুল দিয়ে একটু ঘষে, আর বলে, দেখো, কী সুন্দর লাল হয়ে উঠলো; এই লালটুকু আমার।

রওশনের মুখের দিকে আমি তাকিয়ে দেখি তার চোখ জুড়ে স্বপ্ন ভাসছে, সে হয়তো আমার শরীর দেখছে না, অন্য কিছু দেখছে, দেখতে দেখতে তারও চোখ অন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

জানো, তোমার শরীর আমি দিনের পর দিন ধরে দেখতে পারি, রওশন বলে, দেখে দেখে আমার সাধ মিটবে না।

রওশন, তুমি আর কতোক্ষণ দেখবে? আমি বলি, আমার ঘুম পাচ্ছে।

তুমি ঘুমোও আর আমি তোমাকে দেখি, রওশন বলে, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।

তারপর যে আমি আর কোনোদিন ঘুমাতে পারবে না, আমি বলি।

কেনো? রওশন জানতে চায়।

আমি জানি না, আমি বলি।

রওশন আমার শরীরে হাত বুলোতে থাকে, আর বলে, কী যে সুন্দর, কী যে সুন্দর, সারাজীবন চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

আমি রওশনকে ডাকি, রওশন।

রওশন বলে, কী?

তোমাকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে, আমি বলি, তোমাকে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে করছে।

রওশন বলে, সত্যিই তুমি দেখতে চাও?

চাই, আমি বলি।

তাহলে দেখো, বলে রওশন চোখ বোজে, এবং বলে, তবে ছুঁয়ো না আমাকে।

আচ্ছা, আমি বলি।

কিন্তু আমি কী করবো বুঝতে পারি না, যেনো আমি খুব গরিব, আমার সামনে। কোনো দেবতা মণিমাণিক্যের সিন্দুক হাজির করে খুলে দেখতে বলছে, কিন্তু আমি খুলতে জানি না। আমার হাত থেকে বারবার সোনার চাবি মাটিতে পড়ে যাচ্ছে, তুলতে গিয়ে আবার পড়ে যাচ্ছে; সোনার চাবি তুলতে তুলতে আমার সারা জীবন কেটে যাবে, আমি কোনো দিন সিন্দুক খুলে দেখতে পারবো না।

রওশন বলছে, তুমি দেখবে না?

দেখবো, আমি বলি।

রওশনের কামিজের পেছনে স্বপ্নের ঘোরে বারবার পথ হারিয়ে ফেলতে ফেলতে। আমি হাত বুলোই; বোতামগুলোকে একেকটি সোনার তালা মনে হয়; একটি একটি করে খুলতে চেষ্টা করি আমি, আমার আঙুল কাঁপতে থাকে, সারা শরীর কাঁপতে থাকে, রওশন চোখ বুজে আছে, একটি একটি করে সিন্দুকের সোনার তালা খুলছি আমি। আমি রওশনের কামিজ টেনে নিচের দিকে নামাই, মনে হয় হাত দিয়ে আমি মেঘ সরিয়ে দিচ্ছি, আমার হাত কাঁপতে থাকে। রওশনের ধবধবে কাঁধ থেকে আমার চোখে চাঁদের বন্যার মতো মাংসের আলো ঢুকতে থাকে। রওশন একটুও নড়ে না। আমি কামিজের মেঘ টেনে আরো নিচে নামাই; আমার চোখের সামনে দুটি চাঁদ জ্বলে ওঠে, দুটি শুভ্র পদ্ম স্থির হয়ে ফুটে ওঠে। বাঁ দিকের চাঁদটিকে একটু ছোটো মনে হয় ডান। দিকের চাঁদের থেকে। মহাকালের মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমি চোখ বন্ধ করে ফেলি। আমার ছুঁতে ইচ্ছে করে ওই চাঁদ, ওই পদ্ম; কিন্তু রওশন ছুঁতে নিষেধ করেছে, আমি ছুঁই না; আমি শুধু অন্ধ চোখ দিয়ে যুগল চাঁদ যুগল পদ্ম দেখতে থাকি। আমার। চামড়া ফেটে শরীরের সব দিক থেকে রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরোতে চায়; পদ্মার ঢেউয়ের ওপর আমি একটি ছোট্ট নৌকো প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকি নিজেকে সমস্ত ঢেউয়ের। মধ্যে স্থির করে রাখতে।

তুমি কি আমাকে দেখছো? রওশন জিজ্ঞেস করে।

দেখছি, আমি বলি, কিন্তু মনে হচ্ছে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

তুমি কি অন্ধ হয়ে গেছো? রওশন বলে, এবং চোখ খুলে আমার মুখের দিকে তাকায়।

আমি রওশনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

তোমার কি শুধু এটুকুই দেখতে ইচ্ছে করছে? রওশন বলে, আমার কিন্তু তোমাকে পুরোপুরি দেখতে ইচ্ছে করছে।

আমিও তোমাকে পুরোপুরি দেখতে চাই, আমি বলি।

রওশন চোখ বোজে, আমি রওশনের সালোয়ার মেঘের মতো টেনে সরিয়ে মেঝেতে রাখি। জ্যোৎসার বন্যায় খাট ভেসে যায়, ঘর ভরে যায়।

আমি চোখ বুজি, রওশন আমার লুঙ্গি সরিয়ে মেঝেতে রাখে।

আমরা দুজন দুজনের দিকে তাকাই।

তুমি সুন্দর, রওশন বলে।

তুমি সুন্দর, আমি বলি।

আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি, কেউ কাউকে ছুঁইছি না, দেখছি একজন আরেকজনকে, দেখতে দেখতে অন্ধ হয়ে যাচ্ছি।

আমাদের শরীর নিয়ে আমরা কী করবো? আমি বলি।

আমাদের জন্যে রেখে দেবো, রওশন বলে।

সেই ভালো, আমি বলি।

রওশন বলে, তোমাকে আমার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে।

একবার আমরা জড়িয়ে ধরি আমাদের? আমি বলি।

না, আজ নয়, আজ নয়, সেই একদিন, রওশন বলে।

রওশন সালোয়ারকামিজ পরতে থাকে; আমিও কাপড় পরি, এবং চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকি।

চোখ খোলো, রওশন বলে।

চোখ খুলে আমি রওশনের দিকে তাকাই, রওশন হেমন্তের কাশবনে চাঁদের আলোর মতো হাসে; চাঁদের মতোই সুদূর মনে হয় রওশনকে; আমি সিঁড়ির দিকে হাঁটতে থাকি, সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামি, দরোজা খুলে বাইরে বেরোই; সব কিছু আমার অচেনা লাগে। ওই নারকেল গাছ আমি আগে দেখি নি, এই মাটি আমি আগে দেখি নি, বাতাসের এমন ছোঁয়া আমি আগে পাই নি। আমি পেছনের দিকে ফিরে তাকাই একবার, দেখি। বারান্দায় রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে রওশন তাকিয়ে আছে। আমি নদীর দিকে হাঁটতে থাকি, আমি কিছু দেখতে পাই না; নদীর পারে এসে দেখি রওশনের শরীরের মতো পদ্ম বয়ে চলছে।

আমি কয়েক দিন রওশনদের বাড়ি যাচ্ছি না, তবে যাচ্ছি না আমার এমন মনে হচ্ছে না , মনে হচ্ছে আমি রওশনের সাথে দোতলায় রয়েছি, রওশন দেখছে আমাকে আমি দেখছি রওশনকে; যা তখন আমি দেখতে পাই নি এখন দেখতে পাচ্ছি, রওশনের গ্রীবার নিচের লাল তিলটিকে মনে পড়ছে, তিলটিকে একটি নাম দিতে ইচ্ছে করছে, ওর নাম লাল শুকতারা; আলতাভ দুটি বৃত্ত আমার চোখের সামনে ঘুরছে, রওশনের চাঁদের শীর্ষে গোলাপকুঁড়ি, দুটি চাঁদের শীর্ষে দুটি গোলাপকুঁড়ি, আলতাভ বৃত্ত ঘিরে আছে কুঁড়ি। দুটিকে; একখণ্ড মেঘের কথা মনে পড়ছে, হাল্কা মেঘ, আকাশের এককোণে ভিড়ে আছে; তবে আমি তাকালেই লাল রঙলাগা চাঁদ দেখছি চোখ বন্ধ করলেই লাল রঙলাগা চাঁদ দেখছি। প্রত্যেক বিকেলে বেরোই, কিছু দূর হটি রওশনদের বাড়ির দিকে, তারপর লাল রঙলাগা চাঁদ দেখতে দেখতে নদীর দিকে চলে যাই, ধানখেতের দিকে যাই, এক দিন বাজারেও গিয়ে চা খাই। শওকত আজ এসেছে, শওকত আমাকে ওদের বাড়ি যেতে বলছে না, ও ভীষণ দুষ্ট, যেতে বলবে না, কিন্তু আমাকে আজ যেতে হবে।

শওকত বাড়ি যাবে না এখন, আমাকে একলাই যেতে হবে।

বাঁধানো কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে রওশন, যেখানে রওশনকে না দেখলে আমি অন্ধকার দেখতাম। রওশন খুব গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছে, এমন গম্ভীর আমি রওশনকে কখনো দেখি নি। গম্ভীরভাবেও রওশন সুন্দর।

তুমি কেমন আছো? আমি জিজ্ঞেস করি।

তুমি কেমন আছো? রওশন বলে।

আমরা দুজনে বসার ঘরে ঢুকি, আমি আমার চেয়ারটিতে বসি, এবং হাত বাড়িয়ে রওশনের হাত ধরি।

তুমি আমাকে ভুলে গেছো, রওশন বলে, আমি তোমাকে ভুলি নি।

আমিও ভুলি নি, আমি বলি।

তাহলে কেনো আসো নি? রওশন বলে।

আমি পাগল হয়ে গেছি, আমি হেসে হেসে বলি, একমাত্র পাগল পূর্ব পাকিস্থানে।

পাগল হলে তো সেদিনই আবার আসতে, রওশন এবার হাসে, আমার বুকে ঝলক দিয়ে রোদ ওঠে। রওশন আমার মুঠো ধরে জোরে টান দিয়ে বলে, পাগল হলে। সেদিনই কেনো হলে না? আমার সামনেই কেনো হলে না? পাগল হলে তোমাকে কেমন লাগে আমি দেখতাম!

তখন পাগল হলে তোমার খুব বিপদ ছিলো, লাফিয়ে হয়তো জানালা দিয়ে বাঁশঝাপের ভেতর পড়ে যেতাম, তখন তোমার অনেক কষ্ট হতো, আমি বলি।

কোনোই কষ্ট হতো না, রওশন বলে, আমিও তোমার সাথে বাঁশঝাপে লাফিয়ে পড়তাম, খুব চমৎকার হতো! সবাই এসে দেখতে আমরা দুজন ঝুলে আছি!

তারপর তুলে এনে একসাথে কবর দিতো, আমি বলি।

পাগল হলে, রওশন বলে, মানুষ নাকি বিড়বিড় করে নানা কিছু বলে, চোখের সামনে নানা কিছু দেখে; আচ্ছা, তুমি কী বলছো আর কী দেখছো?

আমি দিনরাত বলছি লাল শুকতারা, লাল শুকতারা, আর দেখছি লাল শুকতারা, আমি বলি।

লাল শুকতারা? রওশন বলে।

আমি নাম দিয়েছি, আমি বলি।

কার? রওশন জানতে চায়।

তোমার গ্রীবার নিচের লাল তিলটির, আমি বলি।

রওশন কোমলভাবে তাকায়, বলে, আর কী দেখছো?

গোলাপকুঁড়ি, আমি বলি।

রওশন আরো নিবিড়ভাবে আমার হাত ধরে আমার চোখের ভেতরে তার চোখের

সমস্ত আলো আর ছায়া স্থির করে জিজ্ঞেস করে, আর?

লাল রঙলাগা চাঁদ, আমি বলি। রওশন আরো শক্ত করে আমার মুঠো ধরে বলে, আর?

আকাশের কোণে একখণ্ড মেঘ, আমি বলি।

রওশন আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, মাহবুব।

আমাদের যেনো কী হয়েছে, খুব গভীর কিছু একটা হয়েছে মনে হচ্ছে, নইলে এমন হবে কেনো, আমাদের এমন লাগবে কেনো? আগে তো আমরা হাতে হাত রেখে খুব। সুখে ছিলাম, এতো সুখে ছিলাম যা কখনো কেউ থাকে নি। কিন্তু এখন শুধু হাত ধরে কেনো সাধ মেটে না? রওশন এটাও প্রথম আবিষ্কার করে, বা রওশনই প্রথম। এ-আবিষ্কারটি প্রকাশ করে, তাই এর কৃতিত্ব তারই প্রাপ্য। আমিও যে বোধ করি নি, তা নয়; কিন্তু প্রকাশ করি নি; রওশন কী মনে করবে, এমন এক দ্বিধা আমার মনে থেকেই যায় সব সময়; কিন্তু রওশনের কোনো দ্বিধা নেই, সত্যকে সে সত্যের মতোই প্রকাশ করে-আমার কাছে। আমি কি একটু কপট? পনেরো বছরেই? পুরুষ হলে কি একটু কপট হতে হয়? দোতলার দিন আমি বুঝতে পারি নি আমাদের শরীর নিয়ে। আমরা কী করবো, যদিও আমি অনুভব করি যে আমাদের শরীর নিয়ে কিছু একটা আমাদের করার কথা। আমার

অনেক ভাবনাই আজকাল আমাকে অবাক করে দিয়ে, অনেক সময় ভীত করে দিয়ে, বদলে যাচ্ছে; এক সময় আমি ভাবতাম রওশন আর। আমি চিরকাল শুধু মুখোমুখি হাত ধরে বসে থাকবো, রওশন হাসবে আমি দেখবো, আমি কথা বলবো রওশন শুনবে, আমরা আর কিছু করবো না, আমরা কখনো অসভ্য হবো না। কিন্তু আমার দিন দিন ভয় হচ্ছে আমরা হয়তো অসভ্য না হয়ে পারবো না; অন্যদের মতো আমরাও অসভ্য হয়ে যাবে। তবে অসভ্য কীভাবে হতে হয় আমি পুরোপুরি জানি না, রওশনও হয়তো জানে না; কিন্তু একদিন আমি জেনে নিশ্চয়ই ফেলবো কীভাবে সত্যিকার অসভ্য হতে হয়, রওশনও জানবে; তখন হয়তো আমাদের সব সময় অসভ্য হতে ইচ্ছে করবে। রওশনই প্রথম প্রকাশ করে যে হাত ধরে আর সাধ মিটছে, কিন্তু হাত ধরা ছাড়া আর কী করলে সাধ মিটবে, তা বুঝতে পারছে না। রওশন; এবং আমিও বুঝতে পারছি না।

জানো, রওশন খুব আস্তে বলে, শুধু হাত ধরে আর সাধ মিটছে না।

আমারও, আমি বলি, হাত ধরেও মনে হয় আমরা অনেক দূরে।

কী অবাক কাণ্ড না! রওশন বলে, একদিন তো হাত ধরেই সুখে গলে যেতাম, আর এখন মনে হয় কী যেনো চামড়ায় এসে আটকে যাচ্ছে, বেরোতে পারছে না!

শওকত এসে ঢোকে এমন সময়, আমরা বীজগণিত নিয়ে আলোচনা শুরু করি। রওশন খুব আগ্রহের সাথে বীজগণিত শিখতে থাকে। শওকত চলে যায়, আমরা আবার আমাদের বিস্ময় নিয়ে বিস্মিত হতে থাকি।

কী যে করি, কী যে করি, রওশন বলে, কী করলে যে মনে হবে তোমাকে ধরে আছি!

আমার ইচ্ছে করে, আমি বলি, আমার আর তোমার আঙুল কেটে আমার আঙুলের রগ তোমার আঙুলের রগের সাথে জোড়া দিয়ে দিই।

রওশন বলে, সেই ভালো, সেই ভালো; তাহলে আমাদের রক্ত মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে, আমাদের সাধ মিটবে।

তবে এ-পদ্ধতি সম্ভবপর বলে মনে হয় না; আমাদের মাত্র পনেরো বছর বয়স হলেও আমরা বুঝতে পারি আঙুল আর রগ কাটাকাটি বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটাবে, রগ জোড়া দেয়ার আগেই রক্তে আর আমাদের চিৎকারে চারদিক ভরে উঠবে। রওশন তখন নতুন একটি পদ্ধতি প্রস্তাব করে।

রওশন বলে, একটি কাজ করতে পারি, প্রতিদিন আমরা একবার নিজেদের জড়িয়ে ধরবো।

কেউ যদি দেখে ফেলে? আমি বলি।

রওশন খুব চিন্তিত হয়, বলে, তার সম্ভাবনা আছে।

তাহলে কী করবো? আমি বলি।

খুব সাবধানে দেখেশুনে নিতে হবে, রওশন বলে, একটু জরিপ করে নিতে হবে। জরিপটা আমিই করবো।

তাহলে সুখ লাগবে না, আমি বলি।

ঠিকই, রওশন বলে, তবে যেদিন সুযোগ পাবো, সেদিন। একটু পর রওশন বলে, আচ্ছা, এর কোনো দেবতাটেবতা নেই, যে একটু সুযোগ করে দিতে পারে? না হয়। বিকেলবেলা আমরা হিন্দুই হয়ে যাবো।

একটি আছে বলে আমি শুনেছি, আমি বলি, তবে সেটা সুযোগ করে দিতে পারে, শুধু তীর ছুঁড়তে পারে।

তাই হবে, রওশন বলে, আমার শরীরে অনেক তীর ফুটছে বলে মনে হচ্ছে।

রওশন একটু জরিপ করতে যায়, আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে আলমারিটার। কোণায়; এবং ফিরে এসেই জড়িয়ে ধরে আমাকে, সাথেসাথে দূরে সরে যায়।

না, এতে মন ভরলো না, রওশন বলে।

একটু ব্যায়াম হলো, আমি বলি; আর রওশন খিলখিল করে হেসে ওঠে।

তুমি একটু ভেবো, রওশন বলে, একটি উপায় বের কোরো, এটাই আমার প্রথম বায়না তোমার কাছে।

কোনো উপায় বের করতে পারি না আমি, রওশনের প্রথম বায়নাটি আমি বোধ হয় রাখতে পারবো না; আমার শুধু মনে হতে থাকে আমাদের রক্ত আর মাংস অসভ্য হয়ে। উঠছে, খুব অসভ্য হয়ে উঠতে চাইছে। আমি ভয় পেতে থাকি আমি বোধ হয় আর রওশনের মুখের দিকে চিরকাল তাকিয়ে থাকতে পারবো না, শুধু রওশনের হাসি দেখেই আমার বুক সুখে ভরে উঠবে না; রওশনও শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আর আমার কথা শুনে শুনে সুখে ভরে উঠতে পারবে না। আমরা বদলে যাচ্ছি, আমাদের সুখ বদলে যাচ্ছে, আমাদের রক্ত বদলে যাচ্ছে, আমাদের মাংস বদলে যাচ্ছে। সুখ চিরকাল একরকম থাকে না কেনো, চিরকাল একইভাবে কেনো সুখ পাওয়া যায় না! আমাদের কি কেউ অভিশাপ দিয়েছে দেবতাটেবতা বা ফেরেশতাটেরেশতা কেউ কি আকাশ থেকে দেখতে পেয়েছে আমরা হাতে হাত রেখে খুব সুখ পাই, দেখে তাদের খুব ঈর্ষা হয়েছে; এবং অভিশাপ দিয়েছে তোমরা আর শুধু হাত ছুঁয়ে সুখ পাবে না, শুধু। মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সুখ পাবে না? আমার তাই মনে হয়; তাদের অভিশাপে। আমাদের রক্ত জ্বলছে মাংস পুড়ছে; নিজেদের পোড়া রক্তমাংসের গন্ধে আমাদের জগত ভরে উঠছে। রওশন আমাকে বলেছে তার মাংস জ্বলে, রক্ত পোড়ে; আমিও বোধ করছি আমার মাংস পোড়ে রক্ত জ্বলে। সেখান থেকে অসহ্য সুগন্ধ উঠছে। কয়েক মাস আগে আমি একটি উপন্যাস পড়েছিলাম, আমার মনে পড়ে, তাতে এক জায়গায় লেখা ছিলো, তাহারা চুম্বন করিল। পড়ে আমার রক্ত ঝনঝন করে উঠেছিলো। ঠিক রওশন ও আমার মতোই ওই উপন্যাসের নায়কনায়িকার রক্ত আর মাংস জ্বলছিলো পুড়ছিলো; চুম্বন করে তাদের শরীর ঠাণ্ডা হয়েছিলো। রওশনকে আমি সে-কথা বলি; রওশন প্রথম লজ্জা পায়, কিন্তু আমরা দুজন বুঝে উঠতে পারি না

চুম্বন কীভাবে করতে হয়। আমি বলি চুম্বন গালে করতে হয়, ঠোঁট আস্তে গালে ছোঁয়ালেই চুম্বন হয়; রওশন বলে চুম্বন হাতের উল্টোপিঠে করতে হয়। আমরা কয়েক দিন ঠোঁট দিয়ে গাল আর হাত স্পর্শ। করি; প্রথম আমাদের একটু অদ্ভুত অনুভূতি হয়, কিন্তু পরে তা আর যথেষ্ট মনে হয় না; আমরা যা চাই, আমাদের রক্ত যা চায়, তা ওই চুম্বন নয়।

আমাদের শরীরের ভেতর কী আছে, আমাদের রক্তে আর মাংসে এখন কী জমছে? সুধা না বিষ? রওশন বলে তার মনে হচ্ছে তার রক্তে বিষ জমছে, তবে অন্য রকম বিষ, এমন এক ধরনের বিষ, যা খুব মধুর, যা খুব মিষ্টি, যাতে মানুষ মরে না, মানুষ পাগল হয়ে ওঠে। আমারও তাই মনে হয়। রওশনকে আমি মনে করিয়ে দিই রওশন একবার লিখেছিলো যে আমিই পান করবো তার যৌবন সুধা। রওশন বলে যখন সে লিখেছিলো তখন সে পুরোপুরি বুঝতে পারে নি সে কী লিখছে। রওশন ভুলো না আমায় নামের একটি বইতে কথাটি পেয়েছিলো, পড়ে রওশনের ভালো লেগেছিলো, রওশনের শরীর কেমন করে উঠেছিলো, অনেক দিন ধরে কথাটি রওশনের মনের ভেতরে গানের মতো বাজছিলো, আর চিঠিতে ওই কথাটি লিখে রওশন সুখ পেয়েছিলো। এখন রওশনের মনে হচ্ছে তার শরীরে সুধা জমছে, আমার মনে হচ্ছে আমার শরীরেও সুধা জমছে; একদিন আমরা ওই সুধা পান করবো। সে-একদিন কতো দূর? অনেক দূর? ততো দিন কি আমরা বাঁচবো? পিপাসায় আমরা মরে যাবো না? আমাদের বেঁচে থাকতেই হবে, আমরা প্রাণ ভরে পান করবো আমাদের সুধা। তখন আমাদের অসভ্য মনে হবে না, আমাদের সুধা তো আমাদেরই পান করতে হবে। রওশনকে আমি একটি কথা কিছুতেই বলতে পারছি না, রওশন আমাকে অসভ্য ভাববে, তাই বলতে পারছি না। আমি এক সময় নিজের শরীর থেকে মধু আহরণ করতাম, মধুর চাক ভেঙে সুখে ক্লান্তিতে ভরে যেতাম। সেভাবেই আমাদের মধু আহরণ করতে হবে, নিজের শরীর থেকে নয়, পরস্পরের শরীর থেকে; রওশনের মধুর চাক

ভাঙবো আমি, আমার মধুর চাক ভাঙবে রওশন; রওশনের সুধা পান করবো আমি, আমার সুধা পান করবে রওশন। আমাদের। শরীর বেয়ে বেয়ে সুধা ঝরতে থাকবে, আমার মুখ থেকে সুধা ঝরবে, রওশনের মুখ থেকে সুধা ঝরবে; সুধায় আমাদের শরীর ভিজে যাবে, বালিশ ভিজে যাবে, বিছানা ভিজে যাবে; আমাদের শরীরের প্রতিটি ছিদ্র দিয়ে সুধা ঝরতে থাকবে। সুধা পান করতে হলে অসভ্য হতে হবে আমাদের। খুব অসভ্য, অত্যন্ত অসভ্য, জঘন্য অসভ্য হতে হবে। আমাদের। সবাই অসভ্য হয়; আদম-হাওয়াও অসভ্য হয়েছিলো। আমার আজ মনে। হচ্ছে আমি পারবো অসভ্য হতে, কিন্তু রওশন কি পারবে?

রওশনকে একদিন আমি জিজ্ঞেস করি, রওশন, তুমি কি অসভ্য হতে পারবে?

রওশন বিস্মিত হয়, অসভ্য? অসভ্য কেনো হতে হবে?

আমি বলি, এই যে হাত ছুঁয়ে আমরা আর আগের মতো সুখ পাচ্ছি না।

রওশন বলে, হ্যাঁ, পাচ্ছি না।

আমি বলি, এই যে একবার জড়িয়ে ধরে আমরা আর সুখ পাচ্ছি না।

রওশন বলে, হ্যাঁ, পাচ্ছি না।

আমি বলি, সুখ পেতে হলে আমাদের খুব অসভ্য হতে হবে।

রওশন আমার চোখে গভীরভাবে তাকায়, আস্তে বলে, খুব অসভ্য হতে পারবো আমি তোমার সাথে, তবে আজ নয়, সেই একদিন।

অনেক রাত জেগে আমি পড়তে থাকি; আমার আর কিছু পড়ার নেই, সব মুখস্থ হয়ে গেছে, তবু আমি পড়তে থাকি, চিৎকার করে পড়তে থাকি; কেননা চোখ বুজলেই আমি দেখতে পাই রওশন আর আমি অসভ্য হয়ে গেছি, মাছের মতো পারদের মতো জলের ভেতরে আমরা অসভ্য হয়ে উঠেছি, আমাদের শরীর থেকে মধু ঝরছে, সুধা ঝরছে। আমি দেখতে পাই আমরা জড়িয়ে যাচ্ছি, আমাদের পৃথক করা যাচ্ছে না, আমরা এক হয়ে যাচ্ছি, আমি হারিয়ে যাচ্ছি লাল রঙলাগা চাঁদের ভেতরে, গোলাপকুঁড়ির ভেতরে, একখণ্ড মেঘের ভেতরে। আমি আর আমাকে খুঁজে পাচ্ছি না। পারদ জলের। ভেতরে রওশনের চুল ছড়িয়ে পড়েছে, মাছের মতো আমি আটকে যাচ্ছি রওশনের চুলের জালে, শ্যাওলায়, কচুরিপানায়, শৈবালে। রওশন বলেছে সে আমার সাথে খুব অসভ্য হতে পারবে, খুব অসভ্য হতে পারবে, আমার সাথে, শুধু আমার সাথে।

প্রবেশিকা পরীক্ষাটি আমি খুবই ভালো দিই, এতো ভালো দেবো আগে ভাবি নি, রওশনের জন্যেই আমি এতো ভালো দিই-রওশন গর্ব করবে আমাকে নিয়ে। আমি ছাড়া আর গর্ব করার রওশনের কী আছে। রওশন সুন্দর, তা নিয়ে সে গর্ব করতে পারে; কিন্তু রওশন যে সুন্দর তা তো আমার গর্ব। আমি যাকে ভালোবাসি, সে সুন্দর; এটা আমার গর্ব। রওশন গর্ব করবে আমাকে নিয়ে। আট দিন পর মুনশিগঞ্জ থেকে ফিরে। বিকেলে আমি রওশনদের বাড়ি যাই। আমি অবাক হই, আর আমার খারাপ লাগে যে রওশন বাঁধানো কবরের পাশে নেই। আমি বসার ঘরে ঢুকি, কিন্তু রওশন নেই। শওকত আমাকে দেখে দৌড়ে আসে।

শওকত বলে, রওশন মারা গেছে।

আমি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠি, কী বলছো তুমি?

শওকত হাসে, তুমি এসেছো আর রওশন এ-ঘরে নেই, এতে বুঝতে পারছো না যে রওশন মারা গেছে?

আমি বলি, সত্যি করে বলো কী হয়েছে?

রওশনের মা ঘরে ঢুকছেন দেখে আমি অবাক হই, তিনি তো কখনো এ-ঘরে আসেন না। আমি দাঁড়িয়ে সালাম দিই। তিনি আমার চুলে হাত বুলিয়ে দোয়া করেন। শওকতকে চলে যেতে বলে তিনি চেয়ারে বসেন, এবং রওশনকে ডাকেন। রওশন তাঁর ডাক শুনে এসে দাঁড়ায়।

রওশনের মা বলেন, বাবা, তুমি একবার রওশনকে দেখো।

আমি রওশনের দিকে তাকাতেই রওশন দু-হাতে মুখ ঢেকে হুহু করে কেঁদে ওঠে, দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রওশনের মা বলেন, বাবা, তোমাকে ছেলের মতো পেলে আমাদের সুখের সীমা থাকতো না, রওশনেরও সুখের সীমা থাকতো না।

আমি মাথা নিচু করে কান্না চাপতে থাকি।

রওশনের মা বলেন, তা তো হওয়ার নয়, রওশন বড়ো হয়েছে, আর তোমার অনেক লেখাপড়া বাকি।

আমি কেঁদে ফেলি।

তিনি বলেন, রওশনের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, তুমি ওকে দোয়া কোরো।

রওশনের মাকে সালাম দিয়ে টলতে টলতে আমি বেরিয়ে আসি।

৪. আমি নদীর দিকে হাঁটতে থাকি

আমি নদীর দিকে হাঁটতে থাকি, আমি বুঝতে পারি না কোন দিকে হাঁটছি, নদীর দিকে না অন্ধকারের দিকে, আমার খুব কষ্ট হয়, কাঁদতে ইচ্ছে হয়, সূর্য ডুবছে নদীতে, আমার ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়, আর কি সূর্য উঠবে, আমি কিছু দেখতে পাই না, সবুজ গাছগুলোকে কালো মনে হয়, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, রওশনের মুখটি আমি মনে করতে চাই, মনে করতে পারি না, কিছুই আমি মনে করতে পারি না, আরেকবার রওশনকে দেখতে ইচ্ছে হয়, রওশন বাঁধানো কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, আমি আর বাড়ি ফিরবো না, অনেক দূরে কোথাও চলে যাবো, আমাকে কেউ আর দেখতে পাবে না, রওশনকে নিয়ে আমার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়, যেনো আমি রওশনদের বাঁশবাগানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, রওশন আমাকে দেখতে পেয়েছে জানালা দিয়ে, পালিয়ে চলে এসেছে রওশন, আমরা নৌকোয় উঠে ভেসে চলেছি, আমরা নিজেদের জড়িয়ে ধরে কাঁদছি। কিন্তু আমি সন্ধ্যায়ই বাড়ি ফিরি, যেমন আগে ফিরতাম। আমি খুব শূন্য বোধ করি, রওশনই আমাকে প্রথম দেয় শূন্যতার বোধ। আমি কি ভেঙে পড়বো, পনেরো বছর পাঁচ মাসের আমি নিজেকে বারবার প্রশ্ন করি, আমি কি ভেঙে পড়বো? আমার ইচ্ছে হয় ভেঙে পড়তে। কে যেনো আমার ভেতর থেকে বলে, না। ঘুমোতে আমার কষ্ট হয়, আমি ঘুমোতে পারি না, আমি ঘুমোতে জানি না; চোখ বুজলেই আমি একটি লোককে দেখতে পাই, যাকে আমি কখনো দেখি নি, লোকটি রওশনের ব্লাউজ খুলছে, আমার রক্ত জ্বলছে, দুটি লাল রঙলাগা চাঁদ বেরিয়ে পড়ছে, আমি দেখতে পাই লোকটি রওশনের লাল রঙলাগা চাঁদ ছুঁচ্ছে, কালো হাত দিয়ে রওশনের চাঁদ দুটিকে পিষছে লোকটি, আমি কেঁপে উঠি, ঘুমোতে পারি না; আমি দেখতে পাই লোকটির হাত আরো নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে, লোকটি রওশনের শাড়ি সরিয়ে দিচ্ছে কালো হাত দিয়ে, রওশন নগ্ন, লোকটি একখণ্ড মেঘ দেখতে পাচ্ছে

রওশনের, মেঘের আড়ালে লোকটি সোনার খনি খুঁজছে, আমি দেখতে পাই লোকটি উলঙ্গ হচ্ছে, লোকটি রওশনের সাথে অসভ্য কাজ করছে, অমি নিঃশব্দে চিৎকার করে উঠি, একবার মনে হয় রওশন লোকটিকে সহ্য করতে পারছে না, সে বাধা দিচ্ছে লোকটিকে, আমার একটু ভালো লাগছে, কিন্তু রওশন লোকটিকে ফেরাতে পারছে না, লোকটি অসভ্য কাজ করছে, রওশন শুধু শুয়ে আছে চিৎ হয়ে, পরমুহূর্তেই আমার মনে হয়, আমি দেখতে পাই, রওশনের ভালো লাগছে; রওশন লোকটিকে চুমো খাচ্ছে, লোকটিকে রওশন জড়িয়ে ধরছে নিজের লাল রঙুলাগা দুই চাঁদের মধ্যে, লোকটি উলঙ্গ হয়ে রওশনকে পা ছড়াতে বলছে, আমি দেখতে পাই, সুখের ঘোরে পা ছড়িয়ে দিচ্ছে রওশন, লোকটি রওশনের মেঘের ভেতরে ঢুকছে, রওশন চোখ বন্ধ করে সুখে জড়িয়ে ধরছে লোকটিকে, রওশন কেমন শব্দ করছে, আমি দেখতে পাই রওশন লোকটির তালে তালে শরীর দোলাচ্ছে, রওশনের যৌবন সুধা পান করছে লোকটি, রওশন তাকে আরো সুধা পান করতে দিচ্ছে, লোকটি রওশনের যৌবন সুধা রাতভর পান করছে দিনভর পান করছে, আমি নিঃশব্দে চিৎকার করে উঠি, আমি ঘুমোতে পারি না, মনে মনে বলতে থাকি, রওশন, তুমি বলেছিলে আমিই পান করবো তোমার যৌবন সুধা, আমার সাথেই তুমি করবে অসভ্য কাজ, তুমি কথা রাখে নি, আমিও কথা রাখবো না; আমিও অসভ্য কাজ করবো, আমিও যৌবন সুধা পান করবো, তখন তুমিও ঘুমোতে পারবে না।

আমার প্রথম ব্রিজটি, যেটি তৈরির সাথে আমি বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম, যার নকশাই করেছিলাম আমি, সেটি শুরুতেই ভেঙে পড়েছিলো; মনে হচ্ছিলো ফুলঝর নদীর ওপর আমার ব্রিজ কোনো দিন দাঁড়াবে না; কিন্তু এখনো ওই ব্রিজ দাঁড়িয়ে আছে, আরো কয়েক দশক দাঁড়িয়ে থাকবে। বেশ সুন্দর নাম ছিলো ব্রিজটির, নদীটির নাম আরো সুন্দর; তবে নদীটি আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলো দুই তীরের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি, নদীর ওপর

সঙ্গীত লেখা, সহজ কাজ নয়। আমার মনে প্রশ্নই জাগিয়ে দেয় যে যা বিচ্ছিন্ন, তা কি আসলেই সম্পর্কিত হতে চায়; কিছু কি আসলেই পারে সম্পর্কিত হতে? ফুলঝর নদীর দু-তীরের সম্পর্ক ছিলো না, আমি সম্পর্কের একটি কাঠামো তৈরির চেষ্টা করছিলাম; নদীর ওপর ব্রিজের কাজ চলছিলো ঠিকঠাক; ব্রিজটি বেশি বড়ো হবে নয়, আট শো ফুটের মতো দীর্ঘ, পাশে বত্রিশ, আমি নিশ্চিত ছিলাম সব কিছু ঠিক সময়ে ঠিক মতো হয়ে যাবে, কিন্তু হঠাৎ বন্যা আসে। বন্যা হঠাৎই আসে; রওশন ও আমার ব্রিজ, ফুলঝর নদীর ব্রিজের অনেক আগে, হঠাৎ বন্যায়ই ভেসে গিয়েছিলো; আমি নদীর ওপর ব্রিজ বানাতে গিয়ে দেখি সেভাবেই বন্যা আসছে। যমুনার বাঁধ ভেঙে প্রচণ্ড স্রোত বইতে শুরু করে ফুলঝর নদী দিয়ে, ওই স্রোতের বড়ো কাজই হয় দু-দুটি ভিত্তিকূপ ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমার চোখের সামনেই ঘটনাটি ঘটে, অনেকেই চিৎকার করে উঠেছিলো, ঠিকাদারের চিৎকার ছিলো শোনার মতো, কিন্তু আমি ওই দৃশ্য দেখছিলাম নির্বিকারভাবে। ভিত্তিকূপ তৈরি হচ্ছে দেখে আমার যেমন লেগেছিলো, ভেসে যাচ্ছে দেখে তার থেকে ভিন্ন কোনো আবেগ আমার জাগে নি। কাঠামোর কাজ অবধারিত ভেঙে পড়াকে বিশেষ একটা সময়ের জন্যে ঠেকিয়ে রাখা; ওই ভিত্তিকূপ নিজেও কাঠামো, একদিন ধ্বংস হয়ে যেতোই, তবে ওই কূপের কাছে আশা করেছিলাম একটা বিশেষ সময়ের জন্যে ওটি টিকে থাকবে, কিন্তু টিকে থাকতে পারে নি। কিছুই টেকে না, সব কিছুই ভেঙে পড়ে, কোনোটি আগে কোনোটি পরে।

ভিত্তিকূপ ধসে পড়েছিলো বলে আমরা দমে যেতে পারি নি; ব্রিজ আমাদের দরকার, ফুলঝর নদীর ওপর ব্রিজ দরকার, সম্পর্ক দরকার। আগে যেভাবে ভিত্তিস্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছিলাম, তা আর চলে নি; অন্যভাবে অন্যখানে ভিত্তিস্থাপন করতে হয়েছিলো আমাদের, ব্রিজের নকশাও বদল করতে হয়েছিলো সম্পূর্ণরূপে; কিন্তু আমরা সৃষ্টি করতে পেরেছিলাম একটি ব্রিজ, নদীর দুই পারের মধ্যে সম্পর্ক। ফুলঝর নদীর ওপর ওই ব্রিজ এখনো দাঁড়িয়ে

আছে, চোখ বুজলেই ব্রিজটিকে দেখি আমি; ওটি আমার প্রথম ব্রিজ, ওটি আরো অনেক বছর দাঁড়িয়ে থাকবে, সম্পর্ক পাতিয়ে চলবে উত্তরবঙ্গের। সাথে ময়মনসিং আর টাঙ্গাইলের, কিন্তু ওই কাঠামো চিরকাল থাকবে না। আমি এখন একটি বড়ো ব্রিজ নির্মাণের সাথে জড়িয়ে আছি; এ-ব্রিজ সরকারের একটি বড়ো কৃতিত্ব বলে গণ্য হবে, অনেক বিদেশি টাকা ভিক্ষা করতে পেরেছে তারা; যে-মন্ত্রীটি এ-এলাকায় দিন দিন অপ্রিয় হয়ে উঠছে, ব্রিজটি তৈরি হওয়ার পর সে আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলে রাজনীতিকভাবে আশা করা হচ্ছে, ভোট এলে ছিনতাই না করে সে পাশটাশ করবে, তার কাঠামোগুলো ঠিক থাকবে; কিন্তু আমি আর কোনো কাঠামোর ওপরই বিশ্বাস রাখতে পারছি না। উদ্বোধনের সময়ই যদি প্রধান মন্ত্রী, আর পঞ্চাশটি মন্ত্রী, আর একপাল রাজদূত নিয়ে ব্রিজটি নদীর ভেতর তলিয়ে যায়, তাদের আর খুঁজে না পাওয়া যায়, তাতে আমি খুব কষ্ট পাবো না; বরং চোখ ভরে সেই দৃশ্য। নির্বিকারভাবে দেখবো। কিন্তু আসলেই কি আমি নির্বিকারভাবে দেখবো, দেখতে পারবো? আমি কি এতোটা নির্বিকার হয়ে উঠতে পেরেছি?

চল্লিশ পেরিয়েছি, সব মিলে ভালোই আছি; আমার ব্যক্তিগত কাঠামোটিও চমৎকারই বলে মনে হচ্ছে, যদিও এর ওপরও আমি বিশ্বাস রাখি না, যে-কোনো সময় এটা ধসে পড়তে পারে। মনে মনে একটা ভয় আছে আমার, ধসে পড়ার ভয়, আমি ধসে পড়তে চাই না। দিন দিন আরো আকর্ষণীয় হচ্ছি শুনতে পাই; এমন অনেকের। মুখে শুনি যে হেসে উড়িয়ে দিতে পারি না, চুপচাপ ভেতরে জমিয়ে রাখি। সৌন্দর্য আর প্রশংসা সব সময়ই ভালো। যে-ব্রিজটি তৈরি করছি এখন, যার নকশা আমিই করেছি, দেখাশোনা করছি, সেটি আমাকে উদ্বেগে রাখছে বছর দুই ধরে, কেনো যেনো আমার ভয় হচ্ছে এটি ভেঙে পড়বে। হয়তো ভেঙে পড়বে না, আসলে ভেঙে পড়বেই না, আমার ব্যক্তিগত কাঠামো ভেঙে পড়ার পরও ওই ভয়ঙ্কর নদীটির ওপর ব্রিজটি দাঁড়িয়ে থাকবে, দুই পারের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করে

চলবে; তবু আমার ভয় হয় ব্রিজটি ভেঙে পড়বে, আমি দেখতে পাই ভেতরে ভেতরে এটি জীর্ণ হচ্ছে, এটি ভেঙে পড়ছে। এটি ভেঙে পড়ছে দেখার সময় আমি অন্য কিছু দেখতে পাই, আমার পাড়াটিকে দেখতে পাই। আমি এক ভালো আবাসিক এলাকায়ই থাকি, অধিকাংশেরই গাড়ি আছে, কারো কারো একাধিক আছে; বাড়িও আছে অনেকের, যাদের নেই তাদের শিগগিরই হবে; কিন্তু তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখা যায় তাদের ভেতরে গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোটি ভেঙে পড়েছে। হয়তো তারা তা বুঝতে পারে, হয়তো পারে না; কিন্তু ভেঙে যে পড়েছে। কোনো সন্দেহ নেই।

ঘুম থেকে ওঠার পর একবার উত্তরের বারান্দায় যাওয়া আমার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, এটি আমার উৎকৃষ্ট অভ্যাসগুলোর একটি; বারন্দায় গেলে সামনের দালানের বারান্দায় বেগম আর জনাব নুর মোহাম্মদকে দেখতে পাই। যদিও তাদের সাথে আমার বিশেষ আলাপ নেই, তবু তাঁদের দেখলে আমার ভালো লাগে; আমি কি তাঁদের দেখার জন্যেই বারান্দায় যাই? তাদের বয়সের ফারাকটি একটু বেশিই; নুর মোহাম্মদ নিশ্চয়ই পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন, তবে তাঁর দেহখান বেশ বলিষ্ঠ, বারান্দায় তিনি খালি গায়েই দাঁড়ান, তার বুকের লোমগুলো দেখা যায়; তাকে একটি স্বাস্থ্যবান মোষের মতো দেখায়। বেগম নুর মোহাম্মদ চল্লিশ হবেন, এককালে তিনি একটি ধবধবে হরিণী ছিলেন সন্দেহ নেই, সে-ছাপ রয়ে গেছে তার শরীরে, যদিও তার মুখ ভরে ক্লান্তি নেমেছে। তাঁর মুখে দূর থেকে আমি যা দেখতে পাই, তা কি আসলে ক্লান্তি? না কি। ভোরবেলাকার রোদে আমি ঠিক মতো তাঁর মুখটি দেখতে পাই না? তাঁদের আমি প্রতিদিনই বারান্দায় দেখতে পাই, কিন্তু কখনো তাদের কথা বলতে দেখি না, একজনকে আরেকজনের দিকে তাকাতেও দেখি না। নুর মোহাম্মদ অনেকক্ষণ ধরে। নিজের বুক মালিশ করেন, আর দক্ষিণপশ্চিম দিকে তাকিয়ে থাকেন; আবার কখনো কনুই বারান্দার রেলিংয়ের ওপর রেখে শরীরটা ভেঙে

দাঁড়ান, নিচের মাটি দেখেন। বেগম নুর মোহাম্মদ বসেন এক কাপ চা নিয়ে, চায়ের কাপটি তিনি বারান্দার রেলিংয়ের ওপর রেখে বাঁ হাত দিয়ে ধরে রাখেন, কিন্তু চায়ের পেয়ালায় তাকে মুখ দিতে বিশেষ দেখি না, পুব দিকে তিনি তাকিয়ে থাকেন ভাবলেষহীনভাবে। আমি অনেকবার খেয়াল করে দেখার চেষ্টা করেছি তার মুখে কোনো ভাবের আভাস দেখা যায় কি না, তিনি নুর মোহাম্মদ সাহেবের দিকে বিরক্তির সাথেও অন্তত একবারও তাকান কি না, কিন্তু আমি তা দেখতে পাই নি।

বেগম ও জনাব নুর মোহাম্মদ কি সারারাত শারীরিক শ্রম করার পর ক্লান্ত? এ-বয়সে অধিক নৈশ শ্রম কি পোষাচ্ছে না তাদের? তবু তারা শ্রম করে চলছেন? মেয়েটি তাদের দিল্লিতে, ছেলেটি নিউইয়র্কে বলে আবার একটি শিশু আনতে চাইছেন তাঁরা? শ্রমের ক্লান্তি নিয়ে সকালবেলা তারা কি একজন আরেকজনের দিকে তাকানোর আগ্রহও বোধ করেন না? তবে তারা কি সারারাতে একবারও, ঘুমের মধ্যেও, একজন ছুঁয়েছেন আরেকজনকে? আমি জানি না, আমার জানার কথা নয়, তারা এক শয্যায়। ঘুমোন কি না, একই ঘরে ঘুমোন কি না। দেখে মনে হচ্ছে এখন তাদের একজন হঠাৎ বারান্দায় পড়ে গেলে আরেকজন খুব বিরক্ত হবেন; বেগম নুর মোহাম্মদের খুব খারাপ লাগবে চায়ের পেয়ালা সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াতে, নুর মোহাম্মদ সাহেবের খারাপ লাগবে রেলিং থেকে কনুই সরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে। তাদের একজন পুরুষ। আরেকজন মেয়েলোক, একই ঘরে তাঁদের থাকার কথা ছিলো না; কিন্তু তারা পরস্পর বিবাহিত বলে, একজন স্বামী আরেকজন স্ত্রী বলে-যেমন ফিরোজা ও আমি বিবাহিত বলে থাকছি, তারাও থাকছেন, অনেক বছর ধরে তাদের একজনের শরীরের ওপর আরেকজনের অধিকার সবাই মেনে নিচ্ছে; কিন্তু তারা এতো দূরে কেনো? তাদের দেখে যেমন মনে হচ্ছে তাতে বিশ্বাসই করতে কষ্ট হচ্ছে কখনো তাঁদের একজন উলঙ্গ দেখেছেন আরেকজনকে। না দেখলে তারা এত দিন

একসাথে থাকতে পারতেন না, নিশ্চয়ই দেখেছেন, হয়তো আজ রাতেই দেখেছেন, কিন্তু একই বারান্দায় তাঁরা এতো দূরে কেনো?

আমি নুর মোহাম্মদ আর বেগম নুর মোহাম্মদের কথা ভাবছি কেনো, নিজের কথাই তো ভাবতে পারি; ওরা দুজন অন্তত ভোরবেলা একসাথে বারান্দায় আসেন, কিন্তু আমি। তো একলাই আসি, ফিরোজা বারান্দায়ও আসে না। ফিরোজা আসে না বলে কি আমার খারাপ লাগে? আমি কি চাই এই এখন যখন আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে নুর মোহাম্মদ। দম্পতিকে দেখছি, তখন ফিরোজা আমার পাশে এসে দাঁড়াক, আমরা একসাথে সামনের দালানের দম্পতিকে দেখি, দূরের দু–একটি পাখি আর গাছের ডালে পাতার সবুজ দেখে মুগ্ধ হই? না, আমি চাই না ফিরোজা এখন আমার পাশে এসে দাঁড়াক; সে এসে দাঁড়ালে আমার বিরক্তি লাগবে, আমি অবশ্য তা প্রকাশ করবো না, একটু হাসারও চেষ্টা করবো হয়তো, কিন্তু আমি চাই না ফিরোজা এখন আমার পাশে এসে দাঁড়াক। স্বামী-স্ত্রী খেলা যথেষ্ট হয়েছে, এ-ভোরবেলা তা আর খেলতে ভালো লাগবে না। ফিরোজা যে আসে না এতে আমার খারাপ লাগে না, বরং অত্যন্ত ভালো লাগে; সে না এলে আমি বেগম নুর মোহাম্মদের দিকে ভালোভাবে তাকাতে পারতাম না, বা আমি আসা বন্ধ করে দিতামা। ফিরোজা আসে না বলে আমার ভালো লাগে। তাহলে। ফিরোজা কি আমাকে ক্লান্ত করে, আমি কি ক্লান্ত করি ফিরোজাকে? এখন আমি যদি ফিরোজাকে ডাকি, সে কি ঝলমল করতে করতে ছুটে আসবে? সে আমার ডাক শুনতেই হয়তো পাবে না, যেমন আমিও তার ডাক শুনতে পাই না মাঝেমাঝে।

আমাদের-ফিরোজার ও আমার-ব্রিজটি ভেঙে পড়ছে বলেই মনে হচ্ছে; ঠিক ভেঙে পড়ছে না, তবে ওই সাঁকো দিয়ে অনেক দিন আমরা চলাচল করছি না; কাঠামোটি দাঁড়িয়ে আছে,

তার ওপর কোনো পায়ের শব্দ নেই। ফিরোজার মুখ দেখার জন্যে আমি কোনো ব্যাকুলতা বোধ করি না, বেশির ভাগ সময় না দেখলেই ভালো লাগে; ফিরোজারও তাই হয় নিশ্চয়ই, আমার মুখের দিকে সে অনেক দিন তাকায়ই নি, আমিও বোধ হয় তাকাই নি, মাঝেমাঝে আমি তার মুখটিকে মনে করতে পারি না। আমরা যে একজন ঘেন্না করি আরেকজনকে, পাশাপাশি বসতে আমাদের বমি পায়, এমন নয়; কিন্তু আমরা কোনো উল্লাসও বোধ করি না। ফিরোজাকে দেখে আমি অনেক বছর চঞ্চল হই নি; বাসায় ফিরে যখন দেখি সে বাসায় নেই, তখন দু-একটি সন্দেহ। মনে উঁকি দেয়, কিন্তু কোনো উদ্বেগ বোধ করি না; যখন দেখি সে ফিরে আসছে তখন কোনো কাঁপন লাগে না। আমাদের সব কি ঠিক আছে? আমরা কি ঠিক আছি? একটি বেজি দৌড়ে যাচ্ছে দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছটির পাশ দিয়ে, ঢুকছে জঙ্গলের মধ্যে, দেখে। আমার ভালো লাগছে, মন ভরে উঠছে; ফিরোজা যদি ওই বেজিটি হতো, দেখে আমার ভালো লাগতো। কিন্তু আমরা স্বামীস্ত্রী, ভোরবেলা কৃষ্ণচূড়া গাছের পাশ দিয়ে দৌড়ে যাওয়া বেজি আমরা কোনো দিন আর হয়ে উঠতে পারবো না আমাদের কাছে। আমাদের সব কিছু কি ঠিক আছে?

আমরা এক বিছানায় ঘুমোই না, আমারই এটা ভালো লাগে না; ঘুমোনার সময়, কারো একটা হাত বা পা আমার গায়ে এসে পড়লেই আমার ঘুম ভেঙে যায়, ঘুমোনার সময় আমার গায়ের ওপর বিশ্বসুন্দরীর বাহু, স্তন, জংঘাও আমার সহ্য হবে না। আমি কামপ্রেমহীন ঘুম পছন্দ করি। ঘুমোতে যেতে সাধারণত আমার দেরি হয়; আর, ফিরোজার রাত্রিজ্ঞান একান্ত নিজস্ব ও অদ্ভুত, কোনো দিন সন্ধ্যার পরই তার মনে হয় রাত গম্ভীর হয়ে গেছে, আর জেগে থাকা যায় না, সে আর জাগতে পারে না, বালিশ জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ে, মানুষের পৃথিবী তখন তার ভালো লাগে না তার মোয়ার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়। আমি কোনো কোনো দিন দেরি করে ফিরি, দেখি ফিরোজা ঘুমিয়ে পড়েছে; ঘুমন্ত মানুষকে

ডাকতে আমার ইচ্ছে হয় না, খুব শারীরিক দরকারেও না। একটি ঘুমন্ত মানুষকে ঠেলে জাগিয়ে প্রস্তুত করে দরকার মিটিয়ে আরেক বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ার কথা ভাবতেই আমার ঘেন্না লাগে। আবার কখনো রাত দশটায় ঘুমোতে গিয়ে দেখি ফিরোজার মনে হচ্ছে রাতই হয় নি, তার দু-একটা অনুষ্ঠান দেখা দরকার, একটি সিনেমা পত্রিকার কয়েক পাতা পড়া তার বাকি আছে; তখন আমি শুয়ে পড়ি, রাতে আর আমাদের দেখা হয় না। কোনো কোনো রাতে আমার ঘুম আসে না, অনেকটা শারীরিক দরকারেই, দরকারটা মিটে গেলে একটা চমৎকার ঘুম হতে পারতো; কিন্তু আমি ফিরোজাকে ডাকি না। এটা চলে আসছে অনেক বছর ধরে, কিন্তু আমরা বেশ আছি; তবে আমার মনে হয় আমাদের কিছু একটা হয়েছে। আমাদের। সাঁকোটিতে আর চলাচল নেই; তাতে আর আমাদের পায়ের ছাপ পড়ে না; ওটি আছে, সবাই দেখছে, আমরাও দেখছি, এই সব।

আমি জানি না ফিরোজার আর কোনো ব্রিজ আছে কি না, কিন্তু আমি যতোই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছি ততোই আকর্ষণীয় হচ্ছি, আর ততোই আমার ব্রিজের সংখ্যা বাড়ছে; সেগুলোতে চলাচলও অনেক বেশি। ফিরোজা-আমি বিবাহিত, আমরা স্বামীস্ত্রী, এটি আমাদের সর্বজনস্বীকৃত ব্রিজ, এটিই আমার একমাত্র ব্রিজ বলে অন্যরা মনে করার ভান করে, আমিও করি। এছাড়া অন্য কোনো ব্রিজ অন্যরা মেনে নেবে না, যদিও তারাও নিজেদের ব্রিজে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত, তারাও অন্য ব্রিজ তৈরি করে চলছে, বা তৈরি করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। একটি পুরুষ আর একটি নারী কতো দিন একসাথে থাকার পর ক্লান্ত হয়? কতোবার একসাথে ঘুমোনোর পর, ঠিক কতোটি সঙ্গমের পর, তারা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ হারায়? মানুষের গঠন আমি জানি না; আমি জানি না মানুষের ভেতরে এমন কিছু আছে কি না যা পালন করে অন্যের প্রতি আকর্ষণ বোধ করার দায়িত্ব; আছে নিশ্চয়ই, আমি তা টের পাই, বারবার আমি টের পেয়েছি; কিন্তু সেটির শক্তি কতোটা? কতো দিন

সেটি আকর্ষণ বোধ করে যেতে পারে? ওই আকর্ষণ বোধ। করার শক্তিটির নামই সম্ভবত প্রেম। প্রেম বিয়ের শর্ত নয়, বিবাহিত জীবনেরও শর্ত নয়, কোনো ধর্মই চায় না স্বামীস্ত্রী প্রেমের মধ্যে থাকবে; এখন মানুষ একটু বেশি দাবি। করছি বিয়ের কাছে, শুনতে ভালো শোনায় বলে। কোনো কালে কোনো স্বামীস্ত্রী। ভালোবেসেছে একে অন্যকে, এটা আমার বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না; সহবাস, সঙ্গম, সন্তান, দায়িত্ব, এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়া, বেশ এই, এই তো বিয়ে। যেমন আমরা, ফিরোজা আর আমি, আমাদের মধ্যে বিশেষ কোনো গোলমাল নেই, সবই ঠিক আছে; কিন্তু আমার মনে হয় কোথাও একটি বড়ো গোলমাল ঘটে গেছে, যার জন্যে আমি। দায়ী নই, ফিরোজাও দায়ী নয়।

ভাত খেতে বসেছি, খাওয়া আমার শেষ হয়ে এসেছে, ফিরোজা আমার পাতে বড়ো এক চামচ ভাত তুলে দেয়।

আমি তো ভাত চাই নি, আমি অবাক হয়ে বলি।

চাও নি তাতে কী, ফিরোজা বলে, ভাত তো তুমি নিতেই।

তুমি কী করে জানলে? আমি বলি।

অন্য কেউ দিলে খুব তো খুশি হতে, আমি দিচ্ছি বলেই, ফিরোজা বলে।

আমি আর কথা বলি না, ভাত খাই; আমি পছন্দ করি না আমার পাতে কেউ ভাত তুলে দিক; এটা আমার ত্রুটি, ভাত তুলে দিলে খুশি হতে হয়, কিন্তু আমি হতে পারি না। কেননা

হতে পারি না? ফিরোজা আমার পাতে ভাত তুলে দিলে আমার কেনো ভালো লাগে না, সে কি ফিরোজা বলে? অন্য কেউ হলে সত্যিই কি আমি আনন্দিত হতাম? ফিরোজার ভাত তুলে দেয়ার মধ্যে আমি কোনো চাঞ্চল্য দেখি না, আমার পাতে ভাত তুলে দিয়ে সে সুখ পাচ্ছে, আমার মনে হয় না; এমনকি সে একটি দায়িত্ব পালন করছে, এটা তাও নয়। হতো যদি আমার হাত অবশ হয়ে গেছে, দুর্ঘটনায় একটি হাত হারিয়ে ফেলেছি, ভাত তুলতে পারছি না, সে তুলে দিচ্ছে, একটি উপকারী দায়িত্ব পালন করছে, তাহলে কৃতজ্ঞ বোধ করতাম; কিন্তু এই হঠাৎ ভাত তুলে দেয়ার মধ্যে একটু প্রভুত্ব করার ঝোঁক আছে, সে আমার বৈধ স্ত্রী, যখনতখন ইচ্ছে করলেই সে আমার। পাতে ভাত তুলে দিতে পারে, আমার দরকার থাক বা না থাক।

আমি এক কাপ চা খেতে চাই। কাজের মেয়েটি জানে আমি ঠিক কী রঙের চা খেতে পছন্দ করি; মেয়েটি দু-মাসেই শিখে ফেলেছে, জেনে ফেলেছে ঠিক কতোটা চিনি চাই আমার; ফিরোজা অবশ্য তা জানে না, তাতে আমার একটুও দুঃখ নেই, বরং আমি কখনোই চাই না ফিরোজা আমার জন্যে চা তৈরি করে আনুক। চা বানানোর মতো। একটি কাজের জন্যে কাজের মেয়েই যথেষ্ট, তার জন্যে একটি বিবাহিত স্ত্রী দরকার পড়ে না। কাজের মেয়েটি পিরিচটি খুব যত্নের সাথে মোছে, একফোঁটা চাও তাতে লেগে থাকে না; চা খাওয়ার আগে আমি চামচ দিয়ে চা নাড়তে পছন্দ করি, মেয়েটি হয়তো দেখেছে, আমিই হয়তো তাকে বলে দিয়েছি চায়ের সাথে চামচ দেয়ার, তাই সাথে সে একটি পরিচ্ছন্ন চামচও দেয়। আমি ওই চা খেয়ে তৃপ্তি পাই। আমি মনে মনে চাই মেয়েটি চায়ের পেয়ালা আমার সামনের টেবিলে এনে রাখুক। মেয়েটিকে একবার দেখে কি আমার ভালো লাগে? আমি জানি না, তবে সচেতনভাবে মেয়েটিকে দেখার আগ্রহ আমার হয় নি কখনো। কোনো কোনো দিন ফিরোজা মেয়েটির হাত থেকে। চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে আমার সামনে রাখে,

কয়েক ফোঁটা চা ছলকে পিরিচে পড়ে, চামচটি মেঝেতে পড়ে যায়; চামচটি উঠোনোর জন্যে ফিরোজা মেয়েটিকে ডাকতে থাকে। আমার আর চা খেতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু চা আমি খাই; না খেলে একটা ঘটনা ঘটে যাবে, আমি অমন ঘটনায় অংশ নিতে চাই না। বাবাকেও দেখেছি। কদবানের হাতের চা সুখের সাথে খেতে, মা চা নিয়ে এলে বাবার সামনে চা অনেকক্ষণ ধরে পড়ে থাকতো, ঠাণ্ডা হয়ে যেতো; তারপর মা তাড়া দিলে তিনি একবারে চা গিলে ফেলতেন, সেদিন আর চা খেতেন না।

আমার ছোটো বোনটি, ইসমত, একটি সমস্যায় পড়েছে; তাকে আমার উদ্ধার করতে হবে, যদিও উদ্ধার করা অসম্ভব আমার পক্ষে, এসব ক্ষেত্রে কেউ উদ্ধার করতে পারে না। ইসমত আমার ছোটো বোন, ওকে আমি পছন্দ আর অপছন্দ দুটোই করি, ও তার একটার খবরও জানে না; আমি কখনো প্রকাশ করি নি ওকে আমি পছন্দ করি, এও জানতে দিই নি ওকে আমি অপছন্দ করি। এমএ পর্যন্ত ওর আসার কথা ছিলো না, বাবা-মা কেউ চায় নি, তেরো বছর থেকেই ওর বিয়ের চেষ্টা চলছিলো, আমি বাধা। দিয়েছি, ও নিজেও বাধা দিয়েছে। সবাইকে অবাক করে ইসমত এমএ পর্যন্ত চলে। আসে; এবং এমএ পড়ার সময়ই আমাদের না জানিয়ে বিয়ে করে ফেলে। ছেলেটা এক ক্লাশ নিচে পড়তো ওর থেকে, তাঁদরও ছিলো বেশ, বিশ্বের সব কিছু সে সবার চেয়ে। বেশি জানতো, কাউকেই পাত্তা দিতো না, আমার সাথে দু-একদিন এমনভাবে কথা বলেছে যেনো আমি ক্লাশ ফোরের ছাত্র। এ-বিয়েতে সবাই খেপে উঠেছিলো ইসমতের ওপর।:আমি খেপি নি। ওর বিয়ে করার ইচ্ছে বা দরকার হয়েছে, ও বিয়ে করেছে, তাতে আমার কী; একটা চাড়ালকেও যদি ও বিয়ে করে থাকে, চাঁড়ালের সাথেই যদি ও ঘুমোতে চায়, তাতে আমি বাধা দিতে পারি না। শরীরটা ওর, জীবনটা ওর। বিয়ে। করাটা দরকারই হয়ে পড়েছিলো ওর জন্যে, নইলে প্রথম ভাগনেটি পিতার পরিচয়। ছাড়াই জন্মাতো, কারো ভালো লাগতো না, ঝামেলা

হতো। ইসমত আর তার তাঁদরটি বেশ প্রজননশীল ছিলো, বিস্তৃত হচ্ছিলো তারা তীব্র বেগে, চার বছরেই চার চারটি বাচ্চা জন্মাতে পেরেছিলো; একটা বাচ্চাকে ইসমতের পেটে রেখেই তাঁদরটি এক সন্ধ্যায় খুন হয়ে যায়। খুন হয়ে যাওয়ার পর আমি প্রথম বুঝতে পারি তাঁদরটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

ইসমত ভালো চাকুরিই করে, তবে নিশ্চয়ই ওর কষ্ট হচ্ছে সংসার চালাতে, কিন্তু ও কারো সাহায্য চায় নি; বরং ও-ই সাহায্য করে অনেককে। গ্রাম থেকে আত্মীয়রা এসে আমার বাসায় ওঠে না, হয়তো সাহস করে না, বা স্বস্তি পায় না, এতে আমার ভালোই লাগে; ওঠে ওর বাসায়, এতে আমার কিছুটা খারাপই লাগে। আমি দু-একজনকে আমার বাসায় উঠতে বলেও দেখেছি, তারা এককাপ চা খেয়ে চলে যায়, আর আসে না। একবার আমি অনেক রাত পর্যন্ত একজনের জন্যে না খেয়ে বসে ছিলাম, সে আসে নি; ফিরোজা অবাক হয়েছিলো গ্রামের একটি আত্মীয়ের জন্যে আমার বসে থাকা দেখে। বছর চারেক আগে ইসমত একটি হিন্দু ছেলেকে হিন্দু বলা ঠিক হচ্ছে না মনে হচ্ছে, কেউ কেউ আমাকে সাম্প্রদায়িক ভাবতে পারে-বাসায় জায়গা দেয়; ছেলেটা। আমাদের গ্রামেরই, ওর পিতাকে আমি মাছটাছ বিক্রি করতে দেখেছি, মদনকুমার না। হরিপদ নাম ছেলেটার, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিলো, কিন্তু অত্যন্ত চৌকশ ছেলে সে। এর বেশি সংবাদ আমি রাখি না, তবে শুনি মদন নাটকটাটক করে খুব নাম করেছে, এক পত্রিকায় আমি তার সাক্ষাৎকারও পড়েছিলাম। অভিনয় যে এখন এতো শ্রদ্ধেয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমার জানা ছিলো না, মদনকুমারের সাক্ষাৎকার পড়েই আমার চোখ। খুলে যায়; ফেলটেল করা বাউণ্ডুলেরাই এসব করে বলে আমি জানতাম, ওর সাক্ষাৎকার পড়ে বুঝতে পারি অভিনয় আজকাল শ্রেষ্ঠ প্রতিভারাই করেন। তাই হবে, এ পর্যন্ত কেউ আমার সাক্ষাৎকার নিতে আসে নি। ছোঁকরাকে মনে মনে আমি একটু ঈর্ষাও করি। ইসমত ছোঁকরাকে বিয়ে করছে শুনে আমি উত্তেজিত হই

নি, ভালোই লাগছিলো, আমরা তো আর ব্রাহ্মণ নই; মা কিছুটা উত্তেজিত হয়েছিলো; কিন্তু ইসমত যা করতে চায়, তা সে করে। ইসমতের একটি পুরুষ দরকার ছিলো, ছোঁকরার একটি থাকাখাওয়ার জায়গার দরকার ছিলো, আমি আপত্তির কিছু দেখি নি। ছোঁকরা দেখতে। বেশ, ইসমতের প্রথম তাঁদরটার থেকে অনেক বেশ, গজারমাছের মতো, বয়সে বছর দশেকের ছোটো; ইসমত নিশ্চয়ই সব কিছু পরখ করেই নিয়েছে। খোকাও হয়েছে। একটি বছর দুয়েক আগে, কিন্তু ইসমত এখন একটু সমস্যায় পড়েছে।

দাদা, একটু বাধা দাও এতে, ইসমত খুব আবেগের সাথে বলে আমাকে, কেঁদেও। ফেলতে পারে বলে মনে হচ্ছে। ইসমতকেও এতোটা বিহ্বল হতে আমি আগে কখনো দেখি নি; তাঁদরটা খুন হয়ে যাওয়ার পরও ইসমত এতোটা কাতর হয় নি।

আচ্ছা, দেখি, আমি বলি, আজই দেখছি।

তোমার সাথে তো মেয়েটির আম্মার পরিচয় আছে, তুমি তার সাথে একবার কথা বলো, ইসমত বলে, মদন এতোটা বিশ্বাসঘাতক হবে আমি কখনো ভাবি নি। গলা ধরে আসতে চাচ্ছে ইসমতের, খুব কষ্ট পাচ্ছে, আরো কষ্ট পাবে ইসমত।

তুই জানতি না আগে? আমি বলি।

এসব ব্যাপারে বউই জানে সবার পরে, ইসমত বলে, এখন দেখি সবাই জানে। অনেক আগে থেকে, শুধু আমি ছাড়া। ইসমতকে বেশ অভিজ্ঞও মনে হচ্ছে। অবাক লাগছে, আমাকে একবারও কেউ বলে নি।

মদনকুমার কয়েক দিন ধরে ইসমতের বাসায় আসছে না। আগে মদন দুপুরে আসতো না, তাতে ইসমতের কোনো সন্দেহ হয় নি। কিন্তু রাতে না আসায় ইসমত প্রথমে ভয় পায়, পরে খবর পায় মদন একটি তেলতেলে বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে অন্য এক বাসায় উঠেছে। ইসমত বেশ কষ্ট পাচ্ছে, মেয়েটি বাচ্চা বলে বেশি কষ্ট পাচ্ছে, বুড়ি হলে এতো কষ্ট পেতো না, হঠাৎ ইসমত নিজেকে বুড়ি ভাবছে, ইসমতের মুখে প্রতারিতের অপমানিতের মুখ দেখতে পাচ্ছি। মেয়েটির মায়ের সাথে আমার পরিচয় আছে। মেয়েটির বাবা আমাদের ফার্মেই ছিলেন, তাঁর কাছে ব্রিজের অনেক কিছু আমি। শিখেছি, কয়েক বছর আগে হঠাৎ হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে ব্রিজট্রিজ ফেলে রেখে চলে। গেছেন। মেয়েটিকেও আমি চিনি, আমি বুঝতে পারছি ইসমতকে উদ্ধার করতে আমি পারবো না, কেউই পারবে না, ইসমতের ধসে পড়া ব্রিজ আমি সারাই করতে পারবো না; ওই মেয়েকে ছেড়ে মদন ইসমতের কাছে ফিরবে না। দেশ খুব সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠছে, দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু মদন দেখছি একটির পর একটি মুসলমান মেয়েকে নিকে করে চলছে। মেয়েটির নামও আমার মনে পড়ছে, তিলোত্তমা, ইসমতই মনে করিয়ে দেয়। মেয়েটি আমার কোলেও দু-একবার বসেছে। ফয়েজ সাহেবের বাসায় আমি বেশ কয়েকবার গেছি, মেয়েটি তখন মাধ্যমিকে পড়ে হয়তো, খুব ঝলমলে, উপচে পড়ছে সব কিছু। সে এসেই কোলে বসতো, জড়িয়ে ধরতো। আমি অস্বস্তি বোধ করতাম, উত্তাপও; ফয়েজ সাহেব কিছু মনে করতেন না, তবে আমি যে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছি তাতে তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন।

ভাবী, আমি মাহবুব বলছি, আমাকে চিনতে পারছেন? আমি ফয়জুন্নেসা ফয়েজকে ফোন করি, আপনার সাথে আমি একটু দেখা করতে চাই।

আমার সাথে আজকাল আর কে দেখা করে, ফয়জুন্নেসা ফয়েজ একটু শ্বাস একটু ক্ষোভ মিলিয়ে বলেন, আমার কি সেই দিন আছে!

দুঃখিত ভাবী, আপনার কথা প্রায়ই মনে পড়ে, কিন্তু সময় করে উঠতে পারি না, আমি একটু বিনয়ের ভাব করি।

বিনয়ের দরকার নাই, আসতে চাইলে এখনই আসেন, ফয়জুন্নেসা ফায়েজ বলেন, আজকাল আর এই সব দ্রতা ভালো লাগে না।

আমি আসছি, ভাবী, বিব্রত হয়ে আমি টেলিফোন রাখি।

ফয়জুন্নেসা ফয়েজ বাসায় একলাই আছেন। কয়েক বছরে বেশ বয়স হয়ে গেছে। তাঁর; তবে ঠোঁট এখনো আগের মতোই লাল, বাহু আগের মতোই ভোলা, পেট এখনো আগের মতোই আকর্ষণীয়। ফয়েজ সাহেবের তিনি দ্বিতীয়, আর ফয়েজ সাহেব তার তৃতীয়।

মদন নামের একটি ছেলেকে, আমি কথা শেষ করতে পারি না।

মদ্না, দি বাস্টার্ড, ফয়জুন্নেসা ফয়েজ বলেন, আপনি ওই বাস্টার্ডটার পক্ষে কথা বলতে এসেছেন? খুব উত্তেজিত ফয়জুন্নেসা ফয়েজ।

না, ভাবী, আমি কথা বলতে এসেছি মদনের বিপক্ষেই। মদনের সাথে আমার ছোটো বোনের বিয়ে হয়েছিলো, আমি বলি, একটি বাচ্চাও আছে।

আমি জানতাম বাস্টার্ডটা বিয়ে করেছে, একটি মুসলমান মেয়েকেই করেছে, সে যে আপনার বোন, তা জানতাম না। বাস্টার্ডটাকে আমি পছন্দই করতাম, সে বলতো সে আমাকে পছন্দ করে, বলতো আমার জন্যেই এ-বাসায় আসে, আমি বিশ্বাস করতাম। তার বউ আছে এটা কোনো সমস্যাই ছিলো না, বাস্টার্ডটাকে ভাগানোর কোনো ইচ্ছে আমার ছিলো না। আমি চেয়েছিলাম মাঝেমাঝে সঙ্গ।

আপনি মনে হয় ভুল করেছিলেন, আমি বলি।

ভুল করেছিলাম, তবে ভাগ্য ভালো মেনোপজটা অনেক আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিলো, নইলে একটা ঝামেলা হতো। ফয়জুন্নেসা ফয়েজ বলতে থাকেন, হারামজাদার বাচ্চা দুপুর হলেই এখানে চলে আসতো, খেতো এখানেই, তিলোত্তমা ওকে জড়িয়েটড়িয়ে ধরতো, কিন্তু রিলেশনটা ছিলো আমার সঙ্গেই। খেপে ওঠেন। ফয়জুন্নেসা ফয়েজ।

এখন কী করা যায় বলুন, একটা কিছু করা দরকার, আমি বলি।

কিছু করতে পারলে আমি নিজের জন্যেই করতাম, ফয়জুন্নেসা ফয়েজ বলেন, তিলোত্তমা চার মাসের প্রেগন্যান্ট, আমিও দেড় বছরের প্রেগন্যান্ট হতে পারতাম মেনোপজটা না হলে।

আমার বোনটি ভেঙে পড়েছে, আমি বলি, ওও মদনকে বিশ্বাস করতো।

আমি কি কম ভেঙে পড়েছি মনে করেন? ফয়জুন্নেসা ফয়েজ বলেন, মদনের সাথে দুপুরগুলোর কথা কি আমার মনে পড়ে না? মেয়ের কাছে হেরে যেতে আমার কষ্ট লাগে না? ও আমার অভ্যাসই বদলে দিয়েছিলো, রাতের বদলে দুপুর। খুব দক্ষ ছিলো মদন।

আমি কথা হারিয়ে ফেলি, শুধু বুঝতে পারি ইসমতকে আমি উদ্ধার করতে পারবো না।

ফয়জুন্নেসা ফয়েজ বলেন, তিলোত্তমার কাছে আমি দাঁড়াতে পারি না, তার যৌবন আছে, আপনি তো তাকে দেখেছেন, মদনা তিলোত্তমাকে রেখে আপনার বোন বা আমার কাছে ফিরে আসবে না।

দেয়ালে তিলোত্তমার ছবিটার ওপর আমার চোখ পড়ছে বারবার, আমি তার সাথে একমত; আমি যদি মদন হতাম তাহলে কি ফিরতাম, দেয়ালের ওই ছবিটি যার, তার শরীরটি ফেলে কি পাঁচপাঁচটি বাচ্চার মায়ের শরীরের কাছে ফিরতাম? মদনকে জেলে পাঠাতে পারি, হয়তো পাঠাতেও হবে, তবে মদন আনন্দে জেলে যাবে, জেলে যেতে তার কষ্ট হবে না, সুখই লাগবে, বেরিয়ে তিলোত্তমার কাছে যাবে তিলোত্তমা যতো দিন। তিলোত্তমা আছে, তারপর অন্য কোথাও যেতে পারে, কিন্তু তার আগে যাবে না, আমিও যেতাম না।

ফয়জুন্নেসা ফয়েজ বলেন, আপনার বোনের একটি পুরুষ দরকার, আমারও একটি পুরুষ দরকার, আমি এখনো বাতিল হয়ে যাই নি। পুরুষ আমি পাবো, পেতেই হবে আমাকে, রাস্তাঘাটে পুরুষের অভাব নেই, কুত্তার মতো ঘুরছে তারা, কিন্তু মদনার মতো একটা ছোঁকরা পাবো কি না জানি না।

আমাকে উঠতে হবে, ইসমতকে আমি উদ্ধার করতে পারবো না, কাউকেই পারবো না। উদ্ধার করার কথা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে, আমি হয়তো সুস্থ নই, নইলে এমন নিরর্থক কাজের ভার আমি নিলাম কী করে? ইসমতের একটি পুরুষ লাগবে, ইসমতকে একটি পুরুষ নিজেই খুঁজে নিতে হবে, তা ইসমত পারবে; ইসমত চাইলে ইসমত পারে, কিন্তু মদনকে সে পাবে না। মনে হচ্ছে মদনকে ইসমত ফিরে পেতে চায়, এখানেই আমার একটু কষ্ট হচ্ছে, যে ফিরে পেতে চায় সে ভিক্ষুক, ইসমত এখন ভিক্ষুক, আমার কষ্ট হচ্ছে, মদনকে ফিরে পেতে চায় ইসমত, হয়তো তার ঘুম হয় না। কাউকে ফিরে পেতে চাওয়ার মধ্যে গভীর যন্ত্রণা আছে, ইসমত সে-যন্ত্রণার মধ্যে আছে। পরিত্যাগ করা বেশ সুখকর; যে পরিত্যাগ করে, সে ফেলে যায় বাসি মাল, যে-বাসি মাল তার আর রোচে না, সে আরো টসটসে কিছু পেয়েছে, তার স্বাদ তীব্র, সে কোনো অভাববোধের মধ্যে থাকে না; ইসমত এখন বাসি বস্তু, মদনের অখাদ্য, এখন চরম অভাববোধের মধ্যে রয়েছে ইসমত, আর ফয়জুন্নেসা ফয়েজ; তাদের কাউকেই আমি উদ্ধার করতে পারবো না। আমাকে এখন উঠতে হবে।

আপনি মাঝেমাঝে দুপুরবেলা আসতে পারেন, ফয়জুন্নেসা ফয়েজ বলেন।

ধন্যবাদ ভাবী, আসতে চেষ্টা করবো, কিন্তু আমি বেশ ব্যস্ত থাকি, আমি বলি।

তার মানে আমার শরীরে আপনার চলবে না, উত্তেজিত হন ফয়জুন্নেসা ফয়েজ, আপনার তরতাজা শরীর দরকার, পুরুষদের আমি ভালোভাবেই চিনি। তিলোত্তমা যদি আসতে বলতো তাহলে আপনার কোনো ব্যস্ততা থাকতো না।

আমি বেরোনোর জন্যে উঠে দাঁড়াই, ফয়জুন্নেসা ফয়েজ উঠবেন না মনে হচ্ছে, আমার তা দরকার নেই। ইসমত অপেক্ষা করে আছে, আমার খারাপ লাগছে ইসমত অপেক্ষা করে আছে, অর্থাৎ আশা করছে আমি তার শান্ত সুবোধ মদনকে ধরে নিয়ে যাবো, মদন তার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলবে ভুল হয়ে গেছে, সে আর তিলোত্তমার কাছে যাবে না, তার কাছেই থাকবে, তার কাছেই সে সুখ পায়, অন্য কোথাও পায় না, সে। তিলোত্তমাকে ভালোবাসে না, ইসমতকেই ভালোবাসে। রাতে আবার এক সঙ্গে ঘুমোবে, ইসমত আশা করে আছে, এটাই আমার খারাপ লাগছে। ইসমতের আজকাল ঘুম হচ্ছে না, সে খুব হতাশ হয়ে পড়েছে, নিজেকে বুড়িই মনে করছে; সে যতোবার কথা বলছে মদনকে দোষ দিচ্ছে না, দোষ দিচ্ছে তিলোত্তমাকে, তিলোত্তমা একটি খানকি, সে-ই নিয়ে গেছে তার মদনকুমারকে, মদনকুমারের মতো দুধের শিশুকে, মদনকুমারের কোনো দোষ নেই, সব দোষ তিলোত্তমার। হেরে যাওয়ার কাঁটাটা ধারালোভাবে ঢুকে গেছে ইসমতের ভেতরে, আরেকটি পুরুষ না পাওয়া পর্যন্ত কাঁটাটা গেঁথে থাকবে, ভেতরে পচবে, আরো জ্বালা দেবে, খসবে না। শরীরটিও কষ্ট পাচ্ছে ইসমতের, এমন অবস্থায় শরীর আরো খাই খাই করে, সবখানে ব্যথা করতে থাকে, মনে হতে থাকে কেউ ভেঙে চুরমার করে দিলে শাবল দিয়ে খুঁড়ে তছনছ করে দিলে শান্তি হতো, ইসমতের তেমন হচ্ছে নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি তার কোনো উপকার করতে পারি না।

একটি মানুষের আরেকটি মানুষ দরকার হয়, একটি শরীরের আরেকটি শরীর দরকার হয়, শরীরকে কেউ এড়াতে পারে না; শরীরটি ঠিক থাকলে মনটা ঠিক থাকে, সব ঠিক থাকে। মানুষ বা আমার গোত্রটি অবশ্য শরীরের কথা স্বীকার করতে চায় না, অনেকগুলো মিথ্যে কথা বলে, আর সারাক্ষণ অসুস্থ থাকে। এখন ইসমতকে যদি বলি একটি পুরুষ নিয়ে কয়েক ঘণ্টা চমৎকার সময় কাটিয়ে দে, মদনের কথা আর মনে। পড়বে না, ইসমত

আমাকে খুব খারাপ ভাববে, মদনের থেকেও খারাপ ভাববে, কিন্তু আমি জানি ইসমত সেরে উঠবে, রিকশা নিয়ে তাকে ছোটাছুটি করতে হবে না। একবার আমি ফিরোজাকে সারিয়ে তুলেছিলাম, ফিরোজা রোদের মতো ঝরঝরে হয়ে উঠেছিলো, মনেই হয় নি তার জীবনে একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা মাত্র কয়েক দিন আগে ঘটে গেছে। ফিরোজা জন্মের পর কোনো শোকের অভিজ্ঞতা বোধ করে নি, সুখ ছাড়া আর কিছুই সে জানে না, সে কোনো মৃত্যু দেখে নি, কখনো কাঁদে নি; কয়েক বছর আগে হঠাৎ ফিরোজার পিতা মারা যান। তাঁর মরার কোনো কথাই ছিলো না।

ভদ্রলোকের অত্যন্ত চমৎকার স্বাস্থ্য ছিলো, সব কিছুতে তীব্র আকর্ষণ ছিলো, নারীও তার বাইরে ছিলো না; আমার খুব ভালো লাগতো ভদ্রলোককে, তিনি ক্লাবে থেকে ফিরেই। টেলিফোন করতে গিয়ে পড়ে যান। কাকে তিনি টেলিফোন করতে চেয়েছিলেন কেউ। জানে না, যন্ত্রটি হাতে নিয়েই তিনি নিচে পড়ে যান; আর ওঠেন নি। তিনি ডায়াল শেষ করে যেতে পারেন নি। ফিরোজার ওই প্রথম শোক আর কান্নার অভিজ্ঞতা। প্রথম কয়েক দিন ফিরোজার কান্না ভালো লাগছিলো আমার;–মেয়েকে, অর্চিকে, জড়িয়ে ধরে কাঁদছে ফিরোজা, নিজের জন্মদাতার জন্যে কাঁদছে, বুক ভরে কাঁদছে, অর্চি বুঝতে পারছে না, তবু কেঁদে ফেলছে, দেখে আমার ভালো লাগছিলো। কান্নায় বাড়িঘর পবিত্র হয়ে উঠছিলো; বাতাস শুদ্ধ হয়ে উঠছিলো। ফিরোজা বালিশ চেপে ধরে কাঁদছিলো কখনো, বালিশটাকে রজনীগন্ধার গুচ্ছের মতো লাগছিলো, পবিত্র শোকের সুগন্ধ উঠছিলো চারদিকে; আবার কখনো টেলিভিশন দেখতে দেখতে কাঁদছিলো, পরিশুদ্ধ হয়ে উঠছিলো টেলিভিশনের সমস্ত আবর্জনা। কেঁদে কেঁদে ফিরোজা রূপসী হয়ে উঠছিল, আমার চোখে তাই লাগছিলো, তার মুখের ত্বক মসৃণ হয়ে উঠছিলো, চোখে সৌন্দর্য ঝলমল করছিলো।

ফিরোজার কান্নায়, দিন দশেকের মধ্যে, আমি বিরক্তি বোধ করতে থাকি, বাসাটিকে আমার স্যাৎসেঁতে লাগে; মনে হতে থাকে সব কিছু ভিজে যাচ্ছে, জানালায় পর্দায়। আলনায় বিছানায় বালিশে মেঝেতে শোকেসে পুতুলের মুখে ময়লা লাগছে; কোনো কিছু ছুঁতেই আমার ঘেন্না লাগতে থাকে। রাতে ঘুমোতে গিয়ে দেখি ফিরোজা কাঁদছে, বালিশ থেকে মাথা তুলতে পারছে না, দিন দশেক ধরেই মাথা তুলতে পারছে না সে। প্রথম আমার দ্বিধা লাগছিলো, কোনো শোকার্তকে জড়িয়ে ধরা ঠিক হবে কি না, তার কাপড় পেরিয়ে চামড়া পর্যন্ত পৌঁছোনো ঠিক হবে কি না, ব্যাপারটি বলাকার হয়ে যাবে কি না, আমি একটি অপরাধ করতে যাচ্ছি কি না, এসব দ্বিধা আমাকে বিব্রত করছিলো; কিন্তু। ফিরোজার কান্না সহ্য করা অত্যন্ত অসম্ভব হয়ে উঠছিলো আমার পক্ষে। আরো কান্না সহ্য করতে হলে আমার মাথার ভেতরটা পাথরের মতো নিরেট হয়ে উঠবে, ভারী হয়ে উঠবে, শূন্য হয়ে উঠবে মনে হচ্ছিলো। কিন্তু ফিরোজাকে জড়িয়ে ধরলে আমাকে সে একটা বদমাশ ভাবতে পারে, যে পিতৃবিয়োগাতুর কন্যাকেও রেহাই দেয় না, যার কোনো নৈতিকতা নেই; তবে আমি ফিরোজাকে জড়িয়ে ধরলে সে সাড়া দেয়, তাতে আমি বিব্রত হই, একটি হুক খুলতে পারছিলাম না, কয়েকবার চেষ্টা করার পরও সেটি আটকে থেকে প্রাণপণে দায়িত্ব তার পালন করছিলো, হুক নিয়ে আমি সব সময়ই সমস্যায় পড়ি, আমি খুব অস্বস্তি বোধ করছিলাম ফিরোজাকে পীড়িত করছি ভেবে, কিন্তু ফিরোজা আঙুল দিয়ে সেটি অবলীলায় খুলে দেয়, অন্যান্য খোলার কাজগুলোও সে নিজেই করে, আগে যা সে করতে চাইতো না। ফিরোজার কান্না কমে আসতে থাকে, আমি যতোই অগ্রসর হতে থাকি সে ততোই শোক থেকে উঠে আসতে থাকে, কমতে থাকে স্যাঁৎস্যাঁতে ভাবটি, ফিরোজার দীর্ঘশ্বাসগুলোর আয়তন ও উত্তাপ বদলে যেতে থাকে। আমার ভয় হতে থাকে যে আমি সমাপ্ত হলে ফিরোজা আবার হয়তো কান্নায় ফিরে যাবে, আমার সমাপ্ত হওয়া চলবে না; ফিরোজারও বোধ হয় একই ভয় হতে থাকে।

কেমন আছো? খুব ক্লান্ত আমি জিজ্ঞেস করি।

ভালো, ফিরোজা বলে, ভালো; তাকে অক্লান্ত মনে হয়।

এবার রাখবো? আমি ভয়ে ভয়ে অনুমতি চাই।

না, না, ফিরোজা বলে, এতো তাড়াতাড়ি না।

ফিরোজা আর কাঁদছে না, মাঝেমাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, তবে সেগুলোর রূপ বদলে যাচ্ছে, রঙ বদলে যাচ্ছে। আমি কোনো অনৈতিক কাজ করছি না, কোনো শোকাতুরের দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছি না, আমি বরং তাকে শোক থেকে তুলে আনছি। ফিরোজাও বড়ো বেশি চাইছে শোক থেকে উঠে আসতে, তার প্রতিটি প্রত্যঙ্গ কান্না ভুলে যেতে চাচ্ছে, আমি তাকে পিতৃশোক থেকে উদ্ধার করছি, কোনো অনৈতিক কাজ করছি না। ফিরোজা ঘুমিয়ে পড়ে এক সময়, ভোরে তাকে ঝরঝরে দেখায়, সে উঠে এসেছে, সে যে গভীর শোকের মধ্যে ছিলো এতো দিন তার কোনো ছাপ তার মুখে আমি দেখতে পাই না।

ফিরোজা আর আমার ব্রিজটি টিকে আছে, হয়তো টিকে থাকবে, একটা সময় এসেছিলো যে ব্রিজটি ভেঙেই পড়ে যাচ্ছিলো, যদিও ভেঙে ফেলার মতো সাহস হয়তো আমার হতো না; আমি সকলের চোখে ভালো থাকতে চাই, ছেলেবেলা থেকেই, ভাঙাভাঙি এখানে কেউ পছন্দ করে না, সবাই ধসে পড়ার পরও ভাব করতে পছন্দ করে যে তাদের ব্রিজের গায় একটিও আঁচড় লাগে নি, ধ্বংসস্তূপের ওপরে ধ্বংসস্তূপের ভেতরে থাকতে পছন্দ করে

সবাই, আমিও করি। তখন অর্চি এসে ব্রিজটাকে রক্ষা করে। অর্চি। যে এসে গেলো এটা খুবই আকস্মিক ঘটনা, কখন ঘটে যায় আমি টেরও পাই নি, ফিরোজা আর আমার মধ্যে যা ঘটতো তখন তা হতো খুবই আকস্মিক আর ক্ষণকালীন, দুজনের কেউই বুঝে উঠতে পারতাম না আমরা কিছু একটা করেছি। অবশ্য একেই, আকস্মিকতা আর ক্ষণকালীনতাকেই, আমি স্বাভাবিক ভাবতাম, এবং আমার ঘেন্নাও ধরে যাচ্ছিলো এর ওপর, তা ওঠা আর নামা ছাড়া আর কিছু ছিলো না। উত্তেজিত থাকতাম আমি সব সময়, চারপাশে আমি নারীর শরীর দেখতে পেতাম, ব্রিজগুলোর দিকে তাকালে নদীকে গভীর খাপ মনে হতো, ব্রিজকে মনে হতো বিশাল তরবারি। বারবার মনে হতো খাপ আর তরবারির মিল হচ্ছে না, দুটি উল্টোপাল্টা পড়ে আছে। ব্রিজে ওঠার সময় ট্রাকগুলো যে-শব্দ করে, তাকে আমার গভীর ক্লান্তির শব্দ মনে হতো। ফিরোজা আর আমি তখনো একই বিছানায় ঘুমোতাম, কিন্তু পরস্পরকে ছুঁতে ইচ্ছে হতো না; ফিরোজা একবার খুব হতাশ হয়ে অন্য দিকে ফিরে শুয়ে বলেছিলো, না, তুমি ঠিক মতো পারো না, আমার তা মনে হতো বারবার; কে পারে, কে পারে, এমন সব প্রশ্ন জাগতো। ওই অবস্থায়ই অর্চি এসে ব্রিজটাকে টেনে ধরে রাখে।

না পারা এক ধারাবাহিক জ্বরের মতো কাজ করে, আমি ওই জ্বরে বছরের পর বছর ভুগেছি, আমার সে-সময়ের সমস্ত কাজে তার ছাপ লেগে আছে। সমস্ত কিছুর ওপর আমার লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে হতো তখন; চোখের সামনে যা কিছু পড়তো আমি চোখ দিয়ে, মনে মনে জিভ দিয়ে, চুষতাম। মাওয়া সড়কে কয়েকটি ব্রিজ আমি দেখাশোনা। করছিলাম, সেখানে পাথর ভাঙতো যে-মেয়েরা তাদের দু-তিনটিকে আমি দূর থেকে, জিপের জানালা দিয়ে, আমার চোখ দিয়ে চুষতাম। ওরা আমাকে পছন্দই করতো, আমি গেলেই সামনে এসে দাঁড়াতো, জিপের সামনে এসে দাঁড়াতো কখনো, আমি মনে মনে শোষণ করতাম,

তারা কেউ তা জানতো না। আমার প্রতিটি লোমকূপ তখন শোষণের কৌশল শিখেছিলো। তারা কেউ যদি আমাকে ডাকতো, আমি সাড়া দিতে পারতাম না; প্রকৃতিকে ধন্যবাদ, তারা কেউ আমাকে ডাকে নি। কিন্তু মনে মনে আমি তাদের। বারবার, দিনে দুপুরে সন্ধ্যায় মধ্যরাতে ঘুমের ভেতরে ঘুমের বাইরে, উপভোগ করেছি। একটি মিশমিশে কালো মেয়েকে আমার কালো আগুনের মতো মনে হতো, তার শরীর থেকে কালো শিখা উঠছে আমি দেখতে পেতাম, ফিরোজার পাশে শুয়ে আমি ওই মেয়েটিকে রাতের পর রাত জড়িয়ে ধরেছি, তার পায়ের পাতা থেকে শুরু করে তার প্রতিটি স্প্যান প্রতিটি ভিত্তিকূপ লেহন করেছি। তার দুটি পুরু ঠোঁট ছিলো, ফিরোজার তিনটি ঠোঁট জোড়া দিলেও অতোখানি হবে না; কথা বলার সময় হলদে রঙের একটি প্রচণ্ড জিভ বেরিয়ে আসতো তার মুখের ভেতর থেকে, মনে হতো একটা গোখরো বেরিয়ে আসছে তার গহ্বর থেকে। তাকে দেখলেই আমার মনে হতো একটি কয়লার পাহাড়ে আগুন লেগেছে, তার তাপ আমার মাংসে এসে লাগতো। আরেকটি মেয়ে ছিলো লাউয়ের ডগার মতো, ছেলেবেলায় আমি জাংলায় লাউয়ের ডগা দুলতে দেখেছি, ওই মেয়েটিকে দেখলে আমি জাংলাভরা লাউডগা দেখতে পেতাম; চারপাশ সবুজ মনে। হতো। আমি তাদের কথা ভুলে গেলেও হঠাৎ তারা আমার রক্তে এসে প্রবেশ করতো। একবার ডেন্টিস্টের চেয়ারে শুয়ে আমি কাতরাচ্ছিলাম, আর সহ্য করতে পারছিলাম না, তখন ওই মেয়ে দুটিকে আমি দেখতে পাই; তারা পাথর ভাঙছে, দেখতে পাই কালো আগুন জ্বলছে, লাউডগা লকলক করছে; আমার যন্ত্রণা কমে আসে, আমার কেমন যেনো লাগতে থাকে, রক্ত ঘোলা হয়ে উঠতে থাকে, ডেন্টিস্ট যখন দাঁত তুলছিলো আমি এক প্রচণ্ড পুলকে চেয়ার উল্টেপাল্টে দেয়ার উপক্রম করি। ডেন্টিস্ট বিব্রত হয়ে বলেন, আমি খুব দুঃখিত, আমি খুব দুঃখিত; কিন্তু আমি তখন চোখ আর মেলতে পারি নি।

ফিরোজা ঘরে বসে পচতে পছন্দ করে; একটা কলেজে সে পড়াতো বিয়ের আগে, বিয়ের পরেই ছেড়ে দেয়, কারণ ভবিষ্যতে তো ছেড়ে দিতেই হবে, সংসার দেখতে দেখতেই তার সময় কেটে যাবে; চাকুরি তার ভালো লাগে না। চাকুরি তার জন্যে জরুরি নয়, সেখান থেকে যা পাবে তাতে তার তেলের খরচও উঠবে না। বিয়ের পর কিছু দিন ধরে আমি অবশ্য একটা জোকের মতো লেগেছিলাম তার শরীরে; অসভ্য। কাজের পর অসভ্য কাজ করে সাধ মিটছিলো না আমার, ফিরোজারও অনেকটা। ফিরোজার শরীরটিকে আমার কাছে একটি বিস্ময়ের মতোই লেগেছিলো, তবে প্রতিবার অসভ্য কাজ করে আমি যেনো প্রতিশোধ নিচ্ছিলাম কারো ওপর, হয়তো রওশনের। ওপর, মনে মনে বলছিলাম, দেখো, আমি এখন অসভ্য কাজ করছি, আমি ফিরোজার শরীর দেখছি, ঘূচ্ছি, তার ভেতরে যাচ্ছি, তার ওপর ঘুমিয়ে পড়ছি, রওশন তুমি এখন কোথায়! কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই ফিরোজা ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

এসব আমার আর ভালো লাগে না, ফিরোজা বালিশ জড়িয়ে ধরে বলে, ঘুমোতে ভালো লাগে আমার এর চেয়ে, আমাকে ঘুমোতে দাও।

আমি হাত সরিয়ে নিই, দু-চার দিনের মধ্যে আর হাত বাড়াই না; বাড়াতে গেলেই আমার দ্বিধা লাগে, সাত-আট দিনের মধ্যে আর হাত বাড়াই না; বাড়াতে গেলেই দ্বিধা লাগে, দশ-পনেরো দিনের মধ্যে আর হাত বাড়াই না। ফিরোজা সুখে ঘুমোতে থাকে। ফিরোজা কেনো এতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, তার কেনো ভালো লাগছে না? আমি কি পারছি না? আমি কি শুধুই বিরক্ত করি?

এই শোনো, আমি ডাকি, একটি রারার নামাবো?

ইচ্ছে হলে নামাও, ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে বলে ফিরোজা, বেশি বিরক্ত কোরো না।

বাক্স থেকে একটি রাবার নিয়ে এসে দেখি সম্পূর্ণ ঘুমিয়ে পড়েছে সে, আমিও শীতল হয়ে পড়েছি, সাপের রক্তের মতো ঠাণ্ডা আমার রক্ত; এখন আমাকে দশ হাজার ফিরোজা ডাকলেও আমি সাড়া দিতে পারবো না। বাথরুমে গিয়ে ফ্লাশ করে আমি রাবারটির ভার থেকে মুক্ত হই।

কলেজের কাজটি ফিরোজা ছেড়ে দিয়েছিলো আগেই। এখন তার আছে কর্মহীন সুখ, ঘুম, বেড়ানো, শাড়ির দোকান, বাপের বাড়ি, এই যাওয়া এই ফিরে আসা, আর। আমাদের ক্ষণিক আকস্মিক ক্লান্তিকর পরস্পরপীড়ন।

অধ্যাপনাটা তুমি না ছাড়ালেও পারতে, আমি কখনো বলি।

ওসব আমার ভালো লাগে না, ফিরোজা বলে, পড়ানোটড়ানো ভালো লাগে না।

শুনেছি মেয়েদের কলেজে না পড়ালেও চলে, মাঝেমাঝে গেলেই হয়, আমি বলি, তুমিও মাঝেমাঝে যেতে পারতে, অন্তত নতুন শাড়িগুলো দেখাতে পারতে মেয়েগুলোকে, ওরা ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত হতে পারতো।

তোমার বউ অধ্যাপিকা তুমি বলতে পারতে সকলকে, ফিরোজা বলে, বেশ লাগতো, কিন্তু আমার একদম ভালো লাগে না।

তুমি ঠিক ধরেছো, আমি বলি, আমাদের এক আইএ ফেইল ঠিকাদারের একটি ডক্টরেট বউ আছে, ইকোনোমিক্সে পিএইচডি, ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়; ঠিকাদার হতে ইচ্ছে করে।

তুমিও একটি ডক্টরেট বিয়ে করলে পারতে, ফিরোজা বলে, ইঞ্জিনিয়ার আর পণ্ডিতে বেশ মিল হতো।

তখন একথা মনে পড়ে নি, আমি বলি।

তুমি বউটিকে দেখেছো? ফিরোজা জানতে চায়।

না, আমি বলি, তবে বউটির কথা আমি মাঝেমাঝে ভাবি।

অন্যের বউয়ের কথা ভাবাই তো তোমাদের কাজ, ফিরোজা বলে, কী ভাবো তুমি তার সম্বন্ধে?

ডক্টরেট বউটি আইএ ফেইল ঠিকাদারটির নিচে কীভাবে শোয়? আমি বলি।

শোওয়া ছাড়া আর তোমার কথা নেই, ফিরোজা বলে।

আমি আর কথা বলি না। ফিরোজা বেশ মোটা হচ্ছে, সে যে সুখে আছে তার পরিচয় তার মাংস ঠেলে বেরোতে চাচ্ছে, আমার সন্দেহ হচ্ছে তার মগজেও মাংস জন্মাচ্ছে। আমি

তাকে একটু ভয়ই পাচ্ছি মনে হচ্ছে, তাকে আমি এমন কিছু বলি না। যাতে মনে হয় আমি ভালো নেই, সব ঠিক আছে এটা আমি দেখাতে চাই। আমি ব্রিজ তৈরি করি, আমার ব্রিজ ভেঙে পড়ছে এটা কেউ জেনে ফেলুক আমি তা চাই না। ফিরোজার আমাকে বেশ বিব্রত করে মাঝেমাঝে।

তোমার অফিসে আজ দশ বারো বার ফোন করেছি, ফিরোজা দুপুরে খাওয়ার সময় বলে, একবারও পেলাম না।

অফিসে ফোন লেগেই আছে, আমি বলি, কারো না কারো সাথে কথা বলছিলাম হয়তো, তাই অ্যানগেইজড ছিলো।

কাজের ফোনে তো বেশি সময় লাগার কথা নয়, ফিরোজা বলে, অকাজের আলাপেই বেশি সময় লাগে।

তুমি কি মনে করো আমি অকাজের আলাপ করি ফোনে? আমি বলি।

আমার তো তাই মনে হয়, ফিরোজা বলে।

আমিও তো মাঝেমাঝে বাসায় লাইন পাই না, আমি বলি, তুমিও কি অকাজের আলাপ করো?

ফিরোজা চুপ করে যায়, আমার আর খেতে ইচ্ছে করে না; দুপুরে একটু বিশ্রাম নেয়ার ইচ্ছে ছিলো, এখন আর ইচ্ছে করে না; খাওয়ার পরই অফিসে ফিরে যাই। আমি হেসে উড়িয়ে দিতে পারি না ফিরোজার কথাগুলো, আমি আজ মিসেস রহমানের সাথে একটু বেশিক্ষণ ধরেই কথা বলছিলাম, বলতে ভালো লাগছিলো, অনেক দিন আমি মন। খুলে কথা বলি নি। ফিরোজার সাথে মন খুলে কথাই হলো না কখনো, রওশনের সাথে সেই কবে বলেছিলাম। মাহমুদা রহমান দু-তিন সপ্তাহ ধরে ফোন করছেন, একটু একটু করে আমাদের আলাপ বাড়ছে, তার কথা শুনতে ভালো লাগছে আমার। তিনি কি হাফিজুর রহমানের সাথে এমন মধুর মিষ্টি করে কথা বলতেন, যেমন আমার সাথে বলেন? আমরা কি সবাই বন্ধনের বাইরে গেলে মধুর হয়ে উঠি, তেতো হয়ে উঠি। বন্ধনের মধ্যে? মাহমুদা রহমান, আমার মনে হয়, গত দেড় দশক এমন মধুরভাবে কথা বলেন নি, যেমন আমিও বলি নি। হাফিজুর রহমান আমার সহকর্মী ছিলেন, মাসছয়েক আগে সৌদি আরব চলে গেছেন, তাঁর বিদায়ের পার্টিতে আমরা গিয়েছিলাম, ফিরোজাও ছিলো। এ-মাসেই মাহমুদা রহমান আমাকে ফোন করেন, খুব একটা দরকারে, হাফিজুর রহমান আল মদিনা থেকে আমারই সাহায্য নিতে বলেছেন, আমি তাকে সাহায্যও করেছি, সাহায্য করতে অনেক দিন পর আমার ভালো লেগেছে। মাহমুদা রহমান প্রতিদিনই একবার ফোন করেন। খুব অদ্ভুত লাগছে আমার যে তার ফোন। পেতে আমার ইচ্ছে করে, আমার ব্যক্তিগত নম্বরটিও আমি তাকে দিয়েছি, তিনি দশটা বাজলেই বেজে ওঠেন। ওই সময় আমি আমার ঘরে কাউকে দেখতে পছন্দ করি না। তিনি খুব নিঃসঙ্গ বোধ করেন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত, এ-সময়টাতে তাঁর কন্যা দুটি ইস্কুলে থাকে, ইস্কুলে দিয়ে এসেই তার নিঃসঙ্গ লাগতে থাকে, আমাকে ফোন করে তাঁর মনে হয় তিনি নিঃসঙ্গ নন। আমারও তাই মনে হয়, মনে হয় আমিও নিঃসঙ্গ নই। অনেক বছর পর আমার ভালো লাগছে তুচ্ছ কথা, সামান্য কথা, নিরর্থক কথা।

হ্যালো, আমি রিসিভার তুলি।

হ্যালো, আমি, ওপার থেকে কণ্ঠ ভেসে আসে, তিনি একক হয়ে উঠছেন।

অপেক্ষা করছিলাম, আমি বলি।

কার? মাহমুদা রহমান বলেন।

আপনিই বলুন, আমি বলি।

বলতে সাহস হয় না, তিনি বলেন, হাসেন, হাসির শব্দ শোনা যায়। আমি হাসি শুনতে থাকি, তিনি বলেন, আজ আসবেন?

ইচ্ছে হচ্ছে, আমি বলি।

তবে সময় হবে না, তিনি বলেন, তাহলে একটু বেশি করে কথা বলুন।

কেনো? আমি বলি।

আপনার কণ্ঠস্বর শুনতে ভালো লাগে, তিনি বলেন, আপনি কি গান গাইতেন, বা কবিতা লিখতেন? তিনি বলেন।

গান গাই নি কখনো, তবে একবার কবিতা লিখেছিলাম, আমি বলি।

কী নিয়ে লিখেছিলেন? তিনি বলেন।

আর্কিটেকচারের ওয়াজেদা মনসুরকে নিয়ে লিখেছিলাম, আমি বলি।

এখন কাউকে নিয়ে লিখুন না, তিনি বলেন।

আমি আসতে চাই, আমি বলি।

এখনই, তিনি বলেন।

একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে আমাদের, আমি একটা মুক্তির স্বাদ পাই, আমার চামড়ার তলে যে-জ্বরটি আমাকে পোড়াচ্ছিলো, সেটি ছেড়ে যায়; মাহমুদা রহমানকেও মুক্তির। স্বাদে বিভোর চঞ্চল মনে হয়। তার শরীরটি এতো দিন যেনো একটা ময়লা ডোবায় ডোবানো ছিলো, সেখান থেকে উঠিয়ে সেটিকে ঝকঝকে করে মাজা হয়েছে, তার ভেতর থেকে একটা দ্যুতি বেরোচ্ছে। প্রথম যেদিন সাড়ে দশটায় আমি তার উদ্দেশে। বেরোই আমার মনে হচ্ছিলো সবাই আমাকে দেখছে, ড্রাইভার ভেবেছিলো আমি মাওয়া সড়কে যাবো; সে একটু অবাক হয়, কিন্তু বিচলিত হয় না যখন আমি তাকে। লালমাটিয়ায় যেতে বলি। হাফিজুর রহমানের বাসা তারা অচেনা নয়, অফিসের গাড়ি নিয়ে সে বহুবার ওই বাসায় গেছে। আমরা একটি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ি। আমি কি। মাহমুদা রহমানকে ভালোবাসি,

মাহমুদা রহমান কি আমাকে ভালোবাসেন? প্রশ্নটিকে অবান্তর মনে হয় আমার, আমাদের সম্পর্কটাকে ওই আবেগের থেকে অনেক বেশি মনে হয় আমার; আমরা একে অন্যকে মুক্তি দিয়েছি, এটা অনেক বড়ো প্রেমের আবেগ আর বিবাহের স্কুল প্রথা থেকে। আমরা কি কয়েক ঘন্টা টেলিফোনে বা মুখোমুখি বসে কথা বলে মুক্তি পেতে পারতাম, যদি না মুক্ত হতো আমাদের শরীর? মনের মুক্তির জন্যে। শরীরের মুক্তি দরকার। মাহমুদা রহমানের শরীরটিকে যেদিন আমি প্রথম সম্পূর্ণ দেখি এক অলৌকিক অনুভূতি হয় আমার, চোখের সামনে থেকে একটি পর্দা সরে যায়, আমি দেখি সুন্দরকে। এ-শরীরের সাথে জড়িত হওয়ার জন্যে আমার কি ভালোবাসা। দরকার এ-শরীরের অধিকারীকে? এমন প্রশ্ন আমার মনে জাগে; এবং মনে হতে থাকে এ-শরীর, নারীর শরীর স্বভাবতই সুন্দর, এর সাথে জড়িত হওয়ার জন্যে জন্মজন্মান্তরের। ভালোবাসা দরকার নেই, দরকার নেই কোনো পূর্ব-আবেগ, দেখামাত্রই একে ভালোবাসা যায়, জড়িত হওয়া যায় এর সাথে। আমি জড়িত হয়ে পড়ি, আমরা জড়িত হয়ে পড়ি। মাহমুদা রহমানের সাথে যদি আমার বিয়ে হতো, বা যদি তাকে এখন আমি বিয়ে করি, তাহলে আমরা পরস্পরের কাছে যা পাচ্ছি, পরস্পরকে যা দিচ্ছি, তা কি পেতাম, তা কি দিতাম, তা কি পাবো, তা কি দিতে পারবো? আমরা দুজনের কেউই বিয়ের কথা ভাবি না, দুজনেই আমরা তা পরখ করে দেখেছি।

আমি আপনার উপপত্নী, তিনি হেসে বলেন।

আমি চমকে উঠে বলি, কেনো?

নিজেকে উপপত্নী ভাবতে ভালো লাগছে, তিনি বলেন, পত্নীর থেকে ভালো।

কারো উপপতি হতে আমার ভালো লাগবে না, আমি বলি, আমি পতি আর পত্নীর সম্পর্কের বাইরে থাকতে চাই।

তাহলে আমাদের সম্পর্কটি কী? তিনি বলেন, প্রত্যেক সম্পর্কেরই একটি নাম থাকা দরকার।

আমি নামহীন সম্পর্ক চাই, আমি বলি।

আমি নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম, ফিরোজা বলেছে আমি ঠিক মতো পারি না, এখানেও পারবো না, মাহমুদা রহমানও বিরক্ত হয়ে উঠবেন, আমাকে আর। টেলিফোন করবেন না, অন্য কাউকে করবেন, এমন একটি ভীতি আমার ছিলো। আমাকে পারতে হবে, এ-ব্রিজটির ভিত্তিকূপ শক্তভাবে স্থাপন করতে হবে আমাকে, যাতে কোনো বন্যায় ভেসে না যায়। আমি বিস্ময়করভাবে দক্ষ হয়ে উঠি, নদীর ওপর ব্রিজ বাঁধতে যেমন তেমনি শরীরের সাথে ব্রিজ বাঁধতে; আমার মনে হতে থাকে আবেগ হচ্ছে বন্যার মতো, তার কাজ কাঠামোর ওপর আকস্মিক অভাবিত চাপ প্রয়োগ করা, যার জন্যে কাঠামোটি প্রস্তুত নয়, তার কাজ কাঠামোকে বিপর্যস্ত করা; সম্পর্কের কাঠামোর বেলাও তা সত্য, তাই আবেগের সমস্ত চাপকে পরিহার করতে হবে। আমাকে হতে হবে দক্ষ প্রকৌশলী, কুশলী স্থপতি; নিরুত্তাপ, ঠাণ্ডা, লক্ষ্যের দিকে স্থির। আমি তা-ই হয়ে উঠি। আগে আমার ধারণা ছিলো শরীরের সাথে শরীরের সম্পর্ক একটি প্রত্যঙ্গের সাথে আরেকটি প্রত্যঙ্গের সম্পর্ক, এখন আমি আবিষ্কার করি ওই সম্পর্ক একটির নয়, সর্বাঙ্গের, যা ফিরোজার সাথে আমার হয় নি, হবে না কখনো। ফিরোজার সাথে আমার যে-সম্পর্ক, আমরা যে বিবাহিত, এটাকেও আমার একটি বাধা মনে হয়; বিবাহ সব কিছু খুলে ফেলতে দেয় না, একটা সীমার মধ্যে

আটকে রাখে। আমাকে। মাহমুদা রহমানের সাথে সে-সীমাটুকু নেই, আমরা সীমাহীনভাবে অসভ্য। হয়ে উঠতে পারি, যা আমি পারি না ফিরোজার সাথে, তার সাথে আমার সভ্য থাকতে হয়। অর্চির সাথে দেখা হচ্ছে না আজকাল। অর্চি, আমার মেয়ে, বিস্ময়করভাবে বেড়ে উঠেছে যে কয়েক বছরে, যাকে দেখলে আমি প্রথম চিনতে পারি না, চিনতে পেরে বিস্মিত হই, তার সাথে এখন আমার দেখাই হচ্ছে না। ওকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে। বাসায় ফিরলে দেখি সে রজ্জব স্যারের বাসায় গেছে, নইলে আক্কাস আলি স্যারের বাসায় গেছে, নইলে পন্টু স্যারের বাসায় গেছে, নইলে গোপাল স্যারের বাসায় গেছে, স্যারদের দোকান থেকে মালের পর মাল কিনছে, ওই মাল না কিনলে চলবে না; অংক কেনার জন্যে দৌড়োচ্ছে হাতির পুলে, ইংরেজির জন্যে মগবাজারে, বাঙলার জন্যে আজিমপুরে, ইসলামিয়াতের জন্যে মক্কা না মদিনায়; অর্চি শুধু দৌড়োচ্ছ আর দৌড়োচ্ছে। ফিরোজা হুইশল দিচ্ছে, অর্চি দৌড়োচ্ছে; ফিরোজাও খুব খাটছে। আমার মেয়ে, অর্চি, দৌড়ুক; অনেক দৌড়োতে হবে ওকে, অনেক ইঁদুর দৌড়ে ওকে অংশ নিতে হবে। আমি যে দেখতে পাচ্ছি না ওকে, ভালোই; ওকে জিততে হবে, আমার চোখের। বাইরে থেকে হলেও ও জিতুক। ওর ঘরে সাধারণত আমি যাই না, ও পছন্দ করে না। ওর ঘরে কেউ যাক। ওর ঘরে গেলে দেখি সব কিছু ছড়িয়ে আছে, বিছানায় টেবিলে মেঝেতে ছড়িয়ে আছে নোংরা কাগজে ছাপা বই নিউজপ্রিন্টের খাতা ইংরেজি হিন্দি গানের ক্যাসেট, আর ও-ও সব সময়ই এলোমলো হয়ে আছে।

সব কিছু এমন ছড়ানো কেনো? আমি ভয়ে ভয়ে জানতে চাই।

ছড়ানো না থাকলে আমি কিছু খুঁজে পাই না, অর্চি বলে, সাজানোগোছানো ঘর আমি সহ্য করতে পারি না, যাচ্ছেতাই নোংরা লাগে।

আমরা তো সব গুছিয়ে রাখতাম, আমি বলি।

তোমরা খুব গেঁয়ো ছিলে, অর্চি বলে, যাও তো আব্বা, কথা বলার আমার একদম সময় নেই।

তোমার কি কিছু লাগবে? আমি আরেকটুকু কথা বলতে চাই।

আহা, আমার কিছু লাগবে না, অর্চি বলে, লাগবে কি না আমার ভাবতে হবে, এখন আমার ভাবার সময় নেই।

আমি আর কথা বলার সাহস করি না, ঘর থেকে বেরিয়ে আসি, যদিও ওর সাথে। আমার আরো কথা বলার ইচ্ছে করে। অর্চি কী পছন্দ করে, কীভাবে বেড়ে উঠছে, ও কী স্বপ্ন দেখে, কোনো স্বপ্ন দেখে কি না আমি জানি না। ওকে দেখলে মনে হয় ও কেন্দ্রে আছে, ওর বয়সে আমি কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে ছিলাম, কেন্দ্র কোথায় আমি জানতাম না, কেন্দ্রে যেতে হবে তাও কখনো মনে হয় নি, এখনো মনে হয় কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে আছি। অর্চির সাথে কথা বললে প্রতি মুহূর্তেই আমি বোধ করি ও আছে কেন্দ্রে, আমি আছি প্রত্যন্তাঞ্চলে। এই সেদিনও এতোটুকু ছিলো, আমার সাথে একটা সম্পর্ক। ছিলো, এখন দশম শ্রেণীতে অর্চি, কিন্তু আমাদের সম্পর্ক নেই, বা আছে যা আমি বুঝতে পারি না, কোনো দিন পারবো না। অর্চি যখন ছোট্ট ছিলো, আমি ওর সাথে খেলতাম; ও একটা ব্রিজকে জোড়া লাগিয়ে রেখেছে। ওর তখন নিঃসঙ্গ লাগতো। নিজেকে, এখন লাগে না; এখন অন্যের সঙ্গই অসহ্য মনে হয় ওর।

ছোট্ট বয়সে একবার অর্চি আমাকে নির্বাক করে দিয়েছিলো; সেদিন থেকে আমি, ওর সামনে পাহাড়ের মতো দাঁড়াতে পারি না, আজকাল একেবারেই পারি না। অর্চি আমাকে বলে, আব্বু, এসো আমরা ভাইবোন খেলি; আমি বিস্মিত হয়ে তাকাই, অসহায়ভাবে বলি, এসো, খেলি, কীভাবে খেলতে হবে বলো; অর্চি আমাকে চমৎকার চমৎকার আদেশ দিতে থাকে। সেদিন থেকে আমি আর ওর পিতা নই, ওর থেকে ছোটো কেউ, যাকে অর্চি আদেশ দিতে পারে। তবে অর্চি আমাকে ভাই বলে স্নেহ করেছে অনেক দিন, তারপর ভুলে গেছে; এখন অবশ্য আমার মনে হয় অর্চি আমাকে অমন কিছু বলুক, কিন্তু কিছুই বলে না। ওর দুঃখের কথা, ছোটোবেলায়, বলতো। আমাকে, এখন বলে না; ওর কি দুঃখ নেই, দুঃখের কোনো কথা নেই? ফোরে পড়ার সময় ওর খুব ইচ্ছে হতো ক্লাশের ক্যাপ্টেন হতে, বারবার চেষ্টা করেও হতে পারে নি; ক্যাপ্টেন হওয়ার জন্যে মাসে মাসে ওর ক্লাশে পরীক্ষা হতো, মন দিয়ে অর্চি পড়তো, পরীক্ষা দিয়ে এসে একটু কষ্টের সাথে বলতো, হতে পারলাম না, আব্বু। ওর কষ্ট দেখে আমার কষ্ট হতো, ভালোও লাগতো এজন্যে যে কষ্টে অর্চি ভেঙে পড়ে নি। ওদের ক্লাশের প্রথম মেয়েটি বারবার ক্যাপ্টেন হতো, তার সাথে পেরে উঠতে না অর্চি, সে-মেয়েটি নিশ্চয়ই খুব মেধাবী ছিলো। একবার অর্চি প্রায় ক্যাপ্টেন হয়েই গিয়েছিলো, কিন্তু ওই মেধাবী মেয়েটি তা মেনে নিতে পারে নি, তাকে ক্যাপ্টেন হতেই হবে। অর্চি খাবার টেবিলে প্রায় কেঁদেই ফেলে, খুব কষ্টে চোখের পানি চেপে রাখে, আমি ওর জন্যে খুব হাল্কা একটু কষ্ট পাই। সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে অর্চি ক্যাপ্টেন হয়ে গিয়েছিলো, আপা ঘোষণাও করে দিয়েছিলো; কয়েক মিনিট ক্যাপ্টেন থেকে খুব সুখ লাগছিলো। অচির। অমন সময় নাশিন, সে-মেধাবী মেয়েটি, অর্চির খাতা জোর করে ছিনিয়ে নেয়, নিয়ে পড়তে থাকে; পড়ে এক সময় লাফিয়ে চিৎকার করে ওঠে, আপা, অর্চি বাঁকা বি লিখতে ভুল করেছে; দৌড়ে মেয়েটি খাতা নিয়ে যায় আপার কাছে। আপা এবার চশমা

মুছে চোখে লাগিয়ে দেখতে পায় সত্যিই অর্চি বাঁকা বি লিখতে ভুল করেছে, তাই আপা অর্চির ক্যাপ্টেনের পদ বাতিল করে দিয়ে নাশিনকে ক্যাপ্টেন ঘোষণা করে। অর্চি কেঁদে ফেলে, আমি শুনে ভয় পাই।

নাশিন কি তোমার বন্ধু? আমি জিজ্ঞেস করি।

হু, অর্চি বলে।

শুনে আমি আরো ভয় পাই, এমন ভয়ঙ্কর বন্ধুদের মধ্যে আছে অর্চি!

নাশিনকে তুমি আর বন্ধু মনে কোরো না, আমি বলি।

আমার যে আর বন্ধু নেই, অসহায়ভাবে অর্চি বলে।

সে তোমাকে কোনো দিন ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিতে পারে, আমি বলি।

তাহলে আমি আর বন্ধু পাবো কোথায়? অর্চি কেঁদে ফেলে।

অর্চি কি আজো ওই বন্ধুদের সাথেই আছে? না কি তার কোনো বন্ধু নেই? সম্পূর্ণ। একাই আছে? ওর ঘরে সব সময় উচ্চ আওয়াজ হয়, মহাজাগতিক গোলমাল চলে, ক্যাসেট বেজেই চলে, ইংরেজি হিন্দি, চিৎকার ওঠে, ওগুলো অর্চি সহ্য করে কেমনে? ও কি আওয়াজের মধ্যেই থাকতেই পছন্দ করে, ওর মতো অন্যরাও? আমি আমার এক প্রিয়

গায়িকার, যখন আমি গান শুনতাম, যখন আমি ছাত্র ছিলাম, একটি ক্যাসেট অনেক খুঁজে অর্চির জন্যে নিয়ে এসেছিলাম। অর্চি তার নাম শোনে নি, তার নাম শুনেই বমি করে ফেলতে চায়, শোনার মতোই ওর মনে হয় না, আর বাজনোর সাথে সাথেই। যেনো বমি করে ফেলে; আমার মনে হয় অর্চি আমার মুখের ওপরই বমি করে দিচ্ছে। দূরে কোথাও রেকর্ড বাজতো, কোনো বিয়ে বাড়িতে, ওই সুর কতো সন্ধ্যায় কতো রাতে গাছপালার ভেতর দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমার ভেতরে এসে ঢুকতো, আমার রক্ত কাঁপতে থাকতো; অর্চির রক্ত কাঁপে না, অর্চির রক্ত ঝা ঝা করে।

এ নিয়ে দুবার হলো, দিন সাতেক আগে একবার হয়েছিলো, আজ আবার হলো, ফোনটা আমি ধরলাম; ফোনটা আমার নয়, ফিরোজার; ফিরোজা বাথরুমে বলে আমি ধরলাম, ছেলেটি বেশ গভীর কণ্ঠে বলছে, ভাবী, আমি। ছেলেটি নিশ্চিত যে ফিরোজাই। ফোন ধরবে, আমি এ-সময়ে বাড়ি থাকি না, তাই সে হ্যালো বলেও সময় নষ্ট করে নি, ভাবীর কাছে তার এককতা জানিয়েছে, একটা ঝলমলে সাড়া প্রত্যাশা করেছে। আমি কি এখন বলবো, কাকে চান? বলাটা কি, শোভন হবে, বললে কি সে আমাকে–বলবে কাকে সে চায়? সে কি বলবে না, আমি দুঃখিত, রং নাম্বার। আমি বলি, ফিরোজা বাথরুমে আছে, আপনি একটু ধরুন। শুনেই টক করে ছেলেটি ফোন রেখে দেয়; একটু বোকাই দেখছি ছেলেটি বা একটু বেশি ঘাবড়ে গেছে, আমাকে একটু ভুল। নাম্বারও বলতে পারতো। বাথরুম থেকে কি ফিরোজা ফোনের শব্দ শুনেছে? যদি। ফিরোজা বুদ্ধিমান হয়, আমি আজো জানি না সে বুদ্ধিমান কি না, এবং ফোনের শব্দ শুনে থাকে, তাহলে ফিরোজা একটু দেরি করেই বেরোবে বাথরুম থেকে, যেনো আমি বুঝতে না পারি সে একটি ফোনের জন্যে উৎকণ্ঠিত ছিলো। ছেলেটি নিশ্চয়ই পরে ফোন করবে, আমাকে নিয়ে একটু হাসাহাসিও করবে হয়তো, কীভাবে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে বলতে বলতে দুজনে

হাসবে; কিন্তু ফিরোজা বাথরুম থেকে বেরোলে আমি কী বলবো? বলবো কি তার একটি ফোন এসেছিলো, আমার এক অচেনা অনুজ ফোন করেছিলো? ফোনটা যে নিশ্চিতভাবে ফিরোজারই তা আমি প্রমাণ করবো কীভাবে, আর না বলেই থাকবে কী করে? তার ফোন এসেছিলো, আমি ধরেছিলাম, এটা চেপে যাওয়া কি অসৎ কাজ হবে না, নিজেকে কি আমার একটা খুব ঈর্ষাকাতর স্বামী মনে। হবে না? ফিরোজা বেশ দেরি করেই বেরোয় বাথরুম থেকে। আমি কি ধরে নেবো। ফিরোজা ইচ্ছে করেই দেরি করে বেরিয়েছে বাথরুম থেকে, মুখ বারবার সাবান দিয়ে ধুয়েছে যাতে মুখে উৎকণ্ঠা উদ্বেগের কোনো ছাপ না থাকে?

তোমার একটা ফোন এসেছিলো, আমি বলি।

ফিরোজা বিব্রত হচ্ছে, ফোনের শব্দ সে শুনেছে মনে হয়। আসলেই কি বিব্রত হচ্ছে ফিরোজা? না কি তা আমার বোঝার ভুল? ফিরোজা কোনো আগ্রহ দেখায় না।

এ-ফোনটি আসবে বলে, ধরতে গিয়ে বিব্রত হবে বলেই কি ফিরোজা বাথরুমে। ঢুকেছিলো? আমি ফিরোজার মুখ পড়তে পারি না, তার মুখটি আমার কাছে এক অচেনা লিপিখচিত পৃষ্ঠা মনে হয়।

তোমার একটা ফোন এসেছিলো, আমি আবার বলি।

কে করেছিলো? ফিরোজা খুব আগ্রহহীন হতে চেষ্টা করে।

তোমার কোনো দেবর করেছিলো, আমি বলি।

বাজে কথা বোলো না, ফিরোজা বলে।

বাজে কথা বলছি না আমি, আমি বলি, ভাবীকে চাচ্ছিলো সে।

দেখো সবাইকে নিজের মতো মনে কোরো না, ফিরোজা বলে, তোমরা তো অফিসে গণ্ডা গণ্ডা মেয়েলোকের সাথে ফোন করেই সময় কাটাও।

তুমি রেগে যাচ্ছো, আমি বলি, আর ধরা পড়ে যাচ্ছো।

ধরা পড়ার কী আছে, ফিরোজা বলে, যাদের কাছে স্বামীরা ফোন করে না তাদের কাছে দেবররা তো ফোন করবেই।

আমি আর কোনো কথা বলি না, আমাকে বেরোতে হবে; বেরোনোর আজ ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তু বেরোতেই হবে, আমার রক্ত এলোমেলো কাজ করতে শুরু করছে। বেরিয়ে কোথায় যাবো? অফিসে? অফিসেই যাবো। আমি তো রাত দশ এগারোটা পর্যন্ত অফিসেই থাকি, আজ বাসায় থাকবো ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন আমাকে বেরোতে হবে। আমি অফিসে চলে যাই। ফিরোজাকে হয়তো তার দেবর আবার ফোন করেছে, আমি কি একবার বাসায় ফোন করে দেখবো ফোন অ্যানগেজড কি না? না, অ্যানগ্যাজড থাকলে আমার রক্ত আরো এলোমেলো হয়ে যেতে পারে; হয়তো অর্চি ফোনে কথা বলছে, আজকাল ওর খুব ঘন ঘন ফোন আসছে, তবু আমার মনে হবে ফিরোজা দেবরের সাথে কথা বলছে। নিজের কাছে

নিজেকে ছোটো মনে হবে। না, আমি বাসায় ফোন করবো না; ফিরোজা কথা বলুক তার দেবরের সাথে। ফিরোজা কি দেবরের সাথে বেড়াতে যায়? কখন যায়? কোথায় যায়? কতো দিন ধরে যায়? কী করে? দেবরটি দেখতে কেমন? ফিরোজার সাথে বেশ মানায়? যেখানে ইচ্ছে যাক, যা ইচ্ছে করুক; আমি এখন কী করি? ফিরোজাকে কি এরই মধ্যে তার দেবরটি দেখেছে, সম্পূর্ণ দেখে ফেলেছে? ফিরোজা দেখতে দিয়েছে? মাঝেমাঝেই দেখে, আজো কি দেখার ইচ্ছে। আছে? ফিরোজা কীভাবে সাড়া দেয়? আমি রওশনকে দেখতে পাচ্ছি, একটি হাত। রওশনকে খুলছে, রওশনের চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, রওশন কেঁপে কেঁপে উঠছে, রওশন শব্দ করে নিশ্বাস নিচ্ছে।

৫. ফিরোজার একটি দেবর জন্ম নিয়েছে

ফিরোজার একটি দেবর জন্ম নিয়েছে, ফিরোজা আমার স্ত্রী, ধরে নিচ্ছি তারা মাঝেমাঝে ঘুমায়, আমি কি এখন তাদের দুজনকে খুন করতে বেরোবো, রক্তে বিবাহকে পবিত্র করবো? বিয়েতে আমরা কোনো শপথ করেছিলাম পরস্পরের প্রতি? আমার মনে পড়ছে না; মৃত্যু আমাদের পৃথক না করা পর্যন্ত আমরা একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো, এমন কোনো শপথ আমরা করি নি, অন্তত আমার মনে পড়ছে না, বিয়েতে আমি কী বলেছিলাম তা-ই আমার মনে পড়ছে না। আমি বিশ্বস্ত নই, ফিরোজা বিশ্বস্ত নয়; কে কখন বিশ্বস্ত ছিলো? বিশ্বস্ত থাকতে হয় কেনো? আমি বাসায় ফিরে আসার পর আমার শরীরে কি মাহমুদা রহমানের ছাপ থাকে; ফিরোজা যদি আজ রাতে তার দেবরের সাথে মিলিত হয়, আমি ফিরে গিয়ে ফিরোজার শরীর তন্নতন্ন করে পরখ করি, তাহলে কি দেবরের কোনো ছাপ খুঁজে পাবো? আমি এখন কোথায় যাবো? মাহমুদা রহমানের কাছে যেতে পারি, রাত বারোটা পর্যন্ত থাকতে পারি, তাঁর বাচ্চা দুটি সারাক্ষণ পাশে বসে থাকবে আমার, ওদের জন্যে আইস্ক্রিম কিনতে হবে, যেতে ইচ্ছে। করছে না; পবিত্র সুন্দরী মহীয়সী বিধবাটিকে মনে পড়ছে, অনেক দিন ধরেই মনে। পড়ছে, বিধবা আমার মনে ঝিলিক দিচ্ছেন মাঝেমাঝে, অনেক দিন তার বাসায় যাওয়া হয় নি, তাঁর বাসায় যাবো? এখন কি তিনি বাসায় থাকবেন তার বাসায় কি খুব ভিড় থাকবে? যে-কয়েকবার গেছি খুব বিখ্যাত মানুষদের সাথে দেখা হয়েছে, এক সোফায়। অততগুলো বিখ্যাত আমি কখনো দেখি নি, অতো বিখ্যাতদের পাশে আমাকে মানায় না; আর বিখ্যাতদের মুখ থেকে কেমন বিশ্রী একটা গন্ধ বেরোয়, পাশে বসে কথা–বলতে থাকলেই আমি ওই গন্ধটা পেতে থাকি, সহ্য করা বেশ কষ্টকর হয়ে ওঠে। সৌন্দর্যের পাশে ওই বিখ্যাত লোকগুলোকে আমার চাঁড়ালের মতো ঘিনঘিনে মনে হয়। তাঁরা অবশ্য স্তবগান জানেন, অসংখ্য স্তবগান তাঁদের মুখস্থ,

তাঁরা রূপসী বিধবাটিকে দেবী করে তুলতে চাচ্ছেন, আর চাচ্ছেন দেবীর সঙ্গে একটু-আধটু ঘুমোনোর। দেবী চাইলে তারা না করবেন না। আমি তাকে দেবী করে তুলতে পারবো না, স্তবগান। কখনো শিখি নি, কিন্তু তিনি দেবী দেবী বোধ না করলে কারো ডাকে সাড়া দেন না মনে হয়। আমি কি সেই পবিত্র সুন্দরী মহীয়সীর কাছে যাবো, তাঁর করুণা চাইবো; তিনি কি আমাকে উদ্ধার করবেন উদ্দেশ্যহীনতা থেকে?

এক বন্ধুর সাথে প্রথম গিয়েছিলাম তার বাসায়, বন্ধুটি কোনো পূর্বধারণা দেয় নি। আমাকে, শুধু বলেছিলো আমাকে সে একটি অপূর্ব বিধবা দেখাবে; তরুণী, রূপসী, করুণাময়ী বিধবা, যা আমি আগে দেখি নি, পরেও দেখবো না। তাকে দেখে আমি মুগ্ধ হই, তাঁর রূপ আর করুণা অপার বলেই মনে হয় আমার। খুব দামি সৌন্দর্য আর বিষণ্ণতা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ছিলো; তিনি একটি দামি শাড়ি পরেছিলেন, তবে তিনি যে-বিষণ্ণতা আর সৌন্দর্য পরে ছিলেন, তার দাম আরো অনেক বেশি, কোটি মুদ্রার বেশি। আমি তার থেকে বেশ দূরেই বসা ছিলাম, তিনি আমাকে মাঝেমাঝে দয়া করে দেখছিলেন, দূরকেও তিনি অবহেলা করেন না, স্মিত হাসিও বিলোচ্ছিলেন আমার দিকে তাকিয়ে, যেমন অন্যদের দিকেও তিনি তাঁর করুণা বিতরণ করছিলেন। অনেক ভক্ত এসেছিলো তার স্লিপারের তলে।

ভাবী, আপনাকে যতো দেখি ততোই মুগ্ধ হই, এক ষাট-বছর-পেরোনো বিখ্যাত ওই তরুণী বিধবাটির স্তব করছিলেন, কী করে যে আপনি এমন বেদনার মধ্যে এমন স্থির থাকতে পারছেন। আপনাকে দেখা মানে স্বর্গকে চোখের সামনে দেখতে পাওয়া। একে আমরা ভাগ্য বলে মানি।

কিন্তু এই রাষ্ট্র, আরেক ষাট-ছোঁয়া বিখ্যাত বলছিলেন, ভাবীকে তার প্রাপ্য দিচ্ছে না। দাদা দেশের জন্যে যা করে গেছেন, তার জন্যে আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঋণী হয়ে থাকবো তার কাছে, ভাবীর কাছে। অথচ ভাবীকে জিগাতলার এই ছোট্ট ফ্ল্যাটে (আট কামরার) পড়ে থাকতে হচ্ছে। ভাবীকে একটি ভবন বরাদ্দ করা উচিত। ছিলো বনানী কি গুলশানে (দাদা দুটি বাড়ি রেখে গেছেন বনানী আর গুলশানে); আমি অবশ্য এর জন্যে লড়াই করে যাবো।

আর, ভাবী বলছেন, আমি একটু জাতিসংঘের বৈঠকে সরকারি প্রতিনিধি হয়ে যেতে চেয়েছিলাম, নিউইঅর্ক শহরটা আমার ভালো লাগে বলে, কিন্তু তারা আমাকে দলে রাখতে চাচ্ছে না, এর আগে আমি মাত্র দু-বার গেছি বলে।

এজন্যেই দেশটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আরেক স্বনামখ্যাত বলছেন, দাদার কাছে। দেশের যা ঋণ, তাতে ভাবী দু-বার কেনো দুশো বার যাবেন, তাতে কার কী বলার থাকতে পারে।

আমি দেখতে পাচ্ছিলাম তাঁদের জিভ থেকে লালা ঝরছে, জিভ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, স্তবগানের সাথে তারা উপভোগ করে চলছেন বিধবাটিকে; বিধবাও জানেন আর জানাটা উপভোগ করেন যে কিছুটা পরোক্ষ সম্ভোগের সুযোগ না দিলে ভক্তরা তাকে দেবী করে তুলবেন না। তবে এ-ভক্তরা শুধু চরণতলে থাকার মতো নয়, আরোহণের কামনা। তাদের চোখেমুখে জ্বলজ্বল করছে, সে-ই ভাগ্যবান যাকে দেবী নিজের বক্ষে স্থান দেন। আমার ওই দেবীকে মনে পড়ছে, আমার রক্তনালি জুড়ে যে-কর্কশ একটা আগুন জ্বলছে, তা স্নিগ্ধ হয়ে উঠতে পারে শুধু ওই দেবীর বিষণ করুণায়। কিন্তু আমাকে কি, যে একান্ত ভক্ত হয়ে ওঠে নি দেবীর, যে পদতলে গিয়ে দাঁড়িয়েছি মাত্র কয়েকবার, তার করুণা বিলোবেন?

তিনি কি এতো অপার করুণাময়ী হয়ে উঠতে পেরেছেন? একবার গিয়ে নিজেকে খুব ভাগ্যবান বোধ করেছিলাম, তিনি আমাকে বসার ঘর থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন বারান্দায়, ছায়াঘেরা সেই বারান্দা, আমি কয়েক মিনিট একান্ত একলা তাঁর মুখোমুখি বসার অধিকার পেয়েছিলাম; আমার মনে আরো অধিকার পাওয়ার সাধ জন্ম নিতে যাচ্ছিলো। তখন এক বলিষ্ঠ পুরুষ প্রবেশ করেন, তাঁর জুতোর শব্দও বলিষ্ঠতা প্রকাশ করে, বুঝতে পারি এ-বলিষ্ঠ পুরুষ সরাসরি প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত দেবীর কাছে। বলিষ্ঠের পাশে দেবীকে মনে হচ্ছিলো পৌরসভার ট্রাকের চাকার পাশে বসা এক প্রজাপতি বলে, চাকা যখন ঘুরতে শুরু করবে প্রজাপতি তখন কংক্রিটে মিশে যাবে। দেবী আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন বলিষ্ঠ পুরুষ জমশেদ মোল্লার সাথে, নাম শুনে তাকে চিনতে পারি। দেশের এক প্রধাম কালোবাজারির পাশে নিজেকে আমার খুবই অসহায় লাগতে থাকে।

দু-তিন সপ্তাহ দেশে ছিলাম না, জমশেদ মোল্লা বললেন, তবে আপনার কথা সব সময়ই মনে হয়েছে। জমশেদ মোল্লা পকেট থেকে একটি প্যাকেট বের করে দেবীর হাত দিতে দিতে বললেন।

দেবী হেসে সেটি গ্রহণ করতে করতে বললেন, ড, না ট?

জমশেদ বললেন, ড।

দেবী জানতে চাইলেন, কতো?

জমশেদ বললেন, পাঁচ।

দেবী হাসলেন, বললেন, এ-ধারটা শোধ করতে বছরখানেক লাগবে।

জমশেদ বললেন, কেনো? আপনি অন্য কোথাও ধার করেন না কি?

দেবী বললেন, না করলে কি চলে?

জমশেদ একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, দরকার হলে আমার কাছেই ধার করবেন, অন্য কোথাও আপনি ধার করেন আমার ভালো লাগে না।

দেবী আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, মাঝেমাঝে ধার করতে হয়, জমশেদ ভাইর কাছেই বেশি ধার পাই। আপনার কাছেও চাইবো কোনো দিন।

আমি দেবীর খানিক করুণা লাভ করি; তিনি আমার কাছেও ধার চাইবেন, আমাকেও ধন্য করবেন দেবী, আমিও তার বিবেচনার বাইরে নই। দেবী বাইরে যাবেন, জমশেদ মোল্লার সাথে বাইরে একটা কাজ আছে দেবীর; না, দেবী আমাকে বিদায়। করে দিয়ে কাজটি বাসায়ই সম্পন্ন করবেন না, দেবীর বিবেচনা রয়েছে, জমশেদ

মোল্লার সাথে তিনি কাজ করতে চলে গেলেন, আমার দিকে তাকিয়ে করুণায় আমাকে সিক্ত করে দিলেন। দেবী বোধ হয় আজ রাতেই তার ধারের অংশবিশেষ শোধ করবেন, জমশেদ মোল্লাকে যেমন দেখাচ্ছে তাতে তিনি ধারের কিছুটা না তুলতে পারলে রাস্তায়। গিয়ে গোটা কয়েক মানুষ খুন করবেন। দেবী সবচেয়ে বেশি ধার পান জমশেদ মোল্লার

কাছে, পাঁচ হাজার ডলার শোধ করতে তার বছরখানেক সময় লাগে, কেননা তিনি অন্যদের কাছেও ধার করেন, সেগুলো শোধ করতে হয় তাঁকে, সবার ধার এক সাথে শোধ করা যায় না। তবে কয় কিস্তিতে তিনি শোধ করেন পাঁচ হাজার ডলার? এক। কিস্তিতেই? না কি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কিস্তি কম-বেশি হয়? মাসে দেবী একজনের কয় কিস্তি শোধ করেন? জমশেদ মোল্লার পাঁচ হাজার ডলার কি দেবী পাঁচ কিস্তিতে শোধ করবেন? তার মানে আড়াই মাসের কিস্তি? আমার কাছে যদি দশ হাজার টাকা ধার চান, দেবী আমার অবস্থা জানেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার কাছে এর বেশি ধার চাইবেন না, তাহলে তিনি তা কয় কিস্তিতে শোধ করবেন? এক কিস্তিতেই? এক কিস্তিতেই দশ হাজার টাকা? আমার মতো ব্রিজ বানানো ইঞ্জিনিয়ার কি বারবার ধার দিতে পারবে?

যদি আমি এখন দেবীর কাছে যাই, মনে করা যাক তিনি একলা আছেন, তিনি যদি আমার কাছে ধার চান, মাত্র দশ হাজার টাকাই ধার চান, আমি কি তাকে দিতে পারবো? আমার উচিত ছিলো বেশ কিছু টাকা, বিশ হাজারের মতো, তুলে অফিসেই রেখে দেয়া; কে জানে কখন দেবী ধার চাইবেন, কে জানে কখন আমার ধার দিতে ইচ্ছে করবে। যেমন এখন আমার ইচ্ছে করছে দেবীকে ধার দিতে। দেবীকে ধার দেয়ার আগ্রহটি আমার ভেতরে তীব্র হয়ে উঠছে, যদিও দেবী আজো আমার কাছে ধার চান নি, কিন্তু আমার ভেতরে ধার দেয়ার তীব্র কামনা জাগছে। আমি ধার দিতে চাই শুধু দেখার জন্যে দেবী কীভাবে ধার শোধ করেন। দেবীর ধার শোধ করার মুহূর্তগুলো আমি অনুভব। করতে চাই, উপলব্ধি করতে চাই, অভিজ্ঞতার মধ্যে পেতে চাই। এখন কি সরাসরি চলে যাবো দেবীর মন্দিরে? দেবীকে কি সরাসরি গিয়ে ধার দেয়া যায় দেবী না। চাইলেও? আর গিয়ে যদি দেখি জমশেদ মোল্লাকে নিয়ে তিনি কাজে যাচ্ছেন, পাঁচ হাজার ডলারের কোনো কিস্তি শোধ করতে যাচ্ছেন, বা তাকে ঘিরে বসে আছেন তাঁর কামনাব্যাকুল স্তবগানরত ব্রাহ্মণবৃন্দ?

ফিরোজা কি তার দেবরের টেলিফোন পেয়েছে? তারা কি এখনো কথা বলছে? ফিরোজাও কি মাঝেমাঝে দেবরের কাছে থেকে ধার নেয়? ফিরোজা কীভাবে দেনা শোধ করে? দেবীকে আমি টেলিফোন করি।

ভাবী, আমি মাহবুব, আমি বলি, আমাকে কি চিনতে পারছেন?

আপনাকে চিনবো না তা কি হতে পারে! খিলখিল করে হাসেন দেবী, তাঁর খিলখিল হাসির একটা রঙ দেখতে পাই আমি, তার খিলখিল হাসি শুনে মনে হয় আমি কয়েক মাইল দূর থেকে টেলিফোন করছি না, তার বুকের ওপর শুয়ে আছি, সেখান থেকে খিলখিল হাসিটা উঠছে। তিনি বলেন, আর তো এলেন না।

আসতে তো সব সময়ই ইচ্ছে হয়, আমি বলি। তাহলে আসেন না কেনো? দেবী বলেন। অপেক্ষায় ছিলাম কোনো দিন আপনি আমার কাছে ধার চাইবেন, আমি বলি, তখন আসবো।

আবার খিলখিল হাসেন দেবী, তার হাসির রঙে দিকদিগন্ত ঢেকে যাচ্ছে, আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না, শুধু তার হাসির রঙ দেখতে পাচ্ছি, আশ্বিনের নদীর পারে কাশের। মেঘ দেখতে পাচ্ছি।

আমাকে ধার দিতে কি আপনার খুব সাধ হয়? দেবী বলেন।

অনেক দিন ধরেই ধার দেয়ার স্বপ্ন দেখে আসছি, আমি বলি।

তার সাথে আর কি স্বপ্ন দেখছেন? দেবী বলেন।

আপনি কীভাবে ধার শোধ করেন, আমি বলি।

দেবী আবার খিলখিল হাসেন, শিশির পড়ছে তাঁর গুচ্ছগুচ্ছ হাসির ওপর, শিশিরে ভিজে যাচ্ছে তার হাসি, তিনি বোধ হয় আর হাসতে পারবেন না।

দেবী বলেন, আমাকে সবাই ধার দিতে চায়, আমি না চাইলেও।

আমি বলি, আপনি ভাগ্যবান।

দেবী বলেন, আর সবাই ধার দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে আমি কীভাবে ধার শোধ করি দেখার জন্যে। আমি অবশ্য শোধ করে দিই। আপনি কি আজই আমাকে ধার দিতে চান?

আমি বিপদগ্রস্ত, আমার পকেটে ছ-সাত হাজারের বেশি হবে না; কিন্তু দেবী কি এতো কম ধার নেবেন, তাকে কি এতো কম ধার দেয়া যায়?

আমি বলি, ভাবী, আজই ধার দেয়ার মতো অবস্থা আমার নেই, দশের নিচে। কেমনে আপনাকে ধার দিই!

দেবী আবার খিলখিল হাসেন বলেন, আপনি তো জমশেদ মোল্লা নন যে পাঁচ হাজার ডলার ধার চাইবো, চলে আসুন, আজ আমার মনে ভালো নেই।

দেবীর মন ভালো নেই, মন ভালো না থাকলেই দেবীদের বেশি ভালো দেখায়, বেশি ভালো লাগে; বিষণ্ণতা মুখের ত্বককে কোমল করে তোলে, আজ দেবীকে আমার আরো বেশি ভালো লাগবে। আমি আর দেরি করি না, ড্রাইভার প্রথম ভেবেছিলো বাসায় যাবো, তারপর মনে করেছে লালমাটিয়া যাবে, তাকে আমি জিগাতলা যেতে বলি; দেবীর সত্যিই মন ভালো নেই, তিনি তৈরি হয়ে দরোজার পাশে দাঁড়িয়েই ছিলেন। গাড়ি গিয়ে থামতেই তিনি আমার পাশে উঠে বসেন, তাঁর ডান হাতটি আমার বাঁ। হাতের ওপর এসে পড়ে, একবার তাকান আমার দিকে, সত্যিই বিষণ্ণতায় তিনি আরো রূপসী হয়ে উঠেছেন। দেবীকে নিয়ে এখন কোথায় যাই? আমি সব সময়ই এতো। অপ্রস্তুত। দেবী আমাকে উদ্ধার করেন এক পাঁচতারা হোটেলের নাম বলে।

মন ভালো না থাকলে এই হোটেলটি আমার ভালো লাগে, দেবী বলেন, দশ তলায় উঠলে মনে হয় আমি আবর্জনার মধ্যে নেই।

আপনি কি আবর্জনার মধ্যে আছেন? আমি বলি।

আপনি বুঝতে পারেন না? দেবী বলেন। তাঁর হাতটি খুব উষ্ণ মনে হচ্ছে আমার, রওশনের হাতের মতো, মুঠোতে ধরতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ধরি না।

দশতলায় আমরা একটি কক্ষ নিই, কক্ষে প্রবেশ করি, দেবী আমার পাশে, দেবী। আমার সাথে, এখানে কোনো আবর্জনা নেই। দেবীর বিষণ্ণ শরীর থেকে আমি বিষণ্ণতার সুগন্ধ পেতে থাকি, ভেজা কাঁঠালচাপার গন্ধ, আমি বুঝে উঠতে পারি না দেবীকে নিয়ে আমি কী করবো? আমি কি আমার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত দেখতে পাওয়াকে সহ্য করতে পারবো, আমি কি পেরে উঠবো, যেমনভাবে পেরে ওঠে জমশেদ মোল্লা? আমাকে কি। এখন জমশেদ মোল্লা হয়ে উঠতে হবে? দেবী আমার থেকে কোনো ধার নেন নি, আমি কি করে তার কাছে থেকে ধার আদায় করে নেবো? দেবী গিয়ে বিছানার ওপর কাত। হয়ে শুয়েছেন, আমি এখনো দূরে দাঁড়িয়ে আছি, তার বিছানার পাশে যেতে আমার ভয় লাগছে, যেনো আমি এক পনেরো বছরের বালক, আমি ভয় পাচ্ছি। আমি কিছু পেরে উঠবো না। কিন্তু দেবী কি তা পছন্দ করবেন? তার কি মনে হবে না জমশেদ মোল্লারাই ভালো এই সব ইঞ্জিনিয়ারটিঞ্জিনিয়ারের থেকে? দেবী আমার দিকে স্মিত হেসে তাকিয়ে আছেন। আমি সামনের দিকে পা বাড়াতে পারছি না।

আপনি ধার আদায় করতে জানেন না, দেবী স্মিত হেসে বলেন, আপনাকে আমার ছেলেবেলার সেই বালকটির মতো মনে হচ্ছে, সেও ধার আদায় করতে জানতো না।

আমি তো এখনো ধার দিই নি, আমি বলি, যা দিই নি তা আদায় করবো কীভাবে?

আপনি কি এখন ধার দিতে পারবেন, দেবী বলেন, যদি আমি বলি আমার পঞ্চাশ হাজার টাকার খুব দরকার? আমি দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, আর দেবী বলেন, মনে করুন আপনি ধার দিয়েছেন, আমি নিয়েছি।

দেবীকে আমি ধার দিয়েছি, এমন একটা বোধ হয় আমার, দেবী তা তুলে নিতে বলছেন, আমি দেবীর দিকে এগিয়ে যাই, আমি আর বালক নই, আমিও পারি, ধার। আদায় করে নিতে পারি, যা জমশেদ মোল্লা পারে আমাকে তা পারতে হবে, আমাকে হতে হবে জমশেদ মোল্লা। না, আমি হয়ে উঠবো শিল্পী, স্থপতি, কবিও হয়ে উঠবো আমি, এমন কিছু আমি আজ সৃষ্টি করবো যা এ-বিষণ্ন করুণ সুন্দর রূপসী শরীরে আর কেউ সৃষ্টি করে নি। অন্যরা ঋণ আদায় করে নিয়েছে আমি ঋণ আদায় করবো না, তার কোনো অধিকার আমার নেই, আমি আমার ঋণ শোধ করবো এমন কিছু সৃষ্টি করে যা কখনো এ-শরীরে কেউ সৃষ্টি করে নি। আমি প্রথম দেবীর পদতল স্পর্শ করি, পদ্মের। মতো দুটি পদতল, ওষ্ঠ দিয়ে চুম্বন করি, দেবী শিউরে ওঠেন, হয়তো কেউ এর আগে এখানে ওষ্ঠ রাখে নি; আমি তাঁর প্রতিটি পদাঙ্গুলিকে জিভ ও ওষ্ঠের সাহায্যে পুজো করতে থাকি। তিনি আমার পুজো গ্রহণ করেন। আমি ধীরে ধীরে ওষ্ঠ ও জিভ দিয়ে পুজো করতে করতে পবিত্র দুটি জানু পাই, দুটি প্রবাল দ্বীপের মতো জানু, সেখানে আমি অনেকক্ষণ বাস করি। দেবী বারবার কেঁপে উঠতে থাকেন। আমার মনে হতে থাকে। জাহাজডুবির পর আমি খড়কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে দেবীর জানুদ্বীপে এসে আশ্রয় পেয়েছি। এক সময়, অনন্ত কাল পরে যেনো, আমি দেবীর মন্দিরের দ্বারে পৌঁছেই, ছায়াচ্ছন্ন মন্দির, বিশুদ্ধ তার জ্যামিতি, আমি মুগ্ধ হই, তার দরোজার পর দরোজার। রঙিন আভায় আমার চোখ ভরে যায়। আমি মন্দিরের দ্বারে এক পরম পুজোরীর মতো সাষ্টাঙ্গে অবনত হই, এ-দরোজা দিয়ে অনেক আদিম জন্তু প্রবেশ করেছে আর বেরিয়ে এসেছে, কোনো গোলাপ পাপড়ি পড়ে নি। আমি আমার ওষ্ঠের আর জিভের গোলাপ। ফোঁটাতে থাকি, গোলাপের পর গোলাপ ফোঁটাতে থাকি, ওষ্ঠ আর জিভ দিয়ে মন্দিরের দরোজা খুলতে থাকি, ভেসে যেতে থাকি দেবীর অনন্ত ঝরনাধারায়। পৃথিবীতে কি। তখন ভূমিকম্প হয়েছিলো, হোটেলটি কি তখন চুরমার হয়ে গিয়েছিলো? দেবী গলে সম্পূর্ণ অমৃতধারায় পরিণত হয়ে যান। আরো ওপরে, আরো ওপরে, আরো

ওপরে; দেবীর যুগল চাঁদের জ্যোৎস্নায় আমার মুখ আলোকিত হয়ে ওঠে। এখন আমার সামনে সম্পূর্ণ উন্মোচিত দেবী। রওশনকে মনে পড়ছে, দেবীর চাঁদ নিয়ে আমি খেলা করি, খেলা করি, খেলা করি; দেবী আর আমি একাকার হয়ে যাই। অনন্ত ঢেউ উঠতে থাকে, মহাজগত তরঙ্গিত হয়ে উঠতে থাকে, প্লাবনে সূর্যাদতারা ডুবে যায়, দেবী আর আমি চরম অন্ধকারের জ্যোতিতে মিশে যাই।

এতো সুখ আছে, দেবী অনেকক্ষণ পর চোখ মেলে বলেন, আমি জানতাম না। দেবী লতার মতো পেচিয়ে আছেন আমাকে।

আমি তো ঋণ আদায় করি নি, সুখ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম, আমি বলি। আপনার কি মনে হয় আমি সত্যিই ধার চাই? দেবী বলেন, সত্যিই কি আমার টাকার খুব দরকার?

তা আমি জানি না, আমি বলি।

আমার টাকার বেশি দরকার নেই, কিন্তু আপনি তো দেখেছেন আমাকে ঘিরে সব সময়ই ওরা আছে, দেবী বলেন, আপনি তো বোঝেন ওরা আমার কাছে কী চায়?

তা আমি বুঝি, আমি বলি।

ওরা আমার জন্যে সব করতে প্রস্তুত, দেবী বলেন, যদি আমি শুধু দেহখানি দিই। আমি তো সবাইকে দেহ দিতে পারি না। আমি যদি বিয়ে করে ফেলতাম ওরা আসতো, ওরা আমার জন্যে কিছু করতো না, ওরা আমাকে বিখ্যাত করে তুলেছে, বিখ্যাত হতে আমার

ভালোই লাগে। আমি আবার বিয়ে করলে ওরা আমাকে বিখ্যাতও করতো না, ওরা আমাকে বেদনার দেবীরূপে দেখতে চায়, আমিও তাই হয়ে উঠেছি। আমার একটি দেবর তো লেগেই আছে আমাকে বিয়ে করার জন্যে, কিন্তু দেবরের সাথে ঘুমোচ্ছি ভাবতেই আমার ঘেন্না লাগে।

আপনি ধার কেনো নেন? আমি জানতে চাই।

ওদের ঠেকানোর জন্যে। পঁয়ষট্টি বছরের এক নামকরা বুড়ো আমাকে ভাবী ডাকে, আর ঘুমোতে চায় আমার সাথে। তার সাথে আমি কেনো ঘুমোবো? জমশেদ মোল্লা। আমাকে ভাবী ডাকে, আর ঘুমোতে চায় আমার সাথে। তার সাথে আমি কোনো ঘুমোবো? সেজন্যেই আমি ধার চাই। বুড়ো বেশি টাকা দিতে পারবে না, আমি তার কাছে চল্লিশ হাজার ধার চাই, একবার সাধ মেটানোর জন্যে সে চল্লিশ হাজার ধার দেয়, পরে আর তার সাধ থাকে না। কিন্তু জমশেদ মোল্লার টাকা আছে, সাধেরও শেষ নেই। তার থেকে আমি পাঁচ হাজার ডলারের কম ধার নিই না, আর তা শোধ করি দু কি তিনবারে।

আপনার ভক্ত অনেক, অনেককে তৃপ্ত রাখতে হয় আপনাকে, আমি বলি।

আমি ওদের স্বভাব বুঝি, দেবী বলেন, একেকজনের স্বভাব অনুসারে আমি খাদ্য দিই। একটি ভক্ত আছে দেশি কুকুরের মতো, ও বেশি কিছু চায় না, ওকে আমি ডান। পায়ের বুড়ো আঙুলটি চুষতে দিই, চুষতে পেরে ওর সুখের শেষ থাকে না। দেবী চুপ করে থাকেন কিছুক্ষণ, তাঁর গভীর ঘুম পেয়েছে, তার চোখ বুজে আসছে, চোখ বুজতে বুজতে বলেন, আরো কিছু সৃষ্টি করুন, যাতে আমি আবর্জনার কথা ভুলে যেতে পারি।

আমি ধার দিই নি, আমি ধার আদায় করছি না; আমি সৃষ্টি করছি, আমিও কিছু ভুলে যেতে চাই, ফিরোজাকে তার দেবর ফোন করেছে কি না, তা ভাবতে চাই না, ভুলে যেতে চাই; আমি দেবীকে সৃষ্টি করতে চাই। এটা আমার সৃষ্টির রাত, আজ রাতে আমি স্রষ্টা। দেবী নিজেকে তুলে দিয়েছেন আমার হাতে, নগ্ন বিষণ্ন কাতর সুন্দর দেবী, তাঁর। শরীর ধার শোধ করেছে এতো দিন, আজ রাতে ওই শরীর চায় কিছু সৃষ্টি। আমি তাকে আঙুলের ছোঁয়ায় সৃষ্টি করে তুলতে চাই। সুখের জন্যে, যখন আমি সুখ চাচ্ছি না আমি সুখ সৃষ্টি করতে চাচ্ছি অন্যের শরীরে, তখন আমাকে হতে হবে সুরস্রষ্টা, যার হাতের ছোঁয়ায় বেহালা হাহাকার করে, বীণা বেজে ওঠে। আমি দশ আঙুল ছড়িয়ে দিয়ে দেবীর দেহবীণা বাজাতে শুরু করি। তাঁর প্রতিটি তন্ত্রীতে আমার আঙুলের ছোঁয়া লাগে, তিনি বাজতে থাকেন, সুর উঠতে থাকে তার গ্রীবা থেকে, বাহু থেকে, বগলের কৃষ্ণ রোমরাজি থেকে, চাঁদ থেকে, হ্রদ থেকে। দেবীর ডান চাঁদের লাল চক্রে কয়েকটি লাল রোম ঘাসের মতো জড়িয়ে আছে, বাহুতে টিকার দাগদুটি ঘুমন্ত অগ্নিগিরির মতো জ্বলজ্বল করছে। বাজাতে বাজাতে আমার আঙুল গিয়ে পৌঁছে বিশুদ্ধ গোলাপের ওপর, গোলাপের পাপড়ির ওপর, গিয়ে পৌঁছে গোলাপ বেটার ওপর, পাপড়ি থেকে বোটায়। আর বোটা থেকে পাপড়িতে আমার আঙুল বীণাবাদকের আঙুলের মতো সুর তুলতে শুরু করে, পাপড়ির পর পাপড়িতে আঙুল পড়তে থাকে, দেবী বেজে ওঠেন, বাজতে থাকেন, পাপড়ি পেরিয়ে আমার আঙুল গোলাপপেয়ালার ভেতরে প্রবেশ করে, মধু উপচে পড়তে থাকে গোলাপপেয়ালা থেকে। দেবী চৈত্রের বাতাসে আন্দোলিত গোলাপের মতো কাঁপতে থাকেন, গোলাপ ভেঙেচুরে সমস্ত পাপড়ি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আমি শুধু ঝংকার শুনতে থাকি। তখন আমি প্রবেশ করি গোলাপপেয়ালার মধুর ভেতর, আমি মরে যেতে থাকি, আমি বেঁচে উঠতে থাকি, দেবী মরে

যেতে থাকেন, দেবী। বেঁচে উঠতে থাকেন, আমরা অনন্ত মৃত্যু আর পুনরুজ্জীবনের মধ্যে দুলতে থাকি।

আমি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছি আজকাল প্রায়ই, প্রায়ই রওশনকে স্বপ্ন দেখছি, আর–পরীক্ষার স্বপ্ন দেখছি। দুটিই অপ্রাসঙ্গিক আমার জীবনে, কিন্তু ওই দুটিই ফিরে ফিরে দেখছি, আমার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, আর ঘুমোতে পারছি না। রওশনকে আমি আজকাল মনেই করতে পারি না, তার মুখ মনে করতে পারি না, কিন্তু স্বপ্নে তার মুখ অবিকল আগের মতো দেখতে পাই; শুধু সে আগের মতো বাঁধানো কবরের পাশে দাঁড়ায় না, দেখি সে দাঁড়িয়ে আছে কোনো পাহাড়ের পাশে বা মাঠের মাঝখানে, আমাকে দেখে দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, আমাকে চিনতে পারছে না, তার সাথে যারা আছে আমি তাদের চিনি না। আবার দেখতে পাই পরীক্ষা দিতে গেছি, অনেক দেরি হয়ে গেছে আমার, পরীক্ষা শেষ হওয়ার বাকি নেই, আমাকে কেউ প্রশ্নপত্র দিচ্ছে না, আমি চিৎকার করে প্রশ্নপত্র চাচ্ছি, আমাকে বলা হচ্ছে আর প্রশ্নপত্র নেই। আমার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। দুটির কোনোটিই আমি বুঝে উঠতে পারছি না, যা আমার জীবনে সম্পূর্ণ নিরর্থক তার স্বপ্ন আমি কেনো দেখি? আমি কি নিরর্থকতার স্বপ্ন দেখছি, এ-স্বপ্ন দুটি কি আমাকে। মনে করিয়ে দিচ্ছে আমার জীবন নিরর্থক হয়ে গেছে? আমি কি গোপনে গোপনে অনুভব করছি ওই নিরর্থকতা? কিন্তু কী অর্থপূর্ণ? আমি কোনো কিছুতেই কোনো অর্থ খুঁজে পাই না, বেঁচে থাকা আমার কাছে নিরর্থক, বেঁচে-না-থাকাও আমার কাছে নিরর্থক; নদীর ওপর ব্রিজ থাকা আমার কাছে নিরর্থক, না-থাকাও নিরর্থক।

ফিরোজার সাথে দেখা হচ্ছে না, অর্চির সাথে দেখা হচ্ছে না, যদিও আমরা একই। ফ্ল্যাটে আছি, আমি অবশ্য বেশি সময় থাকার সুযোগ পাচ্ছিনা; আমাদের সম্পর্ক পিতা, স্বামী,

মাতা, স্ত্রী, কন্যার, কিন্তু দেখা হচ্ছে না। যতোটুকু দেখা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি দেখা হয় আমাদের অন্যদের সাথে। আমি যখন দুপুরে বাসায় ফিরি তখন অর্চি বাথরুমে, সে আর বাথরুম থেকে বেরোয় না। আমি ভেবে পাই না অর্চি বাথরুমে কী করে, একজন মানুষের কেনো গোসল করতে এতোটা সময় দরকার হয়? অর্চি কি বাথরুমের ঝরনার নিচে থাকতেই পছন্দ করে? ওর শরীর জুড়ে কি ক্লান্তি নেমেছে, ঝরনাধারার নিচে থেকে থেকে কি অর্চি আবার তার শক্তি ফিরে পায়? আমি ওকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে সাহস করি না। চারপাশের ময়লা ওর শরীরে হয়তো জমছে, অর্চি হয়তো ময়লা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে বাথরুমের ঝরনার নিচে চিরকাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে চাচ্ছে।

অর্চিকে আমি জিজ্ঞেস করি, অর্চি, তোমার কী ভালো লাগে?

আমার কিছু ভালো লাগে না, অর্চি বলে, কিচ্ছু ভাল্লাগে না।

নদী বা সমুদ্র দেখতে তোমার ইচ্ছে করে না? আমি জিজ্ঞেস করি।

না, ইচ্ছে করে না, অর্চি বলে, আমার কিছুই ইচ্ছে করে না।

আমাদের মহাপুরুষদের কথা তুমি কখনো ভাবো? আমি বলি।

হাহাহা করে ওঠে অর্চি, আমি ভয় পাই; অর্চি অবলীলায় বলে, ওদের কথা ভাবার আমার সময় নেই, ওরা বড়ো অকওআর্ড পিপল, ওদের থেকে পপ সিংগারস আর মাচ মোর অ্যাট্রাকটিভ, আই অ্যাডোর দেম।

ফিরোজাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, অর্চির সাথে ইস্কুলে যাচ্ছে আসছে, প্রাইভেটে যাচ্ছে আসছে, খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ছে মনে হয়। উদ্দেশ্যহীনতার ক্লান্তিতে ভুগছে ফিরোজা? অর্চির কিছুই ভালো লাগে না, তবে তার একটা উদ্দেশ্য আছে, অনেক লেটারফেটার তাকে পেতে হবে, পাবেই, না পেলে তার চলবে না, বা ফিরোজার চলবে না; ফিরোজার কিছু পাওয়ার নেই। অর্চির লেটারগুলো কি সার্থক করে তুলবে ফিরোজাকে? আমাকে করবে না, ফিরোজাকে কি করবে? করবে বলে মনে হচ্ছে। সে চাকুরিটা করতে পারতো। আমি আজ ইস্কুল থেকে অর্চিকে আনতে গিয়ে ইস্কুলের সামনে রাশিরাশি সারিসারি ফিরোজাকে দেখে চমকে উঠি। অর্চির ছুটি হওয়ার বেশ আগেই আমি ইস্কুলে হাজির হই, দেখি সারিসারি ফিরোজা বসে আছে সামনের ফুটপাতে, মাঠের গাছের নিচে, অনেকে পাজেরোতে, আর ঝকঝকে টমোটায়-আমার ভয় লাগতে থাকে। তারা অপেক্ষা করে আছে তাদের কন্যা আর পুত্রদের জন্যে। প্রতিটি মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই তারা ক্লান্ত; তারা এসব সোনালি বাচ্চাদের গর্ভে ধারণ করেছে, গর্ভে নিয়ে বারবার ক্লিনিকে ছোটাছুটি করেছে, তারপর চিৎ হয়ে প্রসব করেছে, এখন বছরের পর বছর ইস্কুলের সামনে বসে আছে। একটি মহিলা দু-পা ছড়িয়েই বসেছে, যেমন ছড়াতে হয় বিয়োনোর সময়; বিয়োনোর অভ্যাসটি তার যায় নি মনে হয়, হয়তো তার পেটে আরেকটি এসেছে, হায়রে রাত্রির ক্ষৎকালীন উন্মাদনা, তাই ঠিক মতো। বসতে পারছে না। ওইটিকে নিয়েও তার এখানে আসতে হবে বছরের পর বছর। আমি এদের শরীরে জং দেখতে পাচ্ছি, শ্যাওলা দেখতে পাচ্ছি। ক্লান্ত, খুব ক্লান্ত এরা। অনেক বছর ধরে হয়তো একটা ভালো পুলকও বোধ করে নি, কেঁপে ওঠে নি; নিয়মসম্মতভাবে নিচে শুয়েছে। এদের স্বামীরা ঝকঝকে অশ্বের মতো বিচরণ করে চলছে নিশ্চয়ই, আমিও বিচরণ করছি; তারা ক্লান্ত নয়, না কি তারাও ক্লান্ত?

অনেকক্ষণ ধরেই ভাবছি শুয়ে পড়বো, কিন্তু বুঝতে পারছি না শুয়ে পড়বো কি না; ফিরোজাও বুঝতে পারছে না বলে মনে হচ্ছে; টিভি থেকে ভিসিআরে যাচ্ছি, ভিসিআর থেকে টিভিতে যাচ্ছি, ফিরোজা কিছু বলছে না, আমি কিছু দেখছি না, ফিরোজাও কিছু দেখছে না বলেই মনে হচ্ছে, নইলে টিভি থেকে ভিসিআরে আর ভিসিআর থেকে টিভিতে যাওয়া আসায় সে বাধা দিতো, বিরক্ত হতো, বাধা দিচ্ছে না, বিরক্ত হচ্ছে না, আমি বুঝতে পারছি না শুয়ে পড়বে কি না। টিভির মেয়েগুলোর মেদের দাপাদাপি। বিরক্তিকর লাগছে, বাসি মনে হচ্ছে, কিন্তু বন্ধ করে দিতে পারছি না, আমি জানি না বন্ধ করে দেয়াটা ফিরোজার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কি না। বন্ধু করে দেয়ার একটি ভয়ানক পরিণতি হচ্ছে আমাদের পৌঁছোতে হবে এক অভিন্ন সিদ্ধান্তে যে আমরা দুজনই ঘুমোতে চাই, বিছানায় শুয়ে পড়তে চাই। আমরা কি অমন অভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পিরবো? আমি অমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাহস পাচ্ছি না। আজ অবশ্য ফিরোজাকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় লাগছে, সে অন্যের বউ হলে সারা সন্ধ্যা আমি হয়তো অনবরত কথা বলে যেতে পারতাম, নিজের বউ বলে কিছুই বলতে পারছি না, তার সাথে আমি তো নদী, ব্রিজ, ঝড়, বা জীবন নিয়ে আলোচনা করতে পারি না। বাস্তবতা নিয়ে আর কতোক্ষণ। কথা বলা যায়? চা খাবো, চিনি লাগবে কি না, আজ রাতে কী খাবার, অর্চির পড়াশুনো কেমন এগোচ্ছে ধরনের কথা ছাড়া অন্য কোনো কথাই হয় নি সারা সন্ধ্যা, এখন আর কথাই পাচ্ছি না। ফিরোজাকে আকর্ষণীয় লাগছে, তার ঠোঁট বেশ ভেজা দেখাচ্ছে, আমি তাতে আরো ভয় পাচ্ছি, ফিরোজা মনে করতে পারে আজ তাকে আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে। বলে আমি লম্পটের মতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছি। না, আমি লম্পট নই। আমি টিভি থেকে ভিসিআরে ভিসিআর গ্রেকে টিভিতে যাতায়াত করতে থাকি, এক সময় গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ি। ফিরোজার হাতে এখন রিমোট কন্ট্রোল, ফিরোজা ভিসিআর থেকে টিভিতে টিভি থেকে ভিসিআরে যাতায়াত করতে থাকে, কিছুই তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। আমি চোখ বোজার চেষ্টা করি, চোখ বুজে

থাকি; চোখ বুজলে আমি। সাধারণত অনেক কিছু দেখতে পাই, কিন্তু আজ কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ফিরোজা টিভি আর ভিসিআর বন্ধ করে তার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। আলোটা নেভায় না, আলোটা নেভানোর সাহস তার হচ্ছে না মনে হচ্ছে; আলোটা নেভালেই মনে হবে আমরা অভিন্ন সিদ্ধান্তে এসে গেছি যে এখন ঘুমোতে হবে।

আলোটা কি নিভিয়ে দেবো? আমি এক সময় জিজ্ঞেস করি।

না, ফিরোজা বলে।

উঠে গিয়ে সে আবার ভিসিআর থেকে টিভিতে যাতায়াত করতে থাকে, যাতায়াত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সে শুয়ে পড়তে চায়।

আলোটা কি নিভিয়ে দেবো? ফিরোজা আমাকে জিজ্ঞেস করে।

না, আমি বলি।

উঠে গিয়ে আমি আবার টিভি থেকে ভিসিআরে ভিসিআর থেকে টিভিতে যাতায়াত করতে থাকি, যাতায়াত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আমার শুয়ে পড়ার ইচ্ছে হয়।

বাতিটা নিভিয়ে দিই? আমি জিজ্ঞেস করি।

দাও, ফিরোজা বলে।

আমি গিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে পড়ি। এখন আমার একটি বড়ো দায়িত্ব ঘুমিয়ে পড়া, এখন ফিরোজার বড়ো দায়িত্ব ঘুমিয়ে পড়া; কিন্তু আমরা কি ঘুমিয়ে পড়তে। পারবো? অন্ধকারে আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি না ফিরোজা কীভাবে শুয়েছে, চোখ বন্ধ করেছে কি না, আমাকেও সে দেখতে পাচ্ছে না নিশ্চয়ই, হয়তো দেখার চেষ্টা করছে। আমি কীভাবে ঘুমাচ্ছি, যেমন আমিও দেখতে চাচ্ছি। ফিরোজাকে কি আমি ডাকবো? ডাকা কি ঠিক হবে? সে তো উঠে এসে আমার পাশে শুতে পারতো। আমি কি গিয়ে তার পাশে শুয়ে পড়বে, সেটা কি নিজেকে ছোটো করা হবে না? পাশে শুয়ে পড়লেই কি আমি তাকে ছুঁতে পারবো? ফিরোজা যদি পছন্দ না করে? ফিরোজা কি চাচ্ছে আমি তার পাশে গিয়ে শুই, তাকে জড়িয়ে ধরি, আমার যা ইচ্ছে করি? ঘড়িটা তার অদ্ভুত সুন্দর আওয়াজ করছে, এখন রাত কতো হলো, কততক্ষণ ধরে আমি ঘুমোনোর চেষ্টা করছি? ফিরোজা কি ঘুমিয়ে পড়েছে? সে একবার এদিক আরেকবার ওদিক ফিরে শুলো মনে হয়, সেও কি ঘুমোচ্ছে না? ফিরোজা কি জানে আমি মাহমুদা রহমানের সাথে। মাঝেমাঝে ঘুমোই, আর দু-একবার ঘুমিয়েছি দেবীর সাথে? তার জানার কথা নয়, তবে সে সন্দেহ পোষণ করে আমার সম্বন্ধে, যেমন আমি সন্দেহ পোষণ করি। আমি কি একটু উত্তেজিত? ফিরোজও? আমার কি একটু প্রশমন দরকার? ফিরোজারও? আমি জানি না। মনে করা যাক ফিরোজা আর আমার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই, সে অন্য কারো স্ত্রী, দিনাজপুর থেকে ট্রেনে এসেছে, আমি অন্য কারো স্বামী, ট্রেনে এসেছি। সিলেট থেকে, মধ্যরাত, কোনো রেলস্টেশনে একই ঘরে ঘুমোতে বাধ্য হচ্ছি, তাহলে। এখন আমরা কী করতাম? নিজ নিজ বিছানায় ঘুমিয়ে পড়তাম? যদি আমরা একই ঘরে ঘুমোভে রাজি হতাম তাহলে আমরা ঘুমোতাম না, মুখোমুখি বসে চা খেতাম, সে আমাকে দিনাজপুরের গল্প শোনাতো, আমরা চা খেতাম, আমি তাকে সিলেটের গল্প শোনাতাম, আমরা চা খেতাম, অদ্ভুত লাগতো আমাদের চা আর গল্প; সে আমার কাছে

আমার বাল্যকালের গল্প শুনতে চাইতো, আমাকে বাক্স থেকে বিস্কুট বের করে দিতে, আমি তার কাছে তার বাল্যকালের গল্প শুনতে চাইতাম, বাক্স থেকে তাকে চকোলেট বের করে দিতাম। তারপর যদি আমাদের একটু শীতশীত লাগতো, যদি আমাদের একটু ঘুমঘুম লাগতো, আমরা প্রথমে একজন আরেকজনের আঙুল ছুঁতাম, পরে গাল। চিবুক ছুঁতাম, ঠোঁট ছুঁতাম, একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর সব ভাষা ভুলে গিয়ে কেউ কাউকে জিজ্ঞেস না করে বাতি নিভিয়ে দিতাম, আমরা মাত্র একটি শয্যা ব্যবহার করতাম, আরেকটি শয্যা শীতে কাতর হয়ে একলা পড়ে থাকতো।

ফিরোজা আর আমি তা পারছি না, আমরা স্বামীস্ত্রী, আমরা কেউ কারো কাছে বাল্যকালের গল্প শুনতে চাই না; আমার বাল্যকালের গল্প শুনে ফিরোজার ঘেন্না লাগবে, ফিরোজার বাল্যকালের গল্প আমার বিরক্তিকর মনে হবে, ফিরোজা, গল্প বলতে গেলে। সব কিছু জড়িয়ে ফেলে, কিছু বাদ দিতে চায় না, শেষ করে উঠতে পারে না, আমরা দুই শয্যায় পড়ে আছি। আমি জানি ফিরোজা উঠে আসবে না, মেয়েদের আশ্চর্য সংযম আছে, ওরা মনকে চেপে রাখতে পারে যখন মন চায়, শরীরকে চেপে রাখতে পারে যখন শরীর চায়। আমি পারি না। এর আগেও এমন হয়েছে, ফিরোজা আশ্চর্যভাবে চেপে। রেখেছে নিজেকে, যদিও তারই দরকার ছিলো বেশি; কিন্তু আমি চেপে রাখতে পারি নি, যদিও আমার কোনো দরকার ছিলো না। এখনো আমার খুব দরকার নেই, কিন্তু আমি ঘুমোতে পারছি না, ঘুমোতে না পারা খুবই জঘন্য ব্যাপার।

তুমি কি ঘুমোচ্ছো? আমি অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বলি।

ফিরোজা কোনো উত্তর দিচ্ছে না। আমি কি আবার আমার স্বগতোক্তি করবো? আমার কণ্ঠস্বর কি ওই বিছানা পর্যন্ত পৌঁছে নি?

তুমি কি ঘুমোচ্ছো? আমি আবার স্বগতোক্তির মতো বলি।

ফিরোজা এবার সাড়া দেয়, বলে, কেননা, তাতে কী দরকার তোমার?

আমি বিব্রত বোধ করি, বিছানায় উঠে বসি; বলি, আমার ঘুম আসছে না।

ফিরোজা বলে, আমি তার কী করতে পারি?

আমি বলি, একটা রাবার নামও না।

ফিরোজা চুপ করে থাকে, আমি আবার বলি, একটা রাবার নামাও না।

ফিরোজা বলে, আমার সাথে শুধু এটুকুই তো কথা।

আমি আবার বিব্রত বোধ করি, কোনো কথা বলি না। অনেকক্ষণ নীরবতার পর পর ফিরোজা বলে, দরকার হলে তুমিই নামাও।

আমি বলি, কোথায় আছে আমি তো জানি না।

ফিরোজা বলে, যেখানে থাকার সেখানেই আছে।

অন্ধকারে আমি সে-জায়গাটি হাতড়াতে থাকি, প্রচুর কাপড় আর এলোমেলো জিনিশে ঢেকে আছে সব কিছু, যা খুঁজছি তা আমার হাতে লাগছে না। একটি বড়ো। বাক্স থাকার কথা। তাহলে কি সব ফুরিয়ে গেছে? ফুরিয়ে যাওয়ার তো কথা নয়। এক সময় বড়ো বাক্সটিতে হাত লাগে, আমি ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটি ছোটো প্যাকেট বের করে আনতে চাই। ছ-সাতটি ছোটো প্যাকেট, আমার মনে হয়, থাকার কথা; কিন্তু দু-তিনটি প্যাকেট মাত্র পড়ে আছে। বাকিগুলো গেলো কই? আমরা আটাশ-ত্রিশটির মতো ব্যবহার করেছি, এ-কক্ষে, এতো সময় আমরা পেলাম কই? তাহলে ফিরোজা কি বাকিগুলো ব্যবহার করেছে? আমি একটু কেঁপে উঠি। ফিরোজাকে জিজ্ঞেস করবো প্যাকেট এতো কমলো কী করে? সে কি রেগে উঠবে না? কিন্তু প্যাকেট এতো কমলো কী করে? আমাদের তো দশ পনেরো বিশ দিনেও কিছু হয় না। ফিরোজাকে জিজ্ঞেস করবো? একটু হাল্কা ভঙ্গিতে?

এই, আমি বলি, প্যাকেট এতো কম কেনো!

ফিরোজা একটু রেগে ওঠে, আমি বসে বসে খেয়েছি।

আমি বলি, মাঝেমাঝে বাইরেটাইরে নিয়ে যাও না তো।

ফিরোজা রাগে না, বলে, দরকার হলে তো নিইই।

আমি বিব্রত হই, বলি, মাঝেমাঝেই নাও মনে হয়।

ফিরোজা বলে, এরপর একটি খাতা বানিয়ে হিশেব লিখে রেখো।

আমি একটু হাসার চেষ্টা করি, বলি, একটা সেক্রেটারি নিয়োগ করতে হবে এর জন্যে।

ফিরোজা বলে, একটা চেস্টেটি বেল্টও কিনে আনতে পারো।

আমি বলি, আজকাল বাজারে কি চেস্টেটি বেল্ট পাওয়া যায়?

ফিরোজা বলে, পাওয়া না গেলে ব্রিজট্রিজ রেখে তুমি একটা কারখানা খুলতে পারো। তোমার তো কোটিপতি হওয়ার সাধ আছে।

ফিরোজার প্রস্তাবটি চমৎকার; রিয়াদ, তেহেরান, ভাটিকান বা মতিঝিলের ধার্মিক ব্যাংকটির সাথে যোগাযোগ করলে খারাপ হয় না, তারা এ-প্রকল্পে মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে উৎসাহের সঙ্গে। সুদমুক্ত ঋণ পাওয়া যাবে। কিন্তু আমি কি ফিরোজাকে চেস্টেটি বেল্ট পরাতে পারবো? উল্টো দেখা যাবে মাহমুদা রহমানকে তার আলহজ স্বামী খান দুই চেস্টেটি বেল্ট পরিয়ে গেছে, এমনকি জমশেদ মোল্লা আমারই কারখানায় উৎপাদিত চেস্টেটি বেল্ট পরিয়ে দিয়েছে দেবীর কোমরে।

ফিরোজা ভেঙেচুরে যাচ্ছে, আমাকে ঘেন্না করে সে শক্ত হয়ে থাকবে বলে আমি ভয় পাচ্ছিলাম, এখন সে এতো ভাঙছে যে আমি ভয় পাচ্ছি, ফিরোজা কি এখনো মনে করে আমি ঠিক পারি না? আমি কি ফিরোজাকে জিজ্ঞেস করবো, ফিরোজা কি উত্তর দেবে?

এটা কি উত্তর দেয়ার সময়? ঘেন্নাটোর মতো বিশ্রী ব্যাপারগুলো এ-সময় মনে থাকে না, ঘেন্নার কথা মনে থাকে আগে; এ-সময় মানুষ দেবতা হয়ে ওঠে; মানুষের। মন ঘেন্না করতে পারে, ঘেন্না করে, ঘেন্না করে নানা সমস্যা তৈরি করে; কিন্তু শরীর ঘেন্নার উর্ধ্বে, শরীর কোনো ঘেন্না জানে না, ধর্ম জানে না, দর্শন জানে না, রাজনীতি জানে না; শরীর জানে জলের মতো ঝরতে মোমের মতো গলতে ফুলের মতো ফুটতে। শরীরের কাজ শেষ হয়ে গেলে আবার মন কাজ করতে শুরু করে, মনের কাজ সব সময়ই সমস্যা তৈরি করা, খুব ভেতর থেকে খুঁড়ে খুঁড়ে খুব মারাত্মক কিছু বের করা। আমি মনের কাজকে দমিয়েই রাখতে চাই, তবে ফিরোজা মনের কাজ ছাড়া বেঁচে। থাকতে পারে না বলেই মনে হয়।

আমাকে দরকার তোমার শুধু এটুকুর জন্যে, ফিরোজা বলে।

একে শুধু এটুকু বলছো কেনো?

আমি বলি। এটুকু ছাড়া আর কী?

ফিরোজা বলে। এটাই তো বড়ো কাজ জীবনের, আমি বলি।

আমার তো তা মনে হয় না, ফিরোজা বলে।

তোমার ভালো লাগে না? আমি বলি। ফিরোজা কোনো উত্তর দেয় না। সে ঘুমিয়ে পড়তে চায়, আমি আমার শয্যায় এসে শুয়ে পড়ি, এবার আমার ঘুম আসে, ফিরোজারও এসে গেছে মনে হয়।

মাহমুদা রহমান মারাত্মক রসিকতা করতে পারেন, নিজেকে নিয়েও, টেলিফোনেই অবলীলায় তিনি ভয়ঙ্কর রসিকতা করে চলেন। আমার ভয় লাগে কখন কে আমাদের সংযোগের মধ্যে ঢুকে পড়ে, সব কিছু উল্টেপাল্টে যায়।

টেলিফোন বাজলে আমি ধরে বলি, হ্যালো।

তিনি এখন আর আমি বলেন না, বলেন, আপনার উপপত্নী।

আমি প্রথম প্রথম বিব্রত বোধ করতাম, এখন আর করি না, বরং ভাবতে ভালোই লাগে যে আমার একটি উপপত্নী আছে। আমার পিতার একটি ছিলো, তার পিতার হয়তো দুটি ছিলো, তার পিতার হয়তো একগণ্ডা ছিলো। উপপত্নী কী, কী হলে কেউ উপপত্নী হয়, উপপতি হয়?

আমার বলতে ইচ্ছে হয়, বলুন, উপপত্নী, আপনি কেমন আছেন? কিন্তু আমি বলতে পারি না, মনে মনে ভালো লাগলেও তা উচ্চারণ করার সময় আমার গলা বন্ধ হয়ে আসে; আমি বলি, আপনার রসিকতাবোধ ভয়ঙ্কর।

তিনি আগে বলতেন, আপনি ভাগ্যবান, একটি টাকা ব্যয় না করেও এমন একটি উপপত্নী পেয়েছেন।

আমি বলতাম, আপনি কী যে বলেন!

তিনি বলতেন, আমি সত্যিই বলি, ভাবতে আমার ভালোই লাগে যে আমি আপনার উপপত্নী।

আমি বলতাম, আপনার ভালো লাগা খুবই সাংঘাতিক।

এখন আমিও রসিকতা করি, না করে উপায় নেই, সব কিছু গুরুত্বের সাথে নিলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়বো।

এখন যখন বলেন, কী ভাগ্যবান আপনি! একটি পয়সাও ব্যয় না করে এমন একটি উপপত্নী পেয়েছেন!

আমি বলি, কিন্তু যে-সেবাটি দিই তার দাম?

তিনি হেসে বলেন, মিলিয়ন ডলার?

আমি বলি, তিন মিলিয়ন।

তিনি বলেন, কীভাবে?

আমি বলি, পতির কাছে পেতেন একটি সেবা, আমি গরিব, কিছু দিতে পারি না, তাই আমি দিই তিনটি সেবা, প্রত্যেকটির দাম ভেবে দেখুন।

মাহমুদা রহমান হাসেন, আমি তার শব্দ পাই।

তিনি একদিন বলেন, একটি কথা কি আপনি কখনো ভেবেছেন?

আমি বলি, কী কথা?

তিনি বলেন, উপপত্নীকে পত্নী করে নিলে কেমন হয়?

আমি শিউরে উঠি, কথা বলতে পারি না, ব্রিজ ধসে পড়ছে দেখতে পাই।

তিনি বলেন, ভয় পাচ্ছেন মনে হচ্ছে।

আমি বলি, হ্যাঁ, পাচ্ছি।

তিনি বলেন, ভয় এখন থাক, চলে আসুন।

আমি না করতে পারি না; না করলে তিনি মনে করবেন আমি, একটা আস্ত কাপুরুষ, শুধু ভয়ই পাই নি, পালিয়ে যাওয়ারও পথ খুঁজছি। হঠাৎ তাঁর পত্নী হওয়ার সাধ জাগলো কেনো? তিনি তো একজনের পত্নী হয়ে দেখেছেন, তার সুখ মহত্ত্ব প্রেম কাম সবই দেখেছেন, তাহলে তার এমন সাধ হলো কেনো? তিনি কি মনে করছেন হাফিজুর রহমানের পত্নী হওয়াতেই সব বা অনেকটা গোলমাল হয়ে গেছে, তার বদলে তিনি যদি মাহবুব

হোসেনের বিবাহিত পত্নী হতেন বা এখন হন, সব ঠিক হয়ে যাবে, তিনি সুখে আচ্ছন্ন হয়ে যাবেন? আমার তা মনে হয় না; ফিরোজার সাথে জড়িয়ে গেছি বলে আমার গোলমাল হচ্ছে আমার মনে হয় না, মাহমুদা রহমানের সাথে বিয়ে হলেও একই গোলমাল হতো। তিনি ভাবছেন ব্যক্তিই মূল সমস্যা, যদি ঠিক লোকটিকে পাওয়া যেতো, সব ঠিক হয়ে যেতো, সব ঠিক থাকতো, অর্থাৎ আমি হাফিজুর রহমানের থেকে। বেশি ঠিক মানুষ,– অন্তত এখন তাঁর মনে হচ্ছে, আমার সাথে বিয়ে হলে তিনি আরো বেশি ঠিক থাকতেন; আমি ভাবছি অন্যরকম, আমার কাছে কাঠামোই মূল সমস্যা, ব্যক্তি গৌণ। নিকৃষ্ট ব্যক্তির সাথে থাকা সম্ভব নয়, এটা ঠিক; কিন্তু সমস্যা হচ্ছে উৎকৃষ্ট। ব্যক্তির সাথেও থাকা অসম্ভব, কিন্তু আমরা থাকছি। এ-কাঠামো আমার সমস্ত কিছু হরণ করে নিজেকে টিকিয়ে রাখে। আমি বোধ করি আমাদের কোথাও একটা ব্যাপার আছে যে আমরা একে অন্যের প্রতি টান বোধ করবো কাম বোধ করবো প্রেম বোধ করবো, এটা চমৎকার ব্যাপার; তবে আরেকটা ব্যাপারও আছে আমাদের, সেটা চমৎকার নয়, বেশ খারাপই, তা হচ্ছে আমরা একে অন্যের প্রতি টান বেশি দিন ধরে রাখতে পারবো না। হাতপা বেঁধে সাঁতার দেয়া সম্ভব নয়, বিবাহ হচ্ছে হাতপা বেঁধে সাঁতার দেয়ার। অসম্ভব চেষ্টা, যা কেউ পেরে ওঠে না। মাহমুদা রহমান আর আমি সাঁতার দিই, তিনি। ভাবছেন যদি আমরা একটি কাঠামো তৈরি করে ফেলি, বিবাহের কাঠামো, তাহলেও আমরা সাঁতার দিতে পারবো; কিন্তু আমি জানি তখন আমরা সাঁতার দিতে পারবো না। তিনি হাফিজুর রহমানের সাথে সাঁতার কাটার সুখ পান নি, আমি ফিরোজার সাথে পাই না, ফিরোজা আমার সাথে পায় না; ফিরোজা যদি মাহমুদা রহমান হলো আমার। সাঁতারে সুখের শেষ থাকতো না।

তিনি বলেন, উপপত্নী থাকতে আমার ভালোই লাগছিলো, কিন্তু এখন আর ভালো লাগছে না।

আমি বলি, আমি কখনো আপনাকে আমার উপপত্নী মনে করি নি। তাহলে আপনাকে গুলশানে বাড়ি ভাড়া করে দিতাম, মাসে বিশ হাজার টাকা দিতাম। ভরণপোষণের জন্যে।

ওসব আমার দরকার ছিলো না, তিনি বলেন, আগে আমাদের মাঝেমাঝে দেখা হলেই আমার হতো, এখন আমার সব সময় দেখার ইচ্ছে হয়। আমি শুধু আপনাকে পালিয়ে সকালবেলা পেতে চাই না, রাতভর পেতে চাই।

আমি বলি, এমন হলো কেননা আপনার?

তিনি বলেন, গোপনে মিলিত হয়ে হয়ে এখন আমার মনে হচ্ছে আমি দেহ দিচ্ছি, এটা আমার ভালো লাগছে না; আমি একসাথে বেড়াতে যেতে চাই, দুপুরে বাসায়। দেখতে চাই, রাতে একসাথে ঘুমোতে চাই।

আমি বলি, আপনার মধ্যে চিরন্তন নারীত্ব জেগে উঠেছে মনে হচ্ছে, ওটিকেই আমি ভয় পাই বেশি।

তিনি বলেন, আমি আপনার দ্বিতীয় স্ত্রী হতেও রাজি আছি।

আমি বলি, আমার স্ত্রীকে আমি ছেড়ে দিতে পারি, সে আমাকে ছেড়ে দিতে পারে, তবে আর কোনো স্ত্রীর কথা আমি ভাবি না, দ্বিতীয় স্ত্রীর কথাই ওঠে না।

তিনি বলেন, আপনি শুধু আমার দেহটিকেই ভোগ করতে চান। যদি আমি দেহ ভোগ করতে দিই, তবে শুধু আপনাকে কেননা, অন্য অনেককেও আমি দিতে পারি, তাতে আমার সুখ বাড়বে।

আমি বলি, নারীদের নিয়ে এটি এক বড়ো সমস্যা, তারা মনে করে পুরুষরাই। তাদের দেহ ভোগ করে, তারা পুরুষদের দেহ ভোগ করে না। আমি কি শুধু আপনার দেহ ভোগ করেছি, আপনি কি আমার দেহ ভোগ করেন নি? আমিই কি শুধু সুখ পেয়েছি, আপনি কি সুখ পান নি? আসলে আপনিই পেয়েছেন বেশি সুখ; আপনি। পুলকের পর পুলকে ভেঙে পড়েছেন, আপনি যতো পুলক বোধ করেছেন আমি ততো। বোধ করি নি। তবে আপনার স্বাধীনতা রয়েছে কার সাথে আপনি জড়িত হবেন তা ঠিক করার।

তিনি কেঁদে ফেলেন, আপনাকে যে আমি সম্পূর্ণ পেতে চাই।

আমি জানি না সম্পূর্ণ পাওয়া কাকে বলে, তিনি বিয়েকেই হয়তো ভাবছেন সম্পূর্ণ পাওয়া। আমি তো তাকে সম্পূর্ণ পেতে চাই না। কয়েক মাস আগে হাফিজুর রহমান দেশে বেরিয়ে গেলেন, তখন আমার মনে হয় নি যে মাহমুদা রহমানকে আমার সম্পূর্ণ পেতে হবে, হাফিজুর রহমান যাতে তার সাথে মিলিত হতে না পারে তার ব্যবস্থা। করতে হবে। বরং আমি একটু দূরে থাকতে পেরে স্বস্তিই পেয়েছি। তখনও মাহমুদা। রহমান আমাকে ফোন করেছেন, আমি বেশ কয়েক বার বেড়াতেও গেছি তার বাসায়, বুঝতে পেরেছি হাফিজুর রহমান মরুভূমির পিপাসা নিয়ে দেশে ফিরেছেন, দিনরাত পান করছেন, খাচ্ছেন।

মাহমুদা রহমান ফোন করেছেন, ভদ্রলোকের ক্ষুধা মিটছে না। স্বামী বলে বাধাও দিতে পারছি না।

আমি বলেছি, অনেক দিন ধরে ক্ষুধার্ত আর পিপসার্ত, তাই একটু বেশিই খাবেন, বেশিই পান করবেন। খেতে দিন, পান করতে দিন, সওয়াব হবে।

তিনি বলেছেন, কিন্তু উটের মতো খায় আর পান করে, যাকে খাচ্ছে তার কথা ভাবে না। আর সওয়াব? দিনে আশি লক্ষ বছরের সওয়াব আদায় করছে।

আমি বলেছি, যে খায় সে নিজের কথাই ভাবে, নিজের পেট ভরছে কি না, খেতে ভালো লাগছে কি না, সেটাই তার বিবেচনার বিষয়; তার খাওয়ার ফলে খাদ্যের কেমন লাগছে সেটা তার ভাবার বিষয় নয়।

তিনি বলেছেন, কেউ কেউ তো তেমন নয়।

আমি বলেছি, ওই কেউ কেউ শুধু খায় না, নিজেকেও খেতে দেয়।

তিনি বলেছেন, দ্রলোক আমাকে প্রেগন্যান্ট করে রেখে যেতে চায়।

আমি বলেছি, অর্থাৎ তিনি নিজেকে আপনার ভেতরে রেখে যেতে চান, যাতে তাকে আপনি সব সময় বোধ করেন।

তিনি বলেছেন, না, না, তা হয় না; আমি আর ওই সব চাই না।

তিনি এখন আমাকে সম্পূর্ণ পেতে চান, আমাকে সম্পূর্ণ পাওয়ার মধ্যে আমি কোনো মহিমা দেখতে পাই না, যেমন আমি মাহমুদা রহমানকে সম্পূর্ণ পাওয়ার মধ্যেও কোনো মহিমা দেখি না, বিপর্যয় দেখতে পাই। ফিরোজা বিপর্যয়ের একটা আভাসও দিয়েছে, সে আমার কাছে জানতে চেয়েছে মাহমুদা রহমান সম্পর্কে, তিনি কেমন আছেন সে-সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ফিরোজার কি এটা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ আগ্রহ, না কি এর ভেতর কোনো পাপ রয়েছে? ফিরোজা কি জানতে পেরেছে যে আমার সাথে মাহমুদা রহমানের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, মাঝেমাঝে আমি তার বাসায় অসময়ে যাই? কী করে সে জানবে? জানার হাজার পথ খোলা রয়েছে। ড্রাইভার জানিয়েছে, আমাদেরই কেউ জানিয়েছে? ফিরোজার মুখের দিকে তাকিয়ে অবশ্য আমি কিছু বুঝতে পারি নি; পারি নি বলেই আমার সন্দেহ হচ্ছে তার মনে পাপ আছে, তার আগ্রহ নিষ্পাপ নয়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে আলোচনার সময় মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে যখন কিছু। বোঝা যায় না, তখন, আমার বিশ্বাস, বুঝতে হবে অত্যন্ত মারাত্মক কিছু রয়েছে অত্যন্ত গভীরে। ফিরোজার গভীরেও কিছু থাকতে পারে, হয়তো আছেই, তা বাইরে দেখা দিতে বেশি সময় নেবে না। আমাকে তৈরি থাকতে হবে একটা সংকটের মুখোমুখি দাঁড়ানোর জন্যে, কিন্তু আমি তো ফিরোজার মতো নিরীহ মুখে মারাত্মক ব্যাপারগুলো ভেতরে চেপে রাখতে পারি না। সংকটটি এসেই যায়, ফিরোজা বেশি আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে।

মাহমুদা ভাবীকে না কি তুমি আজকাল খুব সাহায্য করছো? ফিরোজা বলে।

তুমি কোথায় শুনলে? আমি বলি।

কোথায় শুনলাম সেটা ভিন্ন কথা, তাঁকে নানা সাহায্য করছে কি না আমি তাই জানতে চাই, ফিরোজা বলে।

তার দরকার হলে মাঝেমাঝে সাহায্য তো করিই, তাঁর স্বামী আমাদের বন্ধু ছিলেন, আমি বলি।

যেমন তুমি বিদেশে গেলে তোমার কোনো কোনো বন্ধু আমাকেও সাহায্য করবে, ফিরোজা বলে।

আমি অবশ্য কখনো বিদেশে যাবো না, আমি বলি।

সাহায্য করার জন্যে কখন তাঁর বাসায় যাও? ফিরোজা প্রচণ্ড প্রশ্ন করে।

যখন দরকার হয়, আমি বলি।

ফিরোজা কি আরো এগোবে, সব সত্য আজ সন্ধ্যায়ই উদঘাটন করবে? ফিরোজা আর এগোয় না, আমি স্বস্তি পাই; তবে আজ রাতে ফিরোজার সাথে সম্পর্কের একটা বাসনা আমার ছিলো,-দু-সপ্তায় কোনো সম্পর্ক হয় নি, সেটা নষ্ট হয়ে যায়; আমার পক্ষে আর তাকে ডাকা সম্ভব হবে না, সে তো ডাকবেই না। ফিরোজা কি আমার আর মাহমুদা রহমানের সম্পর্কের কথা জেনে গেছে, সে কি মনে করে আমাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক রয়েছে? আমার তা-ই মনে হয়। ফিরোজা মাঝেমাঝেই বলে বিবাহিত পুরুষগুলোই বেশি

ইতর হয়, কুকুরের মতো, চল্লিশ বছর হয়ে গেলে তারা ইতরামো ছাড়া আর কিছুই জানে না, তাদের জিভ লকলক করতে থাকে সব সময়; কিছু না পেলে তারা কাজের মেয়েগুলোর দিকেই হাত বাড়ায়, বউয়ের থেকে কাজের মেয়েগুলোর স্বাদই তাদের বেশি ভালো লাগে। আমাকে নিয়ে ফিরোজা অবশ্য এ-সন্দেহটা পোষণ করে না, যদিও আমাদের বাসার কাজের মেয়েটি সুন্দরী; কারণ আমি বাসায়ই থাকি না, যতোক্ষণ থাকি ফিরোজাও থাকে। তবে আমার মনে হয় ফিরোজা মনে করে মাহমুদা রহমানের সাথে আমার একটা সম্পর্ক আছে, সেটা শারীরিক, কেননা এ-বয়সে অন্য কোনো সম্পর্ক হতে পারে না। ফিরোজার সম্পর্কটি কেমন? টেলিফোন–দেবরটি তার থেকে পাঁচ-ছ বছরের ছোটো হবে; তবে ফিরোজাকে তার পাশে বালিকাই মনে হয়; একদিন দেবরটিকে আমি বাসায়ও দেখেছি, বিকেলবেলা আমি বাসায় থাকবো সে। হয়তো ভাবতে পারে নি, আমাকে দেখে সে খুব বিব্রত বোধ করছিলো। খুব বিনয়ের সাথেই সে কথা বলছিলো ফিরোজার সাথে, আমার সাথেও, ফিরোজা তাকে তুমি বলছিলো, সে ফিরোজাকে আপনি বলছিলো, বিনয়ে সোফায় দু-পা আর দু-হাত জড়ো করে বসে কথা বলছিলো অবতারটি। অবতারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব না কী পড়ায়, অস্ট্রেলিয়া থেকে একটা প্রশান্ত মহাসাগরীয় পিএইচডিও এনেছে। ভাবীর সাথে তার নিষ্পাপ নৃতাত্ত্বিক সম্পর্ক? নিষ্পাপ সম্পর্কই যদি তাহলে অন্যের স্ত্রীকে ভাবী ডেকে সম্পর্ক করার কী দরকার ছিলো, ছোঁকরা একটা কবুতর বা দোয়েল বা শাপলা বা আকাশের মেঘের সাথে সম্পর্ক করলেই পারতো। মানুষের সাথে কেনো? মানুষের সাথে সম্পর্ক কখনো নিষ্পাপ হয়? নিষ্পাপ সম্পর্ক কখনো টেকে? ফিরোজার সাথে তার সম্পর্ক কী? নিশ্চয়ই নৃতাত্ত্বিক। ছোঁকরা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলো চষে এখন দেশে চষতে চাচ্ছে। ফিরোজার মুখে একটা বয়সের ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়েছে, ছোঁকরাটির মুখে বালক বালক ভাব এখনো রয়েছে, ফিরোজা কি এ-বালকটির নিচে নিজেকে সমর্পণ করতে পারে? হয়তো পারে, বালকের স্বাদ অপূর্ব মনে হতে পারে তার; আর বালকটির অসামান্য অনুভূতি

হওয়ারই কথা, সব বালকই তার চেয়ে বয়সে বড়ো কোনো নারীকে পরাভূত করার দিবাস্বপ্ন দেখে, আমিও দেখতাম। বালকটির বয়স যত বাড়বে কচি লাউডগার জন্যে ততোই পাগল হবে; কিন্তু ফিরোজার সাথে বালকের কী সম্পর্ক?

বালকটি কি মুগ্ধ হয়ে শুধু ফিরোজার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর কোনো দিকে তাকায় না, ফিরোজার গলার স্বর শুনে শুনেই বিভোর হয়ে যায়, অন্য কোনো সুর তার শুনতে ইচ্ছে করে না? ফিরোজা আর বালকটির কি এখনো সোনালি রুপোলি গল্পের পর্ব চলছে? সে কি ফিরোজাকে শুনিয়ে যাচ্ছে শুধু প্রশান্ত মহাসাগরের গল্প, ফিরোজা বালিকার মতো শুনে চলছে? না কি তারা পরস্পরের শরীরের কাছাকাছি এসে গেছে? হয়তো এসে গেছে, এসে গেছে বলেই মনে হচ্ছে; ফিরোজা নিজের আর আমার শরীরের প্রতি এতো নিস্পৃহ হয়ে পড়েছে হয়তো সে-জন্যেই, বালকটি তাকে পরিতৃপ্ত করে চলছে বলেই হয়তো এতো নিরাসক্ত হতে পারছে সে আজকাল। তারা। প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিচ্ছে তো, না কি কাকের বাসায় একটি কোকিলের ছানা দেখা দেবে অচিরেই, এবং আমাকে সেটি নিজের বলে মেনে নিতে হবে, যদিও আমি অত্যন্ত সাবধান? আমার তো প্রমাণ করার কোনো ইচ্ছে হবে না যে ওই ছানাটির জন্যে আমি দায়ী নই, অন্য কেউ দায়ী। ছানাটি দেখে এমনও হতে পারে যে আমার ভালো লেগে যাবে, আমার খুব মায়া হবে, অনেক দিন পর একটি বাচ্চার মাংসের ছোঁয়া পেয়ে। আমার ত্বক শিউরে উঠবে, তখন নৃতাত্ত্বিক আর ফিরোজা আমাকে নিয়ে হাসবে। অন্য রকমও হতে পারে, ফিরোজা রক্ত দেখতে না পেয়ে ভয় পেয়ে অবতারটির কাছে ছুটে যেতে পারে, তাকে বিয়ে করার জন্যে কান্নাকাটি করতে পারে, তখন অবতারটি। ফিরোজাকে নাও চিনতে পারে; এবং হতাশ ফিরোজা একটি আত্মহত্যার উদ্যোগ নিতে পারে, সে সফল হতে পারে, ব্যর্থও হতে পারে। তখন দোষ হবে আমার, মানবতাবাদীরা সবাই চিৎকার করে বলবে আমার পীড়ন সহ্য করতে না

পেরেই ফিরোজা ট্রাকের বা ট্রেনের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়েছে; আমার মতো পাষণ্ড দ্বিতীয়টি আর হয় না। রগরগে সাংবাদিকগুলো খুঁজে বের করবে যে আমি একটি অত্যন্ত লম্পট পুরুষ, নারী থেকে নারীতে ছুটে বেড়ানোই আমার কাজ, আমার এক ডজন উপপত্নী রয়েছে, আর সে-শোকেই ফিরোজা আত্মহত্যা করেছে। আমি কি ফিরোজাকে পরামর্শ দেবো সে যা-ই করুক প্রতিরোধের ব্যবস্থাটি যেনো গ্রহণ করে? তবে ফিরোজা যদি আসলেই ঘুমোয় বালকটির সাথে, আর আমি যদি তা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি, আমার কেমন লাগবে? ...

ফিরোজাকে সন্ধ্যার একটু পরে ধানমণ্ডি আট নম্বরসড়কে দেখতে পাবো আমি ভাবি নি; আমার ধারণা ছিলো সে অর্চির সাথে অংকের মাস্টারের বাসায় আছে; অর্চি অংক শিখছে, ফিরোজা আর দশজন দায়িত্বশীল মাতার মতো মাস্টারের অপেক্ষাগারে বসে হিন্দি ছবি দেখে জীবন সার্থক করছে। দায়িত্বশীল মাতাদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা না করলে ব্যবসা জমবে না, এটা আজকাল মহৎ মাস্টার দোকানদাররাও বোঝে, আমি। শুনেছিলাম ফিরোজা বিকেলে সেখানেই থাকে, অংক শেষ হলে অর্চিকে নিয়ে বাড়ি ফেরে। গর্ভবতী হওয়ার কী সুখাবহ পরিণাম। আমি দেখলাম ফিরোজার গাড়িটি। আটনম্বর সড়কের একটি বাড়ি থেকে দ্রুত বেরোলো, হয়তো একটু পরেই অংককষা। শেষ হবে অর্চির, শেষ হওয়ার আগেই সে গিয়ে অপেক্ষাগারে বসবে, অর্চি বেরিয়ে। দেখবে মা বসে আছে। সে বুঝতে পারবে না তার জননী ধামণ্ডির আটনম্বর সড়কে একটু ভ্রমণে গিয়েছিলো। আমি যে এ-সময় এ-পথ দিয়ে যাবো ফিরোজা ভাবে নি; আমি ড্রাইভারকে দ্রুত গাড়ি চালাতে বলতে পারি, গিয়ে উঠতে পারি অর্চির অংকের মাস্টারের বাসায়, কিন্তু আমি তা করবো না; তা ছাড়া অংকের মাস্টারের বাসাটা কোন দোজগে তা আমি জানি না। এ-সড়কে ফিরোজার কোনো আত্মীয় আছে বলে আমি শুনি নি, তবে কোনো পরমাত্মীয় থাকতে পারে, যার ঠিকানা আমি জানি

না। নৃতাত্ত্বিক অবতারটি কি এখানে থাকে? অর্চি যখন অংক শেখে তখন কি ফিরোজা নৃতত্ত্ব শেখে? দুজনের ঘনিষ্ঠ একান্ত নগ্ন নৃতত্ত্ব? আমি ভালো করে ফিরোজাকে দেখতে পাই নি, তার চুলের অবস্থা বা শাড়ির ভাজ দেখতে পাই নি, পেলে আমি একটা ধারণা করতে। পারতাম তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে; হয়তো তাও পারতাম না। আমি রক্তের উষ্ণতা টের পাই আমার, কিন্তু বেশি উষ্ণ হতে দিই না; অবতারটির যদি একটা বউ থাকতো আমি কিছুটা প্রতিশোধ নিতে পারতাম, পারার কথা ভাবতাম। ফিরোজাকে যে আমি আটনম্বর সড়কে দেখেছি, তাও আমি বলবো না, অন্তত আজই বলবো না, বললে নিজেকে আমার ছোটো মনে হবে, নিজেকেই আমি ঘৃণা করবো।

ফিরোজা ঘুমিয়েই থাকে যদি বালকটির সাথে আমি কেনো উত্তেজিত হবো (আমি একটু উত্তেজিত), কেনো আমার রক্ত বলক দিয়ে উঠবে (আমার রক্ত একটু ফুটছে), পায়ের নিচের মাটি কাঁপতে থাকবে (একটু কাঁপছে)? আমি কি ঘুমোই না অন্য নারীর সাথে? আমি কি দু-গোলার্ধের নারীশরীরসংস্থান জানি না? আমি কি ব্যাংকক, তোকিও, লন্ডন, নিউইঅর্ক, মাদ্রজ যাই নি? আমি কি মঙ্গোলীয় মসৃণতা, জাপানি গন্ধ, শ্যামদেশীয় বর্তুলতা, মার্কিন মুখমন্দারতা, কৃষ্ণাঙ্গিনী পেশলতা, আর তামিলিনী কৃষ্ণ আগুনের স্বাদ পাই নি; এবং পাই নি মাহমুদা রহমান আর দেবীর শরীরের প্রসাদ? আর রওশনের স্বর্গখণ্ড? আমি যখন আমার জীবনের দিকে তাকাই ব্যাংকের হিশেব, উত্তরার। বাড়ি, নদীর ওপর ব্রিজগুলোর কথা মনে পড়ে না, ঝিলিক দিতে থাকে ওই সব শরীর, ওই সব জ্যোতির্ময় বাঁক উচ্চতা গভীরতা, ওই সব হিরণয় অবসাদ, যা আমাকে সুখে আনন্দে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। আমি জানি সবই নিরর্থক, ওই ব্রিজ নিরর্থক, সূর্য। নিরর্থক, সব কাঠামোই ধসে পড়বে, আমি মাটিতে মিশে যাবো, মাটি শূন্যতায় মিশে যাবে। এর মাঝে অর্থপূর্ণ হচ্ছে ওই সব জ্যোতির টুকরোগুলো। আমার ইন্দ্রিয়গুলো। প্রখর, আমার কোনো একটি ইন্দ্রিয়

মাত্র একটি কাজ করে না, প্রত্যেকটি অসংখ্য কাজ করে, আমি করতে শেখাই। চোখ দিয়ে আমি শুধু দেখি না, চোখ দিয়ে আমি ছুঁই, চোখ দিয়ে আমি খাই, পান করি, এমনকি চোখ দিয়ে আমি মিলন করি। নিরর্থক। এভাবে আমার কাছে হয়ে ওঠে অর্থপূর্ণ। ফিরোজা অন্য কারো সাথে মিলিত হলে আমি কাপবো কেনো? সে আমার স্ত্রী বলে? তার দেহের ওপর আমার সমস্ত অধিকার বলে, তার সমস্ত বাক সমস্ত রন্ধ্র আমার বলে? সেখানে অন্য কেউ হাত দিলে আমার পুরুষতায় আঘাত লাগে বলে? কিন্তু আমি কি কপি না?

আশ্চর্য, বিস্মিত হই আমি, ওই সন্ধ্যায় ফিরোজাকে আমার বেশি আকর্ষণীয়, বেশি আবেদনময় মনে হয়। আমাকে হঠাৎ বাসায় দেখতে পেয়ে প্রথম একটু বিচলিত হয়। সে, কিন্তু জ্বলজ্বল করতে থাকে, মনে হয় ফিরোজার ভেতরে কোনো তীব্র আলো ঢুকেছে, যা তার ত্বক ভেদ করে ছড়িয়ে পড়তে চাচ্ছে। এখন আমি আটনম্বর সড়কের কথা তুললে সমস্ত আলো নিভে যাবে, অন্ধকার নেমে আসবে, তার মাংস আর আত্মা কালো হয়ে উঠবে। কালো হয়ে উঠবে আমার মাংসও। ফিরোজকে বেশ চঞ্চল মনে হয়, সে বাতাসে ভাসছে; একটি বালক তাকে একটি লাল নীল বেলুনের মতো বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে।

তোমাকে আজ ঝলমলে মনে হচ্ছে, আমি বলি।

তাহলে তুমিও আমার দিকে তাকাও? ফিরোজা বলে, তাকানোর উপযুক্ত মনে করো!

সবাই আজ তোমার দিকে নিশ্চয়ই খুব বেশি করে তাকিয়েছে, আমি বলি।

তাকাক, তাদের ভালো লাগলে লাগুক, ফিরোজা বলে, কারো যদি ভালো লেগে থাকে আমার তাতে আপত্তি নেই।

আমি আপত্তির কথা বলি নি, আমি বলি, তাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।

তোমার অভিযোগের কী আছে? ফিরোজা বলে, আর আমার দিকে তির্যক চোখে তাকায়। ফিরোজা সম্ভবত আমার চোখে ঈর্ষা দেখতে চায়।

আমি আর কোনো কথা বলি না, আলো নিভিয়ে দিই; ফিরোজা বিস্মিত হয়। আমি তাকে টেনে এনে জোর করি, এমন জোর কখনো করি নি, কখনো করবো ভাবি নি; কিন্তু জোর করতে আমার আশ্চর্য ভালো লাগে। ফিরোজা প্রথম বাধা দিতে চেষ্টা করে, নখ দিয়ে খামচি দেবে বলে মনে হয়, কিন্তু সে অবিলম্বে সাড়া দিতে থাকে, আমি অবাক হই। আমার আজকের আচরণ সম্পূর্ণ অপরিচিত আমার, ফিরোজার তো অবশ্যই; আমার অদ্ভুত লাগতে থাকে যে ফিরোজা আমার প্রতিটি নতুন উদ্যোগে প্রথম একটু বাধা দিয়ে তারপরই উপভোগ করতে থাকে। আমি রক্তের স্বাদ টের পাই, লবণাক্ত স্বাদ; মানুষের রক্তের আশ্চর্য স্বাদ রয়েছে; বিভিন্ন স্থানের রক্ত বিভিন্ন রকম মনে হয় আমার। আমি এমন সব পথে যাত্রা করতে থাকি যে-পথে কখনো ভ্রমণ করি নি, ফিরোজা প্রথম বাধা দেয়, কিন্তু আমার জোর-ভ্রমণ তার কাছে চমৎকার লাগতে থাকে। দুর্গম দুরূহ দুস্তর পথ, আমি খুঁড়িয়ে চলি, গড়িয়ে চলি, দস্যুর মতো চলি। আমি ফিরোজাকে চিনতে পারি না, মনে হতে থাকে আমি ফিরোজার সাথে নেই, কোনো ক্রীতদাসীর সাথে আছি; কালো, অন্ধকারের মতো কালো, আগুনের মতো প্রচণ্ড ক্রীতদাসী, যাকে হনন করার সমস্ত অধিকার আমার রয়েছে। আমি হনন করতে থাকি, ফিরোজা হননে আনন্দ পেতে থাকে, ক্রীতদাসীর কণ্ঠের রক্তের মাংসের

শব্দে গন্ধে রঙে আমার অন্ধকার পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে; আদিম অন্ধকারে আমরা আর বিধিবদ্ধ কাঠামোয় আটকে থাকি না, রক্তাক্ত গলিত উদ্বেলিত পাপবিদ্ধ সুখমৃত প্রভুদাসী হয়ে। উঠি।

আমাদের খালে বাঁশের পুল, মাঠের পথে ডোবার ওপর ভেঙে পড়া কাঁঠাল গাছ, পাথরের গাঁথনি সেতু, দো-আঁশলা গাঁথনি সেতু, প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট, স্টিল ট্রাসেড, ক্যান্টিলিভার সেতু, ঝুলন্ত সেতু, ধারাবাহিক সেতু, খিলান সেতু, পিয়ার, ওপরকাঠামো, অবকাঠামো, পিলপায়া, রওশন, ফিরোজা, মাহমুদা রহমান, আমি, দেবী, বাঁশের পুল, ভেঙে পড়া কাঁঠাল গাছ, পাথরের গাঁথনি, দো-আঁশলা গাঁথনি, ঝুলন্ত, প্রিস্ট্রেসড, খিলান, ক্যান্টিলিভার, কিন্তু আমি কোনো সেতু দেখছি না, আমার সাথে আর কারো কোনো ব্রিজ তৈরি হয় নি, আমি সেতু বাঁধতে পারি নি, কেউ পারে না। মাহমুদা রহমানের বাসায় কয়েক দিন যাই নি, তিনিও এখন দশটা বাজলেই বেজে ওঠেন না; আমি কোনো কোনো দিন ফোন করেছি, অনেকক্ষণ ধরে বাজে, তিনি ধরেন না। বাইরে তাঁর কাজ পড়েছে হয়তো, না কি বাসায় থেকেও ওই সময়ে ফোন ধরেন না, ফোন তাকে বিরক্ত করে। আমি সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবো, নিতে ইচ্ছে করছে আমার; আর মাহমুদা রহমান নয়, দেবী নয়, ফিরোজাও নয়, আমি একা, সম্পূর্ণ একা। আমি বোধ করি আমার সময় বড়ো বেশি বেড়ে গেছে, একঘণ্টা আর ষাট মিনিট নেই, হাজার হাজার মিনিট হয়ে উঠেছে, আমার ওই সময়টা ভরে রাখার মতো কোনো সম্পদ নেই। জীবন আরো নিরর্থক আরো শূন্য হয়ে উঠেছে। আমি যদি আরো তিরিশ বছর বেঁচে থাকি, আমার ভয় লাগতে থাকে, তাহলে এতোগুলো বছর আমি বহন করবো কীভাবে? আমার যা কাজ তা শেষ করে আমি আর কিছু খুঁজে পাই না। মাহমুদা রহমানের কাছে যাচ্ছি না, যাবো না; কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আমার তাকেই মনে পড়ছে, আমার এখন পান। করতে ইচ্ছে করছে। আমি বেরিয়ে পড়ি, পাঁচতারা

হোটেলটিতে গিয়ে পান করি, পান করতে করতে আমার আরো বেশি মাহমুদা রহমানকে মনে পড়ে; তাঁকে টেলিফোন, করবো না, কিন্তু পানের টেবিলেই যদি একটি টেলিফোন থাকতো তাহলে এখনি তাঁকে ফোন করতাম। পান করতে করতে আমার ক্ষোভটা কেটে যায়, পান করলে আমি অনেক বেশি সরল হয়ে উঠি, দেবতা হয়ে উঠি, মানুষের ঘৃণা ক্ষোভ পাপগুলো থাকে না, আমি শেষ করে উঠে দাঁড়াই। মাহমুদা রহমানকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে ছুঁতে ইচ্ছে করছে; এতো বেশি আর কখনো দেখতে আর ছুঁতে ইচ্ছে করে নি।

৬. মাহমুদা রহমানের বাসায় গিয়ে

মাহমুদা রহমানের বাসায় গিয়ে আমি কলিংবেল বাজাই; আমি নিজেই অবাক হই। এখানে আমার আসার কথা ছিলো না, আমি আসতে চাই নি, ইচ্ছে ছিলো ব্রিজ দেখতে যাবো, কাজ কেমন হচ্ছে দেখবো বা নদী দেখবো; তার বদলে আমি মাহমুদা রহমানের ফ্ল্যাটের কলিংবেলে আঙুল রেখে দু-বার চাপ দিই। আমি মাতাল হই নি, কখনো হই না, অতোটা আমি কখনোই খাই না; শুধু একটু গন্ধ ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না একটু আগে আমি পান করেছি। মাহমুদা রহমান আমাকে দেখে অবাক হন, বিব্রতও হন; আমি বুঝতে পারি তিনি বিব্রত, তাতে আমি অবাক হই; এ-সময়ে আমাকে দেখে তার শুধুই অবাক হওয়ার কথা ছিলো, বিব্রত হওয়ার কথা ছিলো না। অন্য দিন হলে তিনি আমাকে সরাসরি শয্যাকক্ষে নিয়ে যেতেন, সেটাই আরামদায়ক ও অন্তরঙ্গ, আজ ড্রয়িংরুমে ঢুকতে হলো তাঁর সাথে, ঢুকে আমি একটু আহত হলাম সেখানে যুগ্ম জিল্লুর রহমানকে দেখতে পেয়ে। আমি জানি না তিনি জিল্লুর রহমান কি না, তিনি যুগ্মসচিব, কি না, মাহমুদা রহমান তাঁর এ-পরিচয়ই দিলেন; পরিচয়টি ঠিকই হবে, আমার কাছে তাঁকে লুকোতে চান নি মাহমুদা রহমান, আমার যে-পরিচয় দিলেন তাঁর কাছে, সেটা ঠিকই। যুগ্ম শব্দটি সব সময়ই আমার অদ্ভুত কিম্ভুত লাগে, প্রথম যখন পেয়েছিলাম তখন থেকেই, শব্দটি শুনলেই লেগে থাকার গেথে থাকার সেঁটে থাকার ভাব মনে। আসে, আর আমি দু-একটি যুগু দেখেছি, সেগুলো অদ্ভুতভাবে লেগে থাকতে গেঁথে থাকতে পারে; আমি বুঝতে পারি এ-যুগটি লেগে আছেন গেঁথে আছেন মাহমুদা রহমানের পশ্চাতে। তার কোনো উপসচিবের বাসায় থাকার কথা ছিলো, তিনি এখন। মাহমুদা রহমানের বাসায়। আজই কি তিনি প্রথম মাহমুদা রহমানের যুগ্ম হয়েছেন? না কি কয়েক দিন ধরেই হয়েছেন, আসছেন? তিনি খুব টানটান হয়ে আছেন, তার সারা দেহখানি দাঁড়িয়ে আছে; কোনো শিথিলতা ক্লান্তি নেই তাঁর শরীরে

চোখেমুখে, মনে। হচ্ছে এখনি ফেটে পড়বেন; তাহলে তিনি লেগে থাকার পুরস্কার পান নি এখনো। আমি কি চলে যাবো, তাঁদের কথা আর কাজে অসুবিধা হচ্ছে সম্ভবত, আমি কি চলে যাবো? মাহমুদা রহমান আমাদের দুজনকে নিয়ে কী করবেন? একটি যুগ আরেকটি ক্যান্টিলিভার তার একসাথে দরকার পড়বে না। মাহমুদা রহমানই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার ভার নিলেন, তিনি আমাকে এখনো পরিত্যাগ করেন নি।

তিনি বললেন, আপনাকে কয়েক দিন ধরেই ফোন করছি (সত্য নয়), পাচ্ছি না (সত্য নয়), আপনাকে আমার খুব দরকার (হয়তো সত্য নয়)।

আমি কী বলব, বলবো কি আমি ঢাকায় ছিলাম না, তাই পান নি; আমি তা বলতে পারি না, কী বলতে হবে বুঝতে পারি না, শুধু বলি, আজ আমি যাই, আরেক দিন আসবো।

মাহমুদা রহমান আরো বিব্রত হয়ে পড়েন, আমার চলে যাওয়া সুন্দর দেখাবে না বলে আমার মনে হয়, এবং তারও মনে হয় বলে আমার মনে হয়।

তিনি বলেন, আপনাকে আমার খুব দরকার (সত্য নয়), দয়া করে একটু বসুন।

তিনি এভাবে কথা বলছেন কেনো? আমি চলে গেলে তার কী আসে যায়?

আমি মাহমুদা রহমানের দিকে তাকাই, আমার মনে পড়ে কিছুক্ষণ আগে তাঁকে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে করছিলো, ছুঁতেও খুব ইচ্ছে করছিলো; এখন আমার কিছুই ইচ্ছে করছে না, দেখতেও ইচ্ছে করছে না, ছুঁতেও না; পান করার সময় তাকে আমার কবুতর মেঘ

টুনটুনি জলপাই মনে হচ্ছিলো, এখন তাকে মিসেস রহমান মনে হচ্ছে, যাকে দেখার কিছু নেই হেয়ার কিছু নেই। যুগ্মটি সম্ভবত বুঝতে পেরেছেন আজ আর কোনো কাজ হবে না, একটা বাজে গ্রহ দেখা দিয়েছে; তিনি উঠে দাঁড়ান, ভাবীকে আশ্বাস দিতে থাকেন শিগগিরই আবার আসবেন, তাঁর আজ অনেক কাজ, নইলে আরো কিছুক্ষণ থাকতেন; মাহমুদা রহমান তাঁকে দরোজা পর্যন্ত দিয়ে আসেন। আমি মাহমুদা রহমানকে আবার দেখি, তাকে আমার কবুতর মনে হয় না মেঘ মনে হয় না টুনটুনি। মনে হয় না জলপাই মনে হয় না, তাঁকে দেখার কিছু নেই হেয়ার কিছু নেই। তিনি হয়তো আমার চোখ দেখে তা বুঝতে পারেন, তাকে এতো অসহায় দেখাতে থাকে যে এবং এমন অসহায়ভাবে আমার পাশে এসে বসেন যে আমার মায়া হয়। তাঁর মুখটি। অত্যন্ত ছোটো দেখায়, তাতে রক্ত নেই বলে মনে হয়।

তিনি বলেন, যুগ্মসচিব আমাকে বিয়ে করতে চান, পরিচয়ের পর থেকেই প্রস্তাব দিচ্ছেন, আংটিও কিনেছেন, বিয়ের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছেন।

আমি তার মুখের দিকে তাকাই, কিছু বলি না।

তিনি বলেন, প্রথম দিন থেকেই আমার রূপের খুব প্রশংসা করছেন, বাহু গাল ঠোঁটও বাদ দিচ্ছেন না, দ্রতা করে হয়তো বুকটাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন, খুব শুতে চেয়েছিলেন, আমি রাজি হই নি; এখন বিয়ে করেই শুতে চান।

আমি বলি, প্রেম ও ধর্ম দুটিই কাজে লাগাতে চান, যেটিতে কাজ হয়। আমাদের আমলারা বেশ নীতিপরায়ণ পরহেজগার মানুষ, এখনো বিয়েশাদিতে তারা বিশ্বাস হারান নি।

তিনি বলেন, দ্রলোকের বউ অতিরিক্ত সচিবের সাথে পালিয়েছে কয়েক মাস আগে। শোকেদুঃখেঅপমানে কাতর হয়ে আছেন, আমাকে বিছানায় তুলে শোকদুঃখঅপমান ভুলতে চান।

আমি বলি, তার কোনো উপসচিব নেই?

তিনি বলেন, তা আমি জানতে চাই নি। আমি তাঁকে একটি অবিবাহিত মেয়ে বিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছিলাম, চারপাশে মেয়েগুলো বিয়ে করতে না পেরে শুকিয়ে মরছে, এমএ পাশ মেয়েগুলো রিয়াদের ঝাড়ুদার বিয়ে করছে, কিন্তু তিনি অবিবাহিত মেয়ে। বিয়ে করতে চান না, বিধবা বিয়েও করতে চান না, কারো বউ ভাগিয়ে বিয়ে করতে চান মনে হয়।

আমি বলি, কারো বউ ভাগিয়ে বিয়ে করায় গৌরব আছে, আর তাতে দ্রুত পদোন্নতি হয়।

তিনি বলেন, আমার একটি স্বামী আছে, একটি উপপতি আছে, আমি কেনো তাঁকে বিয়ে করতে যাবো। আমি আমার ধরনে সৎ থাকতে চাই।

মাহমুদা রহমান তার বাচ্চাদের ইস্কুল থেকে আনতে যাবেন, তার শুধু প্রেম করলে চলে না, শুধু নিজের শরীরের কথা ভাবলে চলে না, শরীরের ভেতর থেকে যাদের বের করেছেন তাদের কথাও ভাবতে হয়। আমার এসব ভাবতে হয় না, ফিরোজা ভাবছে। এসব। ফিরোজা যদি এখন নৃতাত্ত্বিকটির সাথে থাকে, সেও এখন উঠছে, তার পক্ষেও আর নৃতত্ত্ব চর্চা সম্ভব হচ্ছে না, শরীরের ভেতর থেকে যাকে বের করেছে তার কথা ভাবতে হচ্ছে। ফিরোজও নিজের ধরনে সৎ থাকছে; কিন্তু আমি কি সৎ থাকছি আমার নিজের ধরনে?

সততা কাকে বলে আমি বুঝতে পারছি না, কারো প্রতি একনিষ্ঠ থাকাই কি সততা? দুজনের প্রতি একনিষ্ঠ থাকা সততা নয়? তিনজনের প্রতি একনিষ্ঠ থাকা। সততা নয়? আমি বুঝি না। আমি ব্রিজের দিকে বেরিয়ে যাই, ব্রিজ দেখি, নদী দেখি; বিকেলে অফিস শেষ হওয়ার একটু আগে অফিসে ফিরি, দেখি আমার ব্যক্তিগত সহকারিণী খুব উদ্বেগের মধ্যে আছে, আমাকে দেখে সে আলোকিত হয়ে ওঠে। বেশি দিন হয় নি সে আমার ব্যক্তিগত সহকারিণী হয়েছে, ভালো করে দেখিও নি, আজ দেখে মনে হয় সে একটা ছোটোখাটো আগুন লাগাতে পারে, আমাকে ঘিরেও তা লাগতে পারে। তার এ-জ্বলে ওঠার মধ্যেই আমি একটা বিপথে ছুটে যাওয়া আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পাই।

সে বলে, স্যার, যা উদ্বেগের মধ্যে ছিলাম; কোথায় গেলেন কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না।

মেয়েটি উদ্বেগ উচ্চারণ করতে পারে, অর্থ বোঝে! তার কথা শুনে আমার বেশ। ভালোই লাগে, তার কণ্ঠস্বরে একটা কবুতরের ওড়ার আর পাখা ঝাঁপটানোর শব্দ আছে, আমার ভালো লাগে, তবে আমার জন্যে উদ্বেগবোধের অধিকার তাকে এতো তাড়াতাড়ি কী করে দিই।

আমি বলি, উদ্বেগবোধ কি আপনার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে? আমাকে নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে থাকার জন্যে সম্ভবত আপনাকে নিয়োগ করা হয় নি।

মেয়েটি নিষ্প্রভ হয়ে যায়, মাথা নিচু করে থাকে; বলে, আমার ভুল হয়ে গেছে, স্যার।

আমার আবার ভালো লাগে, অনেক দিন ধরে আমার সাথে কেউ বিনয়ের সাথে কথা বলে নি, তোষামোদের ভঙ্গিতে অনেকেই বলে, আমি মেয়েটির কণ্ঠস্বরে একটা ভীত দোয়েলের গলা শুনতে পাই, ডালিমগাছের ডাল থেকে এইমাত্র একটা দোয়েল। উড়ে গেলো। কিন্তু মেয়েটিকে এতোটা অপ্রস্তুত করে দেয়া ঠিক হয় নি, রাতে হয়তো ঘুমোতে পারবে না; বিবাহিত হলে বা বয়ফ্রেন্ড থাকলে আজ কিছু করতে পারবে না। আমার সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা হয়ে যাবে, কোনো দিন যদি আমাকে চুমোও খায় তাহলেও এটা তার ওপর ছায়া ফেলবে। ঠিক আছে ছায়া ফেলুক, আমি না হয় কারো। কারো ঠোঁটের ওপর রাহুর ছায়াই হয়ে থাকবো।

আমি তাকে বলি, ঠিক আছে, আর তো উদ্বেগের কারণ নেই আপনার, আমি এসে গেছি, অফিসও ছুটি হয়ে গেছে, আপনি বাড়ি যান।

মেয়েটি বেরিয়ে যায়, তার বেরিয়ে যাওয়া দেখতে আমার ভালো লাগে।

অর্চির সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে, ফোন করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু ভয় লাগছে; অর্চি কি খুশি হবে আমার ফোন পেয়ে?

অর্চি হয়তো আমার গলা চেনে না, ফোনে ওর সাথে কথাই হয় না, আমার গলা ও নাও চিনতে পারে।

অর্চি, আমি বলি, অর্চি, আমি আব্বু।

অর্চি বলে, আব্ব? তুমি? এ-সময়? গম্ভীর হতাশা আর বিরক্তির স্বর ভেসে আসতে থাকে মহাজগতের দশ দিক থেকে।

তোমার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করলো, আমি বলি, অনেক দিন কথা বলি নি।

অর্চি বলে, আহ, আব্ব, তোমার সাথে কথা বলার মতো সময় আমার আছে, বলো! আমি ভাবলাম কোনো বন্ধু ফোন করেছে।

আমি বলি, তুমি কী নিয়ে এতো ব্যস্ত, অর্চি?

অর্চি বলে, তুমি বুঝবে না আব্ব, আর আমার অকাজে কথাই বলতে ইচ্ছে করে না, আমার ঘেন্না লাগে।

আমি বলি, বন্ধুদের সাথে তুমি কি শুধু কাজের কথাই বলো?

অর্চি বলে, কাজের কথাই বলি, আমি প্রেমট্রেমের কথা বলি না আব্ব, আমরা। কয়েক বন্ধু স্টেটসে চলে যাবো, নানা জায়গায় চিঠি লিখছি সে-কথাই বলি।

আমি বলি, আমাকে তো কখনো বলে নি।

অর্চি বলে, বলার কিছুই নেই, যখন যাবো তখন বলবো ভেবেছিলাম, তবে আজ তোমাকে বলে ফেললাম।

আমি বলি, ফেইভরেবল চিঠিপত্র কি পাচ্ছো?

অর্চি বলে, বেশ তো পাচ্ছি, শুধু মাধ্যমিকটার জন্যেই কিছু করতে পারছি না; পরীক্ষাটা হয়ে গেলে বাঁচি।

আমি বলি, তুমি তাহলে চলে যাবে?

অর্চি বলে, আলু, তুমি এখনি কাঁদতে শুরু কোরো না। আমি আজই যাচ্ছি না।

আমি কথা বলতে চাই, অর্চি বলে, রাখি, আলু, রাখি। অর্চি টেলিফোন রেখে দেয়।

আমি একটা শূন্যতা বোধ করি। এমন নয় অর্চিকে আমি প্রতিদিন বুকে জড়িয়ে ধরি, আদর করে কপালে চুমো খাই, ঘুম পাড়াই; এমন নয় ও আমার কন্যা বলে। আমি একটা গুরুগম্ভীর পিতৃত্বের বোধের মধ্যে থাকি, আমি যে ওর পিতা আমার মনেই থাকে না, কিন্তু ও হয়তো আমার ভেতরে কোথাও রয়েছে, আর থাকবে না। আমি ওর ভেতরে নেই, ফিরোজাও ওর ভেতরে নেই, কেউ ওর ভেতরে নেই। অর্চি কেন্দ্রে আছে। আরো কেন্দ্রে চলে যেতে চায়, চলে যাবে; আমি বাধা দিতে পারবো না। কিন্তু আমার শূন্যতা আমাকে বইতে হবে, কেউ জানবে না আমি পাথরের থেকেও ভারী একটি শূন্যতা বয়ে চলছি।

ফিরোজা বেশ চাঞ্চল্যের মধ্যে আছে, এত চাঞ্চল্যে আছে যে আমার সাথেও সারাক্ষণ কথা বলতে চায়, এমন সব কথা যা আগে কখনো বলে নি, কিন্তু এখন বলার জন্যে ব্যর্থ।

কোথা থেকে উৎসারিত হচ্ছে ফিরোজার ঝরনাধারা? আমি তার উৎস নই, আমি তাকে ঝিরঝির কলকল করে বহাচ্ছি না, আমি তাকে বাতাসে পালকের মতো। ওড়াচ্ছি না, কিন্তু ফিরোজা বইছে উড়ছে।

আমি টিভির দিকে তাকিয়ে আছি, প্রাণভরে একগাদা ন্যাংটো মেয়ে দেখছি, কতোটা ন্যাংটো হতে পারে দেখছি, শিল্পকলা কতোটা ন্যাংটো হতে পারে দেখছি, ন্যাংটো কতোটা শিল্পকলা হতে পারে দেখছি; ন্যাংটো, শিল্পকলা, মেয়ে দেখছি; শিল্পকলা, মেয়ে, ন্যাংটো দেখছি; মেয়ে, ন্যাংটো, শিল্পকলা দেখছি, আমি দেখছি ন্যাংটো ন্যাংটো ন্যাংটো, আমি দেখছি শিল্পকলা শিল্পকলা শিল্পকলা, আমি দেখছি মেয়ে মেয়ে মেয়ে; ফিরোজা তখন এসে পাশে বসে।

এসব দেখতেই তোমার ভালো লাগে, ফিরোজা বলে। আমাকে একটা বড়ো অপবাদ দেয়ার জন্যে কথাটি বলে নি, আমি বুঝি, একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় বেছে নিয়েই সে কথা শুরু করতে চেয়েছে।

আমার সময় চায় আমি এসব দেখি, আমি বলি, আমার সময় চায় আমি এসবের মর্ম উপলব্ধি করি, আমি আমার সময়ের দাবি পূরণ করছি।

ফিরোজা বিব্রত হয়, এসব নিয়ে আর তর্ক করতে চায় না; এক্সএক্সএক্স সেও উপভোগ করে মাঝেমাঝে, এখন সে অন্য কিছু নিয়ে কথা বলতে চায়।

সেদিন তুমি অদ্ভুত আচরণ করেছে, ফিরোজা অর্থপূর্ণভাবে তাকিয়ে বলে, আমার মনে হচ্ছিলো তুমি...। ফিরোজা আর এগোয় না।

আমি বলি, তোমার কী মনে হচ্ছিলো?

ফিরোজা বলে, তুমি আমাকে রেইপ করছে।

আমি বলি, তাহলে তোমার উচিত ছিলো চিৎকার করে ওঠা, যাতে পাশের বাড়ির সবাই জেগে উঠে তোমাকে রক্ষা করতে আসতে পারতো, তোমার কর্তব্য ছিলো আমার মুখে নখ বসিয়ে দেয়া; প্রমাণ থাকতো।

ফিরোজা বলে, কিন্তু তুমি আমাকে পীড়ন করতে চেয়েছিলো তাতে সন্দেহ নেই।

আমি বলি, কিন্তু তুমি পীড়ন উপভোগ করলে কেনো?

ফিরোজা বলে, মনে হলো প্রতিরোধ করতে যেহেতু পারবো না তখন উপভোগ করাই ভালো।

আমি বলি, সত্যিই কি তোমার মনে হয় আমি তোমাকে পীড়ন করতে চেয়েছিলাম?

ফিরোজা বলে, হ্যাঁ, আমি আজো ঠিক মতো হাঁটতে পারি না।

আমি বলি, আমি দুঃখিত, সচেতনভাবে আমি অমন কিছু করতে চাই নি।

ফিরোজা বলে, তাহলে অসচেতনভাবে করতে চেয়েছিলে।

আমি বলি, হয়তো তা হবে, তার জন্যেও আমি দুঃখিত।

ফিরোজা বলে, আমার ভয় হয় অসচেতনভাবে তুমি কোনো দিন আমাকে কিছু একটা করে ফেলতে পারো।

আমি বলি, তুমি কি খুন বোঝাচ্ছো?

ফিরোজা বলে, হ্যাঁ, ও রকমই কিছু একটা।

আমি বলি, আমি কি এতটা ভয়ঙ্কর মানুষ?

ফিরোজা বলে, আমার মনে হয় এরপর সাবধান হতে হবে, খুন না করলেও আমাকে তুমি বিকলাঙ্গ করে দিতে পারো।

আমি বলি, তুমি কি এখন বিকলাঙ্গ বোধ করছো?

ফিরোজা কোনো কথা বলে না, হয়তো সে সত্যিই বিকলাঙ্গ বোধ করছে; আমি তার কোনো খবর নিই নি, দরকার পড়ে নি, ফিরোজার হয়তো দরকার পড়েছে। ফিরোজা কি তার

অঙ্গ ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছে এর মাঝে, এবং ব্যর্থ হয়েছে। বিকলাঙ্গতার জন্যে কি তার দুটি তিনটি লাল লাল বিকেল অপচয় হয়ে গেছে, যার চম কার ব্যবহার তারা চেয়েছিলো? নৃতাত্ত্বিকটিকে মনে পড়ে আমার। আমি কিছুটা তাপ বোধ করি।

আমি বলি, তুমি কি পরখ করে দেখেছো কোথাও?

ফিরোজা উত্তেজিত হয়ে বলে, সবাইকে নিজের মতো মনে কোরো না।

ফিরোজা এখন নিজেকে দেবী আর আমাকে পিশাচ ভাবছে; শুধু ভাবছে না নিজেকে দেবীর সিংহাসনে বসাচ্ছে, আমাকে নামিয়ে দিচ্ছে পিশাচপাতালে; সে আমার মতো নয়, সে পবিত্র, তার শরীর পবিত্র, আমিই শুধু অপবিত্র, পিশাচের শরীর আমার। আমি কি বলবো যে ধানমণ্ডির আটনম্বর সড়কে সেদিন সন্ধ্যায় তাকে আমি দেখেছি, একটা। পাঁচতলা বাড়ির দরোজা দিয়ে তার গাড়ি বেরিয়ে এলো, আমি দেখলাম? বলবো কি আমি গাড়ির পেছনে ছুটতে পারতাম, কিন্তু আমি ছুটি নি? বলতে আমার ভালো লাগে না, কিন্তু ফিরোজা তাকিয়ে আছে আমার দিকে, আমি নিশ্চুপ হয়ে গেছি, আমি। পরাজিত হয়ে গেছি তার দেবীত্বের কাছে, সে তা উপভোগ করছে। কিন্তু দেবীটেবী দেখতে আমার ভালো লাগছে না।

তুমি মাঝেমাঝে ধানমণ্ডির আটনম্বর সড়কের একটি পাঁচতলা বাড়িতে যাও? আমি বলি।

ফিরোজা চমকে ওঠে, কোনো কথা বলে না।

আমি বলি, কোনো কথা বলছে না যে?

ফিরোজা বলে, যাই, কিন্তু আমি তোমার মতো নই; কাউকে দেহ দিতে আমি সেখানে যাই না।

আমি বলি, আমার মতো তুমি নও, তা জানি; আর তুমি সেখানে কাউকে দেহ দিতে যেতে না পারো, তবে কেউ তো তোমাকে দেহ দিতে পারে।

ফিরোজা কোনো কথা বলে না। ফিরোজা আমার থেকে শুদ্ধ, সব সময়ই; সে দেহ দেয় না, দেহকে সে অপূর্ব রীতিতে শুদ্ধ রাখে, পুরুষের সভ্যতা তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে; দেহ দিলেও সে অশুদ্ধ হবে না, দেহ সামান্য বস্তু, অসামান্য হচ্ছে মন হৃদয় আত্মা, সেগুলো সে দেবে না, পবিত্র রাখবে, আমার সে-শক্তি নেই, আমি পারি শুধু। অশুদ্ধ হতে। এ-মুহূর্তে আমাদের মধ্যে একটি সংঘর্ষ হয়ে যেতে পারতো, ওসব আমার ভালো লাগে না; আমি ফিরোজার দেহ নিয়ে উদ্বিগ্ন নই, দেহে আমি পবিত্রতা অপবিত্রতা কিছুই দেখি না, দেহ হচ্ছে দেহ, যা বিষাক্ত হতে পারে, মধুর হতে পারে, কঠিন হতে। পারে, গলতে পারে। দেহ আমার চোখে সুন্দর, আকর্ষণীর বস্তু, যদিও এখন ঘেন্নার বোধ জাগাচ্ছে আমার, তবু দেহের থেকে সুন্দর কিছু আমি দেখি নি। এ-দেহ শুধু মানুষের নয়, সব কিছুরই; বেড়ালের দেহের দিকে আমি সারা সকালবেলা তাকিয়ে থাকতে পারি, যেমন পারি ইঁদুরছানার দেহের দিকে তাকিয়ে থাকতে; ছেলেবেলায় আমি আমাদের শাদা গাভীটির দেহের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম, ঘুরতে ঘুরতে যে-ষাড়টি আমাদের গোয়ালের পাশে এসে হাঁক দিত, তার দেহের সৌন্দর্য তো অবর্ণনীয়। আমার যদি অমন একটি দেহ থাকতো, অমন অণ্ড অমন অজগর। মানুষের শরীর আমার চোখে সুন্দর, সবেচেয়ে সুন্দর নারীশরীর। আমি ওই সৌন্দর্যে বারবার মুগ্ধ হয়েছি, চিরকাল মুগ্ধ হবো; ওই শরীরের দিকে তাকিয়ে আমি

সৌন্দর্য বুঝেছি; ওই। শরীর ছোঁয়ার সাথে সাথেই আমি ভালোবাসতে পেরেছি, চিরকাল পিরবো; ওই অপূর্ব বস্তুকে ভালোবাসার জন্যে কোনো পূর্বভালোবাসার দরকার আমার কখনো পড়ে নি। আমি যাকে ঘেন্না করি, তার দেহকেও তীব্রভাবে ভালোবাসতে পারি; যেমন ফিরোজাকে আমার ঘেন্না লাগছে, কিন্তু তার দেহকে ঘেন্না লাগছে না; যদি ওই দেহের সাথে আজ রাতে আমি জড়িয়ে পড়ি, পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, তবে আমি তার প্রতিটি খণ্ডকে ভালোবাসতে পারবো। শরীরই আমার কাছে স্বর্গ আর নরক, আমি অবশ্য স্বর্গেটর্গে বিশ্বাস করি না; তবে শরীর আমাকে স্বর্গের অভিজ্ঞতা দিয়েছে, নরকের অভিজ্ঞতা দিয়েছে; শরীর আমাকে বেঁচে থাকার অমৃত দিয়েছে মৃত্যুর বিষও পান করিয়েছে। আর আমি শরীরের সীমাবদ্ধতায় সব সময়ই পীড়িত বোধ করেছি; আমি যতোটা উপলব্ধি। করতে চাই, আমি দেখেছি আমার শরীরের, আমার ইন্দ্রিয়গুলোর সে-শক্তি নেই; আমার শরীর আমার ইন্দ্রিয়গুলো খুবই সীমাবদ্ধ। আমার ওষ্ঠ একটি নির্দিষ্ট সীমার পর আর কাজ করে না, আর অনুভব করে না; আমি যখন ওষ্ঠ দিয়ে চরমতমকে উপলব্ধি করতে চাই, তখন ওষ্ঠ নির্বোধ ত্বকমাংসের সমষ্টি থেকে যায়; আমি যখন গভীর থেকে গভীর থেকে গভীরতমে পৌঁছে ভেঙে যেতে চাই ফেটে পড়তে চাই পরমতমকে ছুঁতে চাই, তখন আমি সীমাবদ্ধ একটি মাংসের ফলক রয়ে যাই। শরীর শরীর চায়, এবং একটি শরীর শুধু আরেকটি শরীর নিয়েই চিরকাল সজীব থাকতে পারে না, তার সীমাবদ্ধতা আরো বাড়তে থাকে; ওই অবস্থায় মরে যেতে থাকে, আর বেঁচে থাকার জন্যে ভিন্ন শরীরের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ফিরোজা ভিন্ন শরীর চায়, যদিও সে স্বীকার করছে না; আমার শরীরের থেকে নৃতাত্ত্বিকটির শরীর তার শরীরকে বেশি: আলোড়িত করছে এখন; যেমন ফিরোজার শরীরের থেকে দেবীর আর মাহমুদা রহমানের শরীর আমার শরীরকে বেশি আলোড়িত করে। শরীর পুরোনো হয়ে যায়, তা নতুন হয়ে উঠতে পারে নতুন শরীরের স্পর্শে; তা আমার ফিরোজার মাহমুদার দেবীর ও অন্য সবার জন্যেই সত্য, কারো জন্যেই মিথ্যে নয়।

সমাজ চায় শরীর পুরোনো হয়ে যাক, তার সজীবতা লুপ্ত হয়ে যাক, কিন্তু শরীর তা চায় না।

কয়েক দিন ধরে ভোরে ঘুম ভাঙছে আমার, ভোর হওয়ার অনেক আগেই চোখের ওপর একটা স্বপ্নের মতো কী যেনো টের পাচ্ছি, খুব হাল্কা লাগছে, অনেকক্ষণ ধরে। একটা সুখের মধ্যে পড়ে থাকছি। পাশের বিছানায় ফিরোজার কেমন লাগছে, আমি জানি না; সেও তার বিভোরতার মধ্যে থাকতে পারে, সেটা তার ব্যক্তিগত; আমার ব্যক্তিগত বোধ এক হাল্কা আচ্ছন্নতার। রওশনের সাথে প্রথম দেখা হওয়ার সময় এমন হয়েছিলো, এখন তেমনি হচ্ছে, মাঝেমাঝে মনে রাখতে পারছি না আমি কোথায় শুয়ে আছি, ঢাকা শহরে না গ্রামে, আমার বয়স কতত, পনেরো না পঁয়তাল্লিশ, আমি মনে রাখতে পারছি না; বেশ কিছুটা সময় ভাবার পর আমি আমার বাস্তবতা স্থির করতে পারছি। হয়তো শরীরের বয়স বাড়ে, মনের বয়স বাড়ে না, অন্তত ভোরগুলোতে আমার তা-ই মনে হচ্ছে। বেশ একটা ভার আমি বোধ করছিলাম কয়েক মাস ধরে, ওই ভারটা কেটে গেছে; ফিরোজার সাথে আমার ভারী সম্পর্কটির কথাও মনে থাকছে না। আমি আরো সজীব হয়ে উঠছি, নতুন মাটিতে একটি নতুন কলাগাছের চারা মনে হচ্ছে নিজেকে। আমি এতো দিন বুঝতে পারি নি যে আমি বয়স্কদের দলে পড়ে গেছি, আমি যাদের সাথে জীবন যাপন করছি, ঘুমোচ্ছ, তাঁদের চমৎকার শরীর আর মুখাবয়ব থাকলেও তাঁরা বয়স্ক; তাঁদের জগত ভিন্ন তরুণ জগত থেকে। আমার গাড়ির সামনেই ঘটনাটি ঘটে, তরুণীটির রিকশা উল্টে পড়ে বেবিট্যাক্সির ধাক্কায়; তরুণীটি নিচে পড়ে যায়, তার ভাগ্য ভালো পেছনের গাড়িগুলো থামে, কিন্তু কেউ তাকে টেনে তোলার সাহস করে না; মৃত্যুর থেকে নৈতিকতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে সম্ভবত মনে হয় তাদের। আমি লাফিয়ে নামি গাড়ি থেকে, রিকশা সরিয়ে তরুণীটিকে দু-হাতে জড়িয়ে দাঁড় করাই; একটু ভয় ছিলো আমার স্পর্শে তার সতীত্ব ছিঁড়ে যাওয়ার

ভয়ে সে ক্ষেপে উঠতে পারে, কিন্তু সে ক্ষেপে না, ভয় পেয়ে আমাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে; আমি তার শক্ত জড়ানোর কোমলতায় আচ্ছন্ন হয়ে যাই। আমি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাই, সে হাসপাতালে যেতে চায় না; তার বেশি কিছু হয় নি, সে বাড়ি যেতে চায়। গাড়িতে উঠে সে আমার থেকে একটু দূরে সরে বসে, কিন্তু আমার মনে হতে থাকে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে। তাকে আমার ভালো লাগে;–সে সুন্দর, সজীব, তরুণ, সপ্রতিভ; এবং ভেতরে তার একটি সুন্দর শরীর রয়েছে।

আমার নাম অনন্যা, অনন্যা আহমেদ, সে বলে, আপনাকে কি আমি ধন্যবাদ জানাবো?–আমি বুঝতে পারছি না।

আমি বলি, না, না, এখন ধন্যবাদের দরকার নেই; পরে কখনো জানাবেন।

সে পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একজোড়া চোখ মেলে বলে, অদ্ভুত লাগছে আপনার কথা, অদ্ভুত লাগছে আমার।

আমি বলি, অদ্ভুত লাগছে কেনো?

সে বলে, আপনি এখন ধন্যবাদ চাচ্ছেন না, কিন্তু পরে কখনো চাচ্ছেন।

আমি বলি, সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পরই ধন্যবাদ জানানো ভালো।

সে বলে, কিন্তু আপনার সাথে আর নাও তো দেখা হতে পারে।

আমি বলি, হবে।

সে বলে, আপনি এতো নিশ্চিত কেনো?

আমি বলি, আমি কখনো কখনো সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারি।

আমার এভাবে কথা বলা উচিত হয় নি; আমি বয়স্ক মানুষ, পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি এসে গেছি, তার আব্বা আমার পরিচয় পেলে হয়তো সালাম দিয়ে উঠে দাঁড়াতে, আঠারো বছর বয়সে যদি আমি সংসার শুরু করতাম তরুণী আমার কন্যাও হতে পারতো, আমার এভাবে কথা বলা ঠিক হয় নি। তাকে নামিয়ে দিয়ে এসে আমার বারবার মনে হতে থাকে আমার এভাবে কথা বলা ঠিক হয় নি; নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ দেখানো উচিত ছিলো আমার, এমনভাবে কথা বলা উচিত ছিলো যাতে গাড়ি থেকে নামার সময় সে আমাকে পা ছুঁয়ে সালাম করতো। আমি কেনো গম্ভীর হতে পারি নি, কেনো আমি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারি নি? আমার কি ইচ্ছে হচ্ছিলো ওই তরুণীর সহপাঠী হওয়ার? আমি তাকে আমার কার্ড দেয়ার পর সে প্রায় কোলাহলের মতো ঝলমল করে উঠেছিলো, বলছিলো সে বুঝতে পারছে না আমি কতো বড়ো, সব দিকেই, যদিও আমাকে দেখে তার অমন বড়ো কিছু মনে হয় নি। অনেক দিন পর আমি কোনো তরুণের পাশে অর্থাৎ তরুণীর পাশে বসেছি বলেই কি আমার অমন হয়েছে? কার। পাশে বসছি, তার একটা চাপ পড়ে আমাদের ওপর; কয়েক বছর আগে আমি একটি বুড়োর সাথে বসে ব্রিজের পর ব্রিজ পরিকল্পনা করেছি, এক দিন আমি টের পাই। বুড়োটি ব্রিজের থেকে বেশি পছন্দ করে আমার সঙ্গ, আমার সঙ্গ তাকে শীত থেকে তুলে আনে, সে আমার তাপ শোষণ করে, তখন আমি তার সঙ্গ ছেড়ে দিই।

বুড়োটি তারপর আর বেশি দিন বাঁচে নি। না, আমি তরুণীর শরীরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করি নি, ওই মুহূর্তেই আমার মনে তার শরীর ভোগের কোনো পরিকল্পনা জেগে ওঠে নি; বরং উল্টোটিই ঘটে, ওই প্রথম আমি কোনো নারীর পাশে বসি, কিন্তু আমার ভেতর কেনো ক্ষুধা দেখা দেয় না। অনন্যাকে কি আমি নারী মনে করি নি, অবচেতনায় তাকে কি। আমি অর্চিই মনে করেছি, মনে করেছি সে আমার কন্যাই? তাও মনে হয় না, কোনো সম্পর্ককেই আমি জৈবিক আত্মীয়তার সম্পর্কে দেখতে পছন্দ করি না, এবং দেখি না; আমার কোনো কোনো বন্ধু একেকটি ব্রিজ বানিয়ে বলেন এটা তাঁর সন্তান, খুব সুখ পান ব্রিজকে সন্তান মনে করে, তার ঔরস কোনো বিশাল নারীর গর্ভে জন্ম দিয়েছে সন্তান, যদিও ব্রিজ আমাকে মনে করিয়ে দেয় আড়াআড়িভাবে পড়ে থাকা শিশ্ন ও যোনিকে, যাদের কখনো মিলন ঘটবে না; জৈবিকভাবে তারা জড়িয়ে পড়েন তাঁদের সৃষ্ট বস্তুর সাথে, আমি তা করি না। জৈবিক সম্পর্ক থেকে আমি অনেক দূরে সরে গেছি, বংশানুক্রম আমার কাছে মূল্যবান নয়। আমি ওই তরুণীকে নারীই মনে করেছি, কন্যা মনে করি নি, তবে তার দেহ আমার মাংসে কোনো ভোগপিপাসা জাগায় নি, যদিও তা কেউ বিশ্বাস করবে না।

তারপর মনে হতে থাকে আমি যে গুরুত্বপূর্ণ হতে চাই নি অনন্যার কাছে, নিজেকে গুরুগম্ভীর আর ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেখাতে চাই নি দেশের একটি বড়ো নির্মাণ। লিমিটেডের, ভালোই করেছি; আমি চল্লিশোত্তরতার ভার অনেকটা কমাতে পেরেছি, অনেকটা হাল্কা হয়ে গেছি। এজন্যেই আমার খুব ভোরে ঘুম ভাঙছে, ঘুম ভাঙার সময় বুঝতে পারছি না আমি কোথায়, কোনো গ্রামে না শহরে না কোথায়, বুঝতে পারছি না। আমি কে, কোনো কিশোর না যুবক না বৃদ্ধ, এটা আমাকে সুখ দিচ্ছে। পর দিনই অনন্যা টেলিফোন করেছে; এটা অন্য এক জগতের টেলিফোন, তার কণ্ঠস্বর ভিন্ন, অভিধান আর বাক্য ভিন্ন, যার সাথে খাপ খাওয়াতে আমার বেশ কষ্ট পেতে হচ্ছে। আমি বিস্মিত হয়েছি

যে শুধু আমারই বয়স বাড়ে নি, আমার ভাষারও বয়স বেড়েছে, আমার মতো আমার ভাষারও বয়স কমাতে হবে, যদি আমি অন্য জগতের সাথে কথা বলতে চাই। আমি তাকে টেলিফোন করি নি, আমার সাহস হয় নি; বয়স হলে নানা রকম ভয় দেখা দেয়, আমারও তাই হয়েছে; কিন্তু কম বয়সের দারুণ দুঃসাহস রয়েছে, অনন্যা পরপর চারদিন ধরে টেলিফোন করছে, আমি অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছি। আমি আজকাল আটটার মধ্যেই অফিসে পৌঁছে যাচ্ছি, আটটা দশের মধ্যেই তার টেলিফোন বেজে উঠছে, পনেরো মিনিটের মতো কথা বলছি আমরা; এর মধ্যে সে আমার সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে গেছে, আমি শুধু একটি বৃত্তান্তই জেনেছি সে এক কলেজে এক বছর ধরে পদার্থবিজ্ঞান পড়াচ্ছে। টেলিফোনে আমরা কী কথা বলতে পারি? অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা, ছেলেমেয়ের অসুখ, খুনজখম, আধুনিক সাহিত্য, সমান্তরাল সিনেমা, ধর্ষণ, ব্ল্যাক হোল, মেয়েমানুষের মন্ত্রীত্ব, পুরুষের পুঙ্গবতা? না কি কাতর কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘলা মেঘলা পানি পানি পচে-যাওয়া শবরি কলা ধরনের কথা? আমাদের দুজনেরই মনে হয় বিষণ্ণ। হওয়ার, টেলিফোনে, সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে লঘু পরিহাসে ভেসে যাওয়া। আমি তার সমাজসংসার বংশ পিতামাতা সম্পর্কে কিছুই জানতে চাই নি, ওগুলোতে আমার কোনো আগ্রহ নেই; এবং আমি জানতে চাই নি সে বিবাহিত কিনা। এতে সে বিস্মিত হয়েছে; তার সাথে দেখা হওয়ার পরই নাকি লোকেরা তার যে-সংবাদটি জানতে চায়, যে-সংবাদটি না জানলে তাদের কিছুই জানা হয় না বলে মনে হয়, তা হচ্ছে সে বিবাহিত কিনা। আমি যে ইচ্ছে করে ওই প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেছি, এমন নয়, আমার মনেই পড়ে নি; মানুষের যে একটি বিবাহগত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি থাকে বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তা আমার মনে পড়ে নি।

একদিন অনন্যা হেসে বলে-বিষণ্ণ হওয়ার এটা তার প্রিয় পদ্ধতি, আপনি কিন্তু আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি জানতে চান নি, দেখা হলেই যা সবাই জানতে চায়।

আমি বলি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ? আমি বুঝতে পারছি না, সেটা কী?

অনন্যা বলে, আমার বিয়ে হয়েছে কি না? না হলে কেননা হচ্ছে না?

আমি বলি, এটাই সবচেয়ে গুরুতুপূর্ণ সংবাদ?

অনন্যা বলে, হ্যাঁ, মেয়েদের সম্পর্কে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ।

আমি বলি, যে-পদার্থবিজ্ঞান পড়ায় তার সম্পর্কেও এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ?– অনন্যা বলে, মেয়েদের বেলা পদার্থবিজ্ঞানে আর গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে কিছু আসে। যায় না, আসে যায় বিবাহে ও অবিবাহে।

আমি বলি, তুমি কী উত্তর দাও?

অনন্যা বলে, আপনি কি আজই আমার উত্তরটি শুনতে চান?

আমি বলি, যদি কোনো অসুবিধা না থাকে।

অনন্যা হাসে, এবং বলে, আগে বলতাম বিয়ে করবো না-বলা উচিত ছিলো বসবো না; তাতে ঝামেলা বেড়ে যেতো, কেনো বিয়ে করবো না অর্থাৎ বসবো না তা সবাইকে। বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে হতো।

আমি বলি, এখন কী বলে?

অনন্যা বলে, এখন বলি পাত্র পাচ্ছি না। আর অমনি নতুন ঝামেলা বেঁধে যায়, কেউ সেনাবাহিনী থেকে মেজর, কেউ হাইকোর্ট থেকে বিপত্নীক বিচারপতি ব্যারিস্টার নিয়ে আসে; কলেজের আয়ারাও পাত্র নিয়ে আসতে থাকে, মধ্যপ্রাচ্যে ইলেক্ট্রিশিয়ান।

আমি বলি, চমৎকার পাত্র, এবং একটু থেমে বলি, উচ্চরক্তচাপসম্পন্ন হৃদরোগসমৃদ্ধ দু-একটি কি আমিও নিয়ে আসবো?

অনন্যা বলে, ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ; সে হাসে, আমি কান পেতে শুনি, এবং বলে, ইউনিভার্সিটিতে আমার তিনচারটি বন্ধু ছিলো, ওদের সাথে আমি কার্জন হলের ঝোঁপের পাশে বসতাম, ওরা গাঁজা খেতো, আমি পড়তাম।

আমি বলি, পড়তে কেনো, গাঁজা খেতে পারতে।

অনন্যা বলে, আমি খেতে চাইতাম, ওরা দিতো না। বলতো মেয়েমানুষের গাঁজা খাওয়া ঠিক না। কল্কেটা পুরুষের। ওরা প্রত্যেকেই মনে করতো একদিন আমি তাকে নিয়ে সংসার করবো, স্ত্রী গাঁজা খাবে এটা ওদের ভালো লাগতো না বোধ হয়।

আমি বলি, শত হলেও তারা সমাজপতি পুরুষমানুষ।

অনন্যা বলে, পাশ করার পর ওরা আমাকে বলতো তুই আমাদের কাউকে বিয়ে কর। আমি বলতাম তোদের চারজনকেই আমার বিয়ে করা উচিত, তোদের। চারজনকেই আমি বিয়ে করতে চাই। ওরা রেগে উঠতো। তখন আমি বলতাম আমি বিয়ে করবো না। ওরা চেপে ধরতো, ক্যান তুই বিয়া করবি না। আমার কোনো কথাই ওদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতো না। শেষে রেগে বলতো, তোর তো একটা দ্যাহ আছে, তুই দ্যাহের ক্ষুধা মিটাবি কেমনে? আমি বলতাম, কেনো, তোদর মতো ব্রোথেলে গিয়ে। ওরা চিল্লাপাল্লা শুরু করে দিতো।

আমি হেসে বলি, তাহলে ব্রোথেলেই যাচ্ছো?

অনন্যা হেসে বলে, একবার যেতে চেয়েছিলাম। যে-রিকশাঅলা আমাকে নিয়ে যেতে আসতো, সে একদিন কই যাইবেন আফা বলতেই আমি বলি, বাদামতলির। পাড়ায় যাব, সেখানে চলো। রিকশাঅলা আমার দিকে পাগলের মতো তাকায়, শেষে আমার পায়ে পড়ে বলে, এমন কথা কইবেন না আফা, আপনারে আমি পাড়ায় লইয়া যাইতে পারুম না। তাই আমার আর ব্রোথেলে যাওয়া হয় নি।

আমি বলি, বড়ো দুঃখের কথা।

অনন্যা হাসতে থাকে, আমি তার মুখ দেখতে পাই না, কিন্তু তার হাসি দেখতে পাই; অনেকক্ষণ ধরে আমি তার তরুণ হাসি শুনতে থাকি, দেখতে থাকি, তার হাসির সুগন্ধ গ্রহণ করতে থাকি। যখন আমি অনন্যার সাথে টেলিফোনে কথা বলি তখন সিগারেট খাই না।

একদিন আটটা দশে টেলিফোন বাজে না, আমি একটু উৎকণ্ঠিত হই; ওই মুহূর্তে আমার ব্যক্তিগত সহকারিণী তাকে নিয়ে আমার কক্ষে ঢোকে। আমি বিব্রত হতে পারতাম, হওয়ারই কথা ছিলো, কিন্তু আমি বিব্রত হই না, আমি হঠাৎ আলোর। ঝলকানি বোধ করি, দাঁড়িয়ে অনন্যাকে অভ্যর্থনা করি। আমি কী করে পারলাম? আমার সহকারিণী অবাক হয় মর্মান্তিকভাবে, একটি তরুণীকে আমি এমন অভ্যর্থনা। করতে পারি, সে কখনো ভাবতে পারে নি; তাই সে সম্ভবত অনন্যাকে কোনো দেশের রাজকন্যা বলে মনে করতে থাকে, তার মাথায় একটা মুকুট খুঁজতে থাকে। সে কোনো মুকুট দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়, কিন্তু আমি মুকুট দেখতে পাই। আমার কক্ষে সাধারণত ঢোকে দর্প অর্থ শক্তি দাস, সৌন্দর্য আর কোমলতা ঢোকে না; এই প্রথম সৌন্দর্য কোমলতার স্যান্ডলের স্পর্শে আমার কক্ষ শিউরে ওঠে, তাঁতের শাড়ির শোভায় বদলে যেতে থাকে। আমার চেয়ারটিতে আমার বসতে ইচ্ছে করে না, ওটাকে কোনো হাবশি বাদশার সিংহাসন বলে মনে হয়, ওটিতে আমি অস্বস্তি বোধ করতে থাকি; মনে হতে থাকে চেয়ারকার্পেটের জগত থেকে অনেক দূরে কোনো ঘাস খড় কাশবন।

ফড়িঙের জগতে যেতে পারলে আমি স্বস্তিতে বসতে পারতাম। সে সুন্দর, সেটা সুন্দরীর থকথকে সৌন্দর্য নয়, তার সৌন্দর্য চারপাশের কদর্যতার উল্লাসকে শান্ত করে আনে, তাকে দেখার পর সব ধরনের বাড়াবাড়িকে মনে হয় হাস্যকর। আমার কেনো যেনো নির্মলতা নিষ্পপতা ব্যাপারগুলো মনে পড়ে, যদিও আমি ঠিক নির্মলতা নিষ্পপতায় বিশ্বাস করি না, ওগুলোকে ভাবালুতাই মনে করি, তবু আমার ওগুলোর কথাই মনে পড়ে। এখন আর কারো ছোঁয়ায় মৃত প্রাণ ফিরে পায় না, কুষ্ঠরোগী সেরে ওঠে না; কিন্তু আমার মনে হতে থাকে সে যদি এখন কোনো মৃতকে ছোঁয়, তবে মৃত প্রাণ ফিরে পাবে; যদি কোনো

কুষ্ঠরোগীর দিকে তাকায়, তবে ওই অভিশপ্ত দেবদূতের মতো। কান্তিমান হয়ে উঠবে। আমিও তার করুণা লাভ করি, আমার বয়স কমে যেতে থাকে ওই প্রায়-অপার্থিব উপস্থিতিতে; অপার্থিব বলছি এজন্যে যে তার উপস্থিতি আমার ভেতরে কোনো কামবোধ সৃষ্টি করে না, যদিও অমন কোনো বোধের উন্মেষ ঘটা বেশ স্বাভাবিক ছিলো; যেমন আমার ব্যক্তিগত সহকারিণী তরুণীটি বেশ চমৎকার তরুণী, কোনো বাড়াবাড়ি করে না, কিন্তু সে যততবারই আমার কক্ষে ঢোকে, আমি তার দিকে তাকালেও লঘু একটা কাম বোধ করি।

অনন্যা বলে, আপনি এতো উঁচুতে থাকেন, মাটি ঘাস নদী থেকে এতো ওপরে।

আমি হেসে বলি, পারলে আমি মেঘে থাকতাম।

অনন্যা বলে, কিন্তু সাততলায় উঠতেই আমার মাথা ঘোরাচ্ছে, লিফট আমি ভীষণ ভয় পাই, মেঘে থাকলে আপনার সাথে আর দেখা হতো না।

আমি বলি, তখন তোমার দুটি ডানা থাকতো, কোনো কষ্ট হতো না। ডানার কথায় সে বেশ প্রফুল্ল বোধ করে, এবং আমি আরো বলি, সাত কি সতেরো তলায় থাকার একটি সম্ভাব্য উপকারিতা আছে।

সে জানতে চায়, উপকারিতাটি কী?

আমি বলি, প্রয়োজনের মুহূর্তে লাফিয়ে পড়ে দ্রুত সমাধানে পৌঁছা যায়।

সে ভয় পায়, আঁতকে উঠে বলে, আপনার লাফিয়ে পড়ার প্রবণতা আছে না কি?

আমি বলি, কততবার আমি লাফিয়ে পড়েছি।

সে ভয় পায়, আর আমি তার চোখেমুখে বিস্ময় ছড়ানো দেখতে পাই; এতো বিস্মিত হয়েছে যে ভয় পেয়ে যাচ্ছে, যেনো এই সব আসবাবপত্র টেলিফোনদঙ্গল শীততাপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র পিসি জিসি টিসি তাকে গ্রাস করার জন্যে এগিয়ে আসছে।

অনন্যা বলে, আমার ভয় লাগছে।

আমি জানতে চাই, কেনো?

অনন্যা বলে, আমি কখনো এতো কিছু দেখি নি, এতো ঝকমকে কিছু দেখি নি। আমি একা হলে ভয়ে চিৎকার করে উঠতাম। আপনি ভয় পান না?

আমি বলি, এগুলো না থাকলেই আমি ভয় পেতাম, এগুলোই আমাকে সাহস দেয়, বারবার বলে ভয় পেয়ো না তোমার পেছনে আমরা সবাই আছি।

অনন্যা বলে, কিন্তু আপনার এখানে যে আমার আর আসার সাহস হবে না, এসবের কথা মনে হলেই আমার মাথা ঘোরাবে। আপনাকে আমি আর দেখতে পাবো না।

আমি বলি, তুমি তো পদার্থবিজ্ঞান পড়াও।

অনন্যা বলে, কিন্তু এসব পদার্থকে আমি ভয় পাই। আমার বোধ হয় উচিত ছিলো গ্রামে খালের পারে একটি কুঁড়েঘরে থাকা, মরিচ আর লাউ বোনা, একটি ছাগল। পোষা। অনন্যা নিঃশব্দে হাসতে থাকে।

কোনো নারীর মুখোমুখি হলে আমি প্রথমেই একটি জরিপ করে নিই, ব্রিজ তৈরি করতে হলে যেমন জরিপ করি, কয়েক মুহূর্তেই তার অবয়ব সম্পর্কে আমার একটি

স্পষ্ট ধারণা হয়ে যায়। তার পাড় কেমন, মাটির অবস্থা কী, ভিত্তিকূপ তৈরিতে কতোটা বিপর্যয় দেখা দেবে, এমন একটা জরিপ কয়েক মুহূর্তেই আমার করা হয়ে যায়, যেমন, অন্য পুরুষরাও করে; কিন্তু অনন্যার বেলা তা হয় না, আমার মন কোনো জরিপ করতে রাজি হয় না। তার কোনো দেহ আছে, দেহের সংস্থান অন্য নারীদের মতোই, সে-সংস্থান থেকে একই রকমে মধু উৎসারিত হতে পারে, এটা ভাবতে ঘেন্না লাগে–আমার। অনন্যা ওঠার জন্যে প্রস্তুত হয়। আমি তাকে চাও দিতে পারি নি; কী খাবে: তাও জিজ্ঞেস করতে পারি নি। তবে আমার ব্যক্তিগত সহকারিণীর দক্ষতা অসীম, সে। কোনো কিছুই বাদ রাখে নি, পাঁচতারা থেকে বাছাই করে সে সব নিয়ে এসেছে-তাকে, একটি প্রোমোশন দেয়া উচিত ছিলো; কিন্তু অনন্যা কিছুই ছুঁতে চায় না। শুধু এক। টুকরো চকোলেট কেক আর লাল চা। আমি তাকে নিচে নামিয়ে দিয়ে আসি, লিট সে ভয় পায়, তার মাথা ঘোরে; তবে লিফটে সে মাথা ঘুরে আমার ওপর পড়ে যায় নি, আমাকে বিব্রত করে নি। আমি তাকে পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাব করতে পারি নি; সেটা বাড়াবাড়ি মনে হয় আমার; এমনকি পথ পর্যন্তও দিয়ে আসতে পারি নি, সেটাও মনে; হয় বাড়াবাড়ি।

ফিরোজা বোধ হয় বেশ এগিয়ে গেছে, অত্ত্বিকটির সাথে এক চাইনিজে তাকে: দেখেছে আমার এক বন্ধু, মোসলেম আলি, ফিরোজার এক অপ্রকাশিত অনুরাগী; আমাকে টেলিফোন না করে উত্তেজিত হয়ে আমার অফিসে এসেছে এক সন্ধ্যা একরাত কষ্টে নিজের উত্তেজনা চেপে রেখে। তার চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছিলো তার বউ ড্রাইভারের সাথে পালিয়ে গেছে, সে লাফিয়ে পড়তে পারে সাততলা থেকে। ফিরোজা তাকে চিনতে পারে নি, না চেনার ভান করেছে, এতে সে আরো বিপর্যস্ত হয়ে গেছে, এবং আমার জীবনে যে একটি দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এতে সে কাতর হয়ে পড়েছে। মোসলেম আলিকে আমি পছন্দ করি; সে আমার একনিষ্ঠ অনুরাগী নজরুল ছাত্রাবাসে। ঢোকার পর থেকেই;–আমি যদি মহাপুরুষ হতাম তাকে পেতাম প্রথম বিশ্বাসীরূপেই; সে আমার কাছে নিয়মিত স্বীকারোক্তি করে চলতো তার সমস্ত পাপের, যেনো আমি। কোনো পুরোহিত, তাকে পাপমুক্ত করার জন্যে প্রার্থনার অধিকার আমার রয়েছে। সে একদিন এসে কাঁদতে থাকে আমার কাছে, খুব গোপনে; বারবার মাফ চাইতে থাকে। আমি তার কাছে জানতে চাই সে এমন কী অপরাধ করেছে, যে এতোটা ভেঙে পড়েছে, মাফ চাচ্ছে; সে পাপীর মতো জানায় সে আর সহ্য করতে পারে নি, মাসের পর মাস সহ্য করেছে, আত্মদমনের অনেক চেষ্টা করেছে, শয়তানটিকে পাজামার রশি দিয়ে বেঁধেও রেখেছে, আর পারে নি, শেষে আর্কিটেকচারের ওয়াজেদাকে ভাবতে ভাবতে বিছানায় শুয়ে একটি কাজ করে ফেলেছে। তার পাপের শেষ নেই। তার দু-একদিন পরই মোসলেম আলি তবলিগে যোগ দিয়ে এক মাসের জন্যে টঙ্গি চলে যায়, এবং তিন মাসের মধ্যে মামাতো বোনকে শাদি করে, এবং দশ মাসের মধ্যে প্রথম পুত্রটি পয়দা করে। ফিরোজার যে সে অপ্রকাশিত অনুরাগী, এটা সে কখনো আমাকে বলে নি, ফিরোজাই বলেছে আমাকে; আমি বুঝি ফিরোজাকে মনে রেখেও মাঝেমাঝে সে তার স্ত্রীর সাথে কাজটি করে। মোসলেম আলি আমার জন্যে ভয়াবহ সংবাদ নিয়ে এসেছে; সে নিশ্চিত আমার জীবনে একটি দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে।

ভাবী আমারে চিনতে পারল না, মোসলেম আলি বলে, তাইতেই আমি বুঝছি এইতে একটা কিন্তু আছে।

তোমার কী মনে হয়? আমি বলি।

যা মনে হয়, মোসলেম আলি বলে, তা আমি তোমার স্ত্রী আর আমার ভাবীর। সম্পর্কে বলতে পারব না। মোসলেম আলি বিমর্ষ হয়ে থাকে অনেকক্ষণ, তারপর বলে, তোমাগো সংসার কি ভাল যাইতেছে না?

আমি বলি, ভালোই তো যাচ্ছে, কোনো মারামারি নেই।

মোসলেম আলি বলে, আমার কথা শুইন্যা আইজ মারামারি করবা না?

আমি বলি, না।

মোসলেম আলি বলে, এইর লিগাই মাইয়ালোকগুলি এমন হইয়া যাইতেছে। আমি হইলে আইজ বানাইতাম, পরপুরুষের লগে চাইনিজে যাওয়া দেখাইতাম।

আমি বলি, এত উত্তেজিত হওয়ার কী আছে?

মোসলেম আলি বলে, তুমিও আবার পরের মাইয়ালোকের লগে যাও কি না কে জানে।

মোসলেম আলি চলে যায়, আমি একটু বিমর্ষ বোধ করি; আমার ইচ্ছে হয় অনন্যার কলেজের গেইটে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আমি যদি একটি রিকশা নিয়ে ওর কলেজের গেইটে গিয়ে দাঁড়াই, অনেকক্ষণ দাঁড়াই, দাঁড়িয়ে এবং দাঁড়িয়ে এবং দাঁড়িয়ে থাকি, কলেজ থেকে বেরোতে গিয়ে অনন্যা যদি দেখে আমি দাঁড়িয়ে আছি সে কতোখানি চমকে উঠবে? কততখানি বিহ্বল হবে? কতোটা ভয় পাবে? আমাকে কি চিনতে পারবে? আমি কি কলেজের গেইটে গিয়ে দাঁড়াতে পারি? গাড়ি নিয়ে গেলে তোকজন ভাববে আমি আমার কন্যাকে নিতে এসেছি; কন্যাকে নেয়ার জন্যে কেউ কি এতো আগে গিয়ে গেইটে বসে থাকে? আমি কি সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না? কিন্তু আমি বেরোবো কেমনে? অনেকগুলো শেকল খুলে আমাকে বেরোতে হবে; ব্যক্তিগত সহকারিণীর শেকল খুলতে হবে, তিনজন অধস্তনের শেকল খুলতে হবে, তা আমি খুলতে পারবো; কিন্তু ড্রাইভারের শেকল খুলবো কীভাবে? যদি আমি আমার গাড়িতে না উঠি, পথের দিকে হাঁটতে থাকি, প্রথম আমার ড্রাইভার পাগল হয়ে যাবে, সাথে তার আরো দশটি সঙ্গী পাগল হবে, ওরা সবাই মিলে আমাকে পাগল মনে করবে। মনে। করবে আমি হঠাৎ পাগল হয়ে গেছি; একটি মেয়ে যে আমার কাছে এসেছিলো এটা সম্ভবত এখন তাদের আলোচনার বিষয়, এবং তারই ফল ফলছে মনে করে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে। নানা দিকে সংবাদ পৌঁছে যাবে, আমার বাসায়ও পৌঁছোবে। আমি এমন। সংবাদের বিষয় হয়ে উঠতে পারি না। অনন্যার কলেজের গেইটে আমার যাওয়া হবে না, আমি এতোটা সাহসী হতে পারবো না। তখন মাহমুদা রহমানের ফোন বাজে;–অনেক দিন পর মাহমুদা রহমান, তিনি জিল্লুর রহমান হয়ে গেছেন কি না জানি না, কিন্তু তার ফোন উদ্ধারের মতো মনে হয়। আমি কি খুব শূন্যতার মধ্যে আছি, কোনো কৃষ্ণ গহ্বরে পড়ে গেছি? নইলে ওই ফোনকে উদ্ধার মনে হচ্ছে কেনো? কিন্তু না, উদ্ধার নয়, বরং মাহমুদা রহমানই আমাকে অনুরোধ করছেন

তাকে উদ্ধার করতে। আমি ভাঁকে। উদ্ধার করবো? তিনি কি আরো গভীর গর্তে পড়েছেন? এখনই তাঁর বাসায় যেতে হবে আমাকে; তার কণ্ঠস্বরে পৃথিবীর সমস্ত হাহাকার, সমস্ত ক্রোধ, সমস্ত ঘৃণা।

মাহমুদা রহমানের বাসায় গিয়ে দেখি হাফিজুর রহমান ফিরেছেন আল মদিনা থেকে; তিনি আমাকে দেখে বসা থেকে উঠলেন না, আমি যে হাত তুলোম তার কোনো উত্তর দিলেন না, একবার তাকিয়ে মাথা নিচু করে রইলেন। তিনি কি জেনে গেছেন তার স্ত্রীর সাথে আমার একটা শারীরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তাই ছুটে। এসেছেন সৌদি থেকে? কিন্তু তার মুখে কোনো ক্রোধ দেখছি না, আমাকে দেখে ফেটে পড়ার ভাব দেখছি না, এখনই যে উঠে স্ত্রীকে চুল ধরে টেনে আমার সাথে ঘরের বাইরে বের করে দেবেন, তাও মনে হচ্ছে না; বরং তাকেই মনে হচ্ছে অপরাধী, তিনি মাথা নিচু করে বসে থাকার চেষ্টা করছেন। আমি তাকে কুশল জিজ্ঞেস করি, তিনি। মাথা নিচু রেখেই উত্তর দেন; আমার সম্পর্কে কোনো উৎসাহ দেখান না। তাহলে উদ্ধার করতে হবে কাকে, মাহমুদা রহমান না হাফিজুর রহমান না আমাকে?

মাহমুদা রহমান চিৎকার করে বললেন, দেখুন, এই লোচ্চা সৌদি থেকে কী করে এসেছে।

হাফিজুর রহমান সব সময়ই গম্ভীর প্রকৌশলী, তার ভেতরটা মুখে প্রকাশ পায় না; মাহমুদা রহমানের অভিধায় তার ভেতরে কী ঘটলো বুঝতে পারলাম না। মাহমুদা রহমান বারান্দা থেকে টেনে কলাপাতার মতো একটি বালিকাকে আমার সামনে ছুঁড়ে দিলেন। বালিকা মেঝেতে পড়ে গেলো, তারপর উঠে একপাশে বসলো, ঘোমটা দিতে চেষ্টা করলো, তার গাল থেকে একটি মারাত্মক ঝিলিক এসে আমার চোখে ঢুকলো।

আমি বললাম, মেয়েটি কে?

মাহমুদা রহমান বললেন, কে আর, এই লোচ্চার দুই নম্বর বউ, আমার সতিন। লোচ্চাটাকে আমি জেলের ভাত খাওয়াবো।

আমি বলি, কখন বিয়ে করলেন?

মাহমুদা রহমান বললেন, বিয়ে এখনো করেন নি, করার পরের কাজটি করে। এসেছেন, পেট বানিয়ে নিয়ে এসেছেন। এখন আমার কাজ দুজনকে সোহাগে নিয়ে বিয়ে পড়িয়ে আনা।

আমি কিছু বুঝে উঠতে পারি না। সৌদিতে হাফিজুর রহমান কোথায় পেলেন এ-কলাপাতাটিকে? মাহমুদা রহমান চিৎকার করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে সম্পূর্ণ কাহিনী বর্ণনা করলেন, যা তিনি সারা সকাল ধরে উদ্ধার করেছেন হাফিজুর রহমানকে ছিঁড়েফেড়ে। হাফিজুর রহমানের মাস আটেক আগে একবার দেশে আসার কথা ছিলো, কিন্তু আসেন নি; তাঁর কাজ বেড়ে গিয়েছিলো, তাই তিনি তখনকার ছুটি নেন নি (মাহমুদা রহমানের তাতে কোনো আপত্তি হয় নি, বরং হাফিজুর রহমান আসেন নি বলে তিনি কতোটা আনন্দিত ছিলেন, তা আমি জানি)। তখন আরব মরুভূমিতে এ-কলাপাতাটি দেখা দেয়। কলাপাতাটির একটি ভাই হাফিজুর রহমানের অধীনে ইলেক্ট্রিশিয়ানের কাজ করে, সে খুবই ভক্ত তার মনিবের। প্রভুর থাকতে খেতে খুব অসুবিধা হচ্ছিলো, একটি কাজের মেয়ের খুব দরকার হচ্ছিলো; তাই ইলেক্ট্রিশিয়ানটি হাফিজুর রহমানকে একটি পরিচারিকা এনে দেয় দেশ থেকে। সে

নিজের ছোটো বোনকেই নিয়ে যায়, হাফিজুর রহমানই সমস্ত ব্যয় বহন করে; এবং হাফিজুর রহমান কলাপাতাটিকে পেয়ে কাজ বাড়িয়ে দেন, দেশে আসার সময় পান না, চিঠি লেখা কমিয়ে দেন, টেলিফোন করা তো বন্ধই করে দেন। কলাপাতাটির বয়স কতো হবে? মোলো? হাফিজুর রহমান আট মাস ধরে বেহেস্তে ছিলেন, মরুভূমিতে তার জন্যে একটি কলাপাতা সবুজ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলো, আমি বুঝতে পারি যখন আমি আরেকবার কলাপাতাটির দিকে তাকাই। কলাপাতাটি কালবিলম্ব না করে গর্ভবতী হয়ে পড়ে- মরুভূমিতে হয়তো রাবার নেই, বা হাফিজুর রহমান জুতো পরে পুকুরে নামতে পছন্দ করেন না। এতো দিন চেপে ছিলেন, এখন তাকে নিয়ে তিনি দেশে ফিরেছেন, হয়তো সেখানে কলমাও পরেছেন, এখানে স্বীকার করছেন না। তিনি কলাপাতাটিকে বিয়ে করবেন, মাহমুদা রহমানকে তিনি একথা জানিয়েছেন, এবং মাহমুদা রহমান তাকে জানিয়েছেন তিনি হাফিজুর রহমানের দ্বিতীয় বিবাহে সম্মতি দেবেন না, তাকে জেলে পাঠাবেন। আমি কীভাবে উদ্ধার করবো মাহমুদা রহমানকে।

হাফিজুর রহমান জানতে চাইলেন, ঢাকায় না কি এমআর করার জন্যে এখন রাস্তায় রাস্তায় ক্লিনিক হয়েছে?

আমি বলি, আমি ঠিক জানি না।

মাহমুদা রহমান বলেন, রাস্তায় বের হও, তাহলে নিজেই খুঁজে পাবে।

এমআর কথাটি এই আমি প্রথম শুনি, এর পুরোটা কী তাও জানি না, তবে হাফিজুর রহমানের প্রশ্ন থেকে কাজটি বুঝতে পারি, উত্তরও দিই; হাফিজুর রহমান। তাতে সুড়ঙ্গের

পরপারে কোনো আলো দেখতে পান না। আমি কীভাবে উদ্ধার করবো এদের? আমাকে কি বালিকাটিকে নিয়ে ক্লিনিকে ছুটতে হবে, একটা চমৎকার সহৃদয়। তলপেটের ডাক্তার খুঁজে বের করতে হবে? গিয়ে যদি বলি আমার এক বন্ধু কাজটি করে ফেলেছেন, তাকে উদ্ধার করুন; ডাক্তার কি আমার দিকে তাকিয়ে সুস্পষ্ট অর্থপূর্ণ হাসি হাসবে না? কিছু উপদেশ দেবে না, শেলফ থেকে দু-চারখানি ধর্মগ্রন্থ (আজকাল না কি এগুলোই থাকে তাদের শেলফে) বের করে পড়ে শোনাবে না? তারপর রারার ব্যবহারের উপকারিতা ব্যাখ্যা করবে না? আমার আর ভালো লাগছে না, আমার আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, আমার বেরিয়ে পড়তে। ইচ্ছে করছে। কলাপাতাটির দিকে চোখ পড়তেই আবার একটি ঝিলিক অনুভব করি, হাফিজুর রহমান একে হারাতে চাইবেন না; কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে এখন তিনি এটিকে হারাতে প্রস্তুত। আমি মেয়েটির মুখের দিকে আবার তাকাই, তার মুখে এবার আমি মৃত্যুর উজ্জ্বল উদ্ধারের ছায়া দেখতে পাই। আমি কাউকে উদ্ধার করতে পারবো না, নিজেকেও না, আমি বেরিয়ে পড়ি। ড্রাইভারকে বিদায় করে দিয়ে আমি পথে হাঁটতে থাকি। অনন্যার কলেজ কতো দূর? এখন তার ছুটি হয়ে গেছে। আমি কি হাঁটতে হাঁটতে সেখানে গিয়ে উঠতে পারি? কতোক্ষণ লাগবে যদি আমি হাঁটতে থাকি। তাকে কি আমি সেখানে খুঁজে পাবো? গেইটে দাঁড়িয়ে থাকবো? শিক্ষকদের বসার ঘরে গিয়ে তার খোঁজ করবো? সে কি আমাকে চিনতে পারবে? এখন আমি হাঁটছি, আমাকে কেউ চিনতে পারবে না।

নিজেকে আমার অচেনা মনে হচ্ছে, শহরটাকে অচেনা মনে হচ্ছে। অনেক বছর ধরে আমি শহরটাকে উঁচু থেকে বসা থেকে কাঁচের জানালার ভেতর দিয়ে দেখে আসছি, দাঁড়িয়ে হেঁটে দেখি নি, সরাসরি দেখি নি; আমার ভালো লাগছে। কেউ আমাকে চিনতে পারছে না, আমিও চিনতে পারছি না, একটা পানের দোকান থেকে একটি মোটা লোক, চমকার ঘন

পিক ছুঁড়েছে, আমার গায়ে এসে পড়তে পড়তে নিচে পড়ে গেলো, লোকটি আর আমি হাসলাম। গায়ে পড়লে কেমন লাগতো আমার ভাবতে ইচ্ছে হলো। বজ্রপাতের মতো একটা বাস এসে দাঁড়ালো আমার পাশেই, ওপরেও দাঁড়াতে পারতো, ছোট্ট ছাই দিয়ে তৈরি হেল্পারটি আমাকে ধরে টানাটানি শুরু করলো তার গেইট লক। সিটিং সার্ভিসে ওঠার জন্যে, আমি উঠে পড়লাম। পেছনের দিকে একটি সিটে বসলাম। আমি। আমি মাছের গন্ধ পাচ্ছি, আমার পাশের লোকটির গেঞ্জি থেকে সুন্দর একটা আঁশটে গন্ধ পাচ্ছি, একবার তার গেঞ্জিতে নাক লাগিয়ে শুকতে ইচ্ছে হলো আমার। বাস চলছে আর থামছে, থামছেই বেশি, আমার ভালো লাগছে। অনন্যা কি এ-বাসে উঠতে পারে? এ-বাসে উঠে তার যাওয়ার কখনো দরকার পড়ে না? আজই দরকার পড়তে পারে না? আমার মতো উঠে বসতে পারে না? সামনের দিকে যে-মেয়েটি বসে। আছে, সে কি অনন্যা? একটি লোক তার পলিথিনের ব্যাগটি আমার উরুর ওপর রেখেছে, ভেতর হয়তো আখের গুড় রয়েছে, আমি আখের গুড়ের গন্ধ পাচ্ছি, আমার ভালো লাগছে। অনেক দিন ধরে আমি আখের গুড় খাই না, আখের গুড়ের গন্ধ পাই না। বাস এখন চলছে না, একটি গে সেলুন দেখতে পাচ্ছি, গে লর্ড সেলুন? ঢাকায় গেদের জন্যে নিজস্ব সেলুনও রয়েছে? নাপিতগুলোকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার, ওদের ঠোঁটে লিপস্টিক আছে কি না, ওরা বক্ষবন্ধনি পরে কি না দেখতে ইচ্ছে করছে। বাস বোধ হয় আর চলবে না, এখানেই থেমে থাকবে। আমি কি নেমে যাবো? এবার বাস চলতে শুরু করেছে। ব্রিজ, এ-ব্রিজটা একদিন ভেঙে পড়বে, ভেতরে ভেতরে এর ভাঙার কাজ চলছে, আজই ভেঙে পড়বে না, ভেঙে পড়বে, শব্দ শুনছি। বাস কি এখন ঝাঁপিয়ে পড়বে ডানের পানিতে বাঁয়ের পানিতে? যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলে আমার লাশ পাওয়া যাবে। কেউ বুঝতে পারবে না আমি কোথায় যাচ্ছিলাম। আমি একটি রহস্য হয়ে উঠবো। ড্রাইভার বলবে স্যার তাকে মাহমুদা রহমানের বাসা থেকে বিদায় দেয়, তারপর আর কিছু সে জানে না। আমার লিমিটেড একটা প্রকল্প নেবে আমি

কোথায়। যাচ্ছিলাম বের করার জন্যে। ফিরোজা ভাববে গ্রামে আমার একটি উপপত্নী আছে, তার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। অনন্যা কী ভাববে? মাহমুদা রহমান? দেবী? সাংবাদিকগুলো? তারা কোনোদিন জানবে না আমি কোথায় যাচ্ছিলাম, আমি নিজেও জানি না। আমার ওপাশের সিটে দুটি মেয়ে, ওরা বোধ হয় দেহ বিক্রি করে, সিগারেট টানছে, ওদের কর্কশ ধুয়োর গন্ধ পাচ্ছি, বেশ লাগছে; ওরা গালি না দিয়ে কথা বলছে না, বেশ লাগছে আমার। বাস এবার থামলো, ছাদের ওপর থেকে জেলেভাইদের চাঙারি পড়ে গেছে, তুলতে হবে। এবার একটা ব্রিজ, বেশি দিন টিকবে না, নিচে নদী, খালের মতো। কী নাম? মেঘবতী? মেঘেশ্বরী? সামনের চাকা খুলে বাস এবার হুমড়ি খেয়ে পড়লো একটা গাছের গায়ে। খালে পড়ে যেতে পারতো, পড়ে নি, আমি নিচে নেমে আসি।

৭. হাঁটতে ইচ্ছে করছে আমার

হাঁটতে ইচ্ছে করছে আমার, খালি পায়ে হাঁটতে ইচ্ছে করছে; জুতো খুলে লাল মাটি আর ঘাসের ওপর দিয়ে আমি হাঁটতে থাকি, জুতো জোড়া আর বইতে ইচ্ছে করছে না, রাস্তার পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিই। অনেক বছর আমার পায়ের নিচে ঘাস পড়ে নি, মাটি পড়ে নি, এখন আমার পায়ের নিচে ঘাস, আমার পায়ের নিচে মাটি; আমার ভালো লাগছে। কাঁঠালগাছগুলো সবুজ হতে হতে কালো হয়ে উঠেছে, কলাপাতাটিকে আমার মনে পড়ছে, মৃত্যুর সুন্দর মুখ মনে পড়ছে, সব কিছু ভালো লাগছে। আমি একটি কাঁঠালগাছের নিচে বসি, গাছটিকে ঘিরে সবুজ ছায়া, গাছের ছায়ার বাইরে পানীয়ের মতো সুন্দর রৌদ্রের আগুন। আমি একবার এমন ছায়ায় এমন আগুনে নিজের ভেতর থেকে সুখ বের করেছিলাম, আমি সেই সুখ অনুভব করছি। আমি ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ি, আমার ঘুম পাচ্ছে। একটি হলদে কাঁঠালপাতা ঝরে পড়লো আমার মুখের ওপর, আমি হাতে নিয়ে দেখি পাতাটিকে, রওশনের হাতের তালুর মতো পাতাটি, মেহেদিপরা হাতের মতো। অনন্যার হাত কেমন? আমি এখন কোথায়, কেউ জানে না, আমি জানি না। আমার ঘুম পাচ্ছে, রওশনের মতো ঘুম, অনন্যার মতো ঘুম, কাঁঠালপাতার মতো ঘুম, কলাপাতার মতো ঘুম। আমি ঘুমিয়ে পড়ি, বহুদিন আমি ঘুমোই নি। যখন ঘুম। ভাঙে আমার মনে হয় ভোর হলো, মা এখনি আমাকে ইস্কুলে যাওয়ার জন্যে ডাকাডাকি করবে; কিন্তু এখন ভোর হলো কি না আমি কার কাছে জিজ্ঞেস করবো? ভোর কি হলো, না সন্ধ্যা হচ্ছে। একটু পরেই আমি বুঝতে পারি সন্ধ্যা হচ্ছে, ভোর হচ্ছে না। আমার পায়ে জুতো নেই, আমি কী করে ফিরবো শহরে? বাসে উঠতে ইচ্ছে করছে না, আমার, কিন্তু মনে পড়ছে বাসে করে আসতে আমার ভালো লাগছিলো, মাছের গন্ধ। পাই আমি, আমার বমি আসে। আমি বাসে

উঠতে পারবো না। আমি একটি বেবিট্যাক্সি নিই, শহরে এসে একটি জুতোর দোকানে ঢুকি, আমার অফিসে যাই।

আম্মু আজ রাতে ফিরবে না, খাবার টেবিলে অর্চি বলে; আমি অবাক হই অর্চি আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে বলে; তার আম্মু ফিরবে না, তাতে আমার কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না, জানতেও ইচ্ছে করে না কেনো ফিরবে না, সে বোধ হয় আমার জীবনে আর উদ্দীপকরূপে কাজ করে না।

নানুর বাসায় থাকবে, অর্চি অতিরিক্ত ও প্রয়োজনীয় সংবাদটুকু দেয়।

আমি বলি, তুমি তো আগেই খেয়ে নিতে পারতে।

অর্চি বলে, আজ তোমার সাথে খেতে ইচ্ছে হলো, কতো দিন খাই না।

আমি বলি, কেননা এমন ইচ্ছে হলো তোমার?

অর্চি বলে, আমি স্টেটসে চলে যাবো যে। আমি একটু চমকে উঠি।

আমি বলি, সব কাগজপত্র পেয়ে গেছো?

অর্চি বলে, সব পেয়ে গেছি, আমরা তিন বান্ধবী এক সাথে যাবো।

আমি বলি, কবে যাবে?

অর্চি বলে, মাত্র সাত দিন সময় দিয়েছে, এর মাঝেই সব কিছু শেষ করতে হবে-ভিসা, টিকেট।

আমি বলি, ঠিক আছে, দু-তিন দিনের মধ্যেই করে দেবো।

অর্চি বলে, আমি যাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে আছি।

আমি বলি, কেননা এতো পাগল হয়ে আছো?

অর্চি বলে, দেশে আমার একদম ভালো লাগছে না।

আমি বলি, পড়া শেষ করে দেশে ফিরবে তো?

অর্চি বলে, না, আমি আমেরিকান হতে চাই; সেখানেই থাকতে চাই। আমার বান্ধবীরাও ফিরবে না।

আমি বলি, তোমার আম্মুকে বলেছে?

অর্চি বলে, না, তোমাকেই আগে বললাম।

অর্চি চলে যাবে, আমার একটু কষ্ট লাগছে; ওকে মাঝেমাঝে দেখতে পাই, সাত। দিন পর পাবো না, ওর ঘরে তখন যখন ইচ্ছে যেতে পারবো, ও রেগে উঠবে না, বলবে না, আমাকে ডিস্টার্ব কোরো না। ওর মুখটি আমি মনে করতে পারবো না; শুধু ওর। ঝাঁকড়া চুলগুলোর কথা মনে পড়বে, ওর কণ্ঠস্বর বাজবে, হঠাৎ হয়তো গাড়ির হর্ন শুনে মনে হবে অর্চির কণ্ঠ শুনছি। এ-ঘরে ফিরোজা ছিলো, সে আজ রাতে ফিরবে না, মায়ের কাছে থাকবে; হয়তো নৃতাত্ত্বিকটির সাথে থাকবে, হয়তো সারারাত থাকবে না, নৃতাত্ত্বিকটি তাকে মাঝরাতে নামিয়ে দিয়ে যাবে। ফিরোজা কি এখন নৃতাত্ত্বিকের সাথে শয্যায়? ঘরটি বেশ শূন্য লাগছে, এমন শূন্য আর কখনো লাগে নি। ফিরোজা হয়তো কাল ফিরে আসবে, পরে হয়তো আর ফিরবে না। শূন্যতা থাকবে আমার জন্যে, অসীম শূন্যতা, সহ্য করতে হবে আমাকে। কিন্তু ফিরোজার জন্যে আমার কষ্ট লাগছে না, অর্চির জন্যে লাগছে, অর্চিকে আরেকবার আমার দেখতে ইচ্ছে করছে। একবার কি। অর্চির ঘরে গিয়ে অর্চিকে দেখে আসবো? অর্চি কি বিরক্ত হবে? অর্চি কি ভাববে আমি কাঁদছি? অর্চি কি আমাকে করুণা করবে? না, অর্চিকে এখন আমি দেখতে যেতে পারি না, অর্চি আমাকে দেখে কষ্ট পাবে।

অনন্যা ফোন করে বলে, জানেন, এখন পর্যন্ত আমার মাথা ঘোরাচ্ছে।

আমি বলি, তোমার বোধ হয় হাই-সিকনেস লি-সিকনেস আর ক্লসট্রোফোবিয়া রয়েছে।

অনন্যা বলে, কোন রোগ যে আমার নেই, তাই ভাবি; আমি বেশি দিন বাঁচবো না। বেশি দিন না বাঁচতে আমার খুব ভালো লাগবে।

আমি বলি, সুন্দরের আয়ু সব সময়ই কম, সকাল থেকে দুপুর।

অনন্যা বলে, আমি তো সুন্দর নই।

আমি বলি, তুমি তা জানো না, তোমার চারপাশ জানে।

অনন্যা বলে, চারপাশ তাহলে অন্ধ।

আমি বলি, গতকাল তুমি কলেজ থেকে বেরোনোর সময় যদি দেখতে আমি গেইটে দাঁড়িয়ে আছি, তোমার কেমন লাগতো?

অনন্যা বলে, আমি একটুখানি পাগল হয়ে যেতাম, একটুখানি পিছলে পড়তাম, একটুখানি অন্ধ হয়ে যেতাম। তবে একটি কথা কী জানেন?

আমি বলি, না তো।

অনন্যা বলে, গতকাল আমার বারবার মনে হচ্ছিলো আপনাকে যদি বোরোনোর সময় দেখতে পাই, যদি আপনাকে বরোনোর সময় দেখতে পাই, আপনাকে কলেজ থেকে বেরোনোর সময় দেখতে পাই যদি!

আমি বলি, এমন মনে হচ্ছিলো কেনো?

অনন্যা বলে, মাঝেমাঝে আমার অসম্ভবকে পেতে আর দেখতে ইচ্ছে করে।

আমি বলি, আমি অসম্ভব নই।

অনন্যা বলে, অসম্ভব ছাড়া আমার কিছুই ভালো লাগে না। যা আমার ভালো লাগে, তাই অসম্ভব; আপনাকে আমার ভালো লাগে, তাই আপনি অসম্ভব।

আমি বলি, খুব ভালো লাগছে শুনতে।

অনন্যা বলে, আমি অসম্ভবকে ঘিরে ঘুরতে ভালোবাসি। গতকাল কলেজ থেকে ফেরার সময় আমি চারবার রিকশা নিয়ে আপনার অফিসের চারদিকে ঘুরেছি, কী যে ভালো লেগেছে।

আমি বলি, আমি তখন সাভারে একটি কাঁঠালগাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে ছিলাম।

অনন্যা বলে, অসম্ভব!

আমি বলি, সত্য।

অনন্যা বলে, তাহলে আপনি বোধ হয় আমার থেকেও বেশি অসম্ভবকে পেতে চান।

আমি বলি, আমি কিছু পেতে চাই না।

অনন্যা বলে, আপনি বোধ হয় অনেক পেয়েছেন।

আমি বলি, তোমার কলেজ কখন শেষ হয়?

অনন্যা বলে, দুটোয়।

আমি বলি, তুমি আজ কলেজের গেইটে এক ক্ষুদ্র অসম্ভবকে দেখতে পাবে।

অনন্যা বলে, আমার সুখের শেষ থাকবে না।

আমি কলেজের গেইটে গিয়ে দাঁড়াই, পাঁচ মিনিটকে আমার পাঁচবার মহাজগত ধ্বংস আর সৃষ্টির সমান দীর্ঘ বলে মনে হয় আমার মুজো ঘেমে ওঠে, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না বলে হয়; একটি ছেলে আমার কাছে দেশলাই চায়,–পাঁচ-সাত বছরেই সে হয়তো একটা দুর্দান্ত মাননীয় মন্ত্রী হবে,-আমি দেশলাই বের করে তার সিগারেট ধরিয়ে দিই, সিগারেট চাইলেও পকেট থেকে সিগারেট বের করে দিতাম। ছেলেটির মুখ থেকে ধুয়ো এসে আমার মুখে লাগে। অনন্যা বেরিয়ে আসছে দেখতে পাই, আমি একটু কেঁপে উঠি, কিন্তু অনন্যা এমনভাবে আসে যেনো সে চারদিকের কিছুই দেখছে না, শুধু আমাকে দেখছে, দেখে দেখে সুস্থ হয়ে উঠছে। আমরা একটু। হাঁটি, হাঁটতে হাঁটতে একটু দাঁড়াই, আমাদের ঘিরে শুধু রিকশা আর বেবিট্যাক্সি জটলা পাকাতে থাকে।

আমরা এখন কী করবো? আমি বলি।

অনন্যা বলে, আপনার কাঁঠালগাছটিকে দেখতে যাবো ভাবছি, কাঁঠালগাছটিকে আমি ভুলতে পারছি না।

আমি বলি, ওটা অসম্ভব কিছু নয়।

অনন্যা বলে, কিন্তু ওর ছায়ায় আমার বসতে ইচ্ছে করছে।

আমি গাড়ি নিই নি, গাড়ি নিয়ে ওর কলেজের গেইটে যেতে আমার খারাপ লাগছিলো, আমি নিঃস্ব হয়ে ওর কলেজের গেইটে যেতে চেয়েছিলাম। আমরা একটি বেবিট্যাক্সি নিই; বহু বছর পর যেনো আমি বেবিতে চড়ছি, গতকালও চড়েছিলাম তা আমার মনে পড়ছে না। অনন্যা আমার পাশে আমি ভাবতে পারছি না, বেবিটাকে আমার ডানামেলা পাখি বলে মনে হয়। ওর শাড়ির একটি পাড় উড়ে এসে আমার নাকে লাগে। অনন্যা ব্যাগ থেকে দুটি গোলাপ বের করে গোলাপ দুটির দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে।

অনন্যা বলে, গোলাপ দুটি এখন আমি ছুঁড়ে ফেলে দেবো, ফেলতে আমার একটু কষ্ট হবে।

আমি বলি, ছুঁড়ে ফেলে দেবে কেনো? কষ্টই পাবে কেনো?

অনন্যা বলে, উচ্চমাধ্যমিকের একটি ছাত্র প্রতিদিন আমাকে দুটি করে গোলাপ দেয়, বাসায় ফেরার সময় প্রতিদিন ছুঁড়ে ফেলে দিই।

আমি বলি, তাহলে নাও কেনো?

অনন্যা বলে, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কষ্ট হয়, না করতে পারি না।

আমি বলি, আপার গভীর প্রেমে পড়েছে বালকটি।

অনন্যা বলে, আমি যখন কলেজে ঢুকি তখন সে দূর থেকে দেখে আমাকে, যখন বেরোই তখন দূর থেকে দেখে আমাকে।

আমি বলি, আজ তাহলে সে বাসায় ফিরে আত্মহত্যা করবে।

অনন্যা বলে, করতে পারে।

আমি বলি, কেমন দেখতে ওই বালক প্রেমিক?

অনন্যা বলে, বয়স বেশি হবে না, কিন্তু বেশ বড়োসড়ো, ওর পাশে আমাকে ওর বান্ধবীই মনে হবে। ক্লাশে আমার দিকে তাকাতে গিয়ে বারবার কেঁপে ওঠে।

আমি বলি, নিষ্পাপ প্রেম!

অনন্যা বলে, কিছুই নিষ্পাপ নয়।

আমি বলি, তুমি কি বোঝো ওই বালক তোমাকে মনে মনে ভোগ করে?

অনন্যা বলে, আমি খুব বুঝি। ঘুমোনোর আগে সে যে আমাকে ভেবে ভেবে। নিজেকে মন্থন করে, তা আমি বুঝি।

আমি বলি, সে হয়তো স্বপ্ন দেখে একদিন তুমি তার কাছে গিয়ে বলছে, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না, তাকে জড়িয়ে ধরছো, সে তোমাকে জড়িয়ে ধরছে, দুজন মিলিত হচ্ছে।

অনন্যা বলে, তা আমি জানি। তবে ও-ই শুধু নয়।

আমি বলি, আর কে?

অনন্যা বলে, বুড়ো প্রিন্সিপালটিও। সে নিজেকে জেসাস ক্রাইস্ট মনে করে।

আমি বলি, অধ্যাপনা তো একরকম আত্মোৎসর্গই!

অনন্যা বলে, সে ওসব জানতোই না। আমি তাকে একদিন বলি কাউকে না কাউকে তো কাঁটার মুকুট পরতেই হয়। সে বলে, কী বললেন? আমি আবার বলি কাউকে না কাউকে তো কাটার মুকুট পরতেই হয়। তখন থেকে সে মনে করে আসছে সে-ই কাঁটার মুকুট পরেছে।

আমি বলি, প্রতিটি বদমাশের ভেতরেও একটি করে জেসাস ক্রাইস্ট রয়েছে।

অনন্যা বলে, কিন্তু ওই বুড়ো জেসাস এখন প্রত্যেক দিনই আমাকে ডেকে নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, বলে, আমি আর আপনে দুইজনই কাঁটার মুকুট পরছি। সেও স্ত্রীসহবাসের সময় স্বপ্ন দেখে।

কখন যে আমরা ওই কাঁঠালগাছটিকে পেরিয়ে গেছি, খেয়াল করি নি; খেয়াল করলেও আমি চিনতে পারতাম না। আমি এক সময় বেবিঅলাকে থামতে বলি, বেবি থেকে নেমে সবুজ ঘাস আর কাঁঠালবনের দিকে আমরা হাঁটতে থাকি। অনন্যা হাঁটতে থাকে আগে আগে, এটাই আমার ভালো লাগে; মেয়েদের আগে আগে হাঁটতে আমার ভালো লাগে না। আমি হঠাৎ দেখতে পাই অনন্যার স্যান্ডলের নিচে মাটির আর ইটের টুকরো ঝিলিক দিয়ে উঠছে। একেকটি মাটির টুকরোকে ইটের টুকরোকে আমার। মাণিক্য বলে মনে হচ্ছে। আমি একটি টুকরো হাতে তুলে নিই, হাতে তুলে নেয়ার সাথে সাথে তা আবার মাটিতে পরিণত হয়, আবার ইটে পরিণত হয়; কিন্তু অনন্যা। যেখানেই পা রাখে সেখানেই আমি মাণিক্যের দ্যুতি দেখতে পাই। আমি দুটি টুকরো। আমার বুকপকেটে রাখি।

অনন্যা পেছনে ফিরে জিজ্ঞেস করে, আপনি মাঝেমাঝে কী তুলছেন?

আমি বলি, মাণিক্য।

অনন্যা বলে, দেখি।

আমি টুকরোটি তার হাতে তুলে দিই, সে হেসে উঠে বলে, এ তো মাটির টুকরো।

আমি বলি, একটু আগেই এটি মাণিক্যের টুকরো ছিলো।

অনন্যা অদ্ভুতভাবে হাসে আমার দিকে চেয়ে।

রাস্তার বাঁ পাশেই একটি কাঁটাগাছ দাঁড়িয়ে ছিলো, একটু দূর থেকে আমি ওর। কাঁটাগুলো দেখেছি, একটিও পাতা নেই, কাঁটাতারের মতো কাঁটায় আবৃত গাছটি; এখন অনন্যার শাড়ির আঁচল উড়ে গিয়ে ওই কাটার ওপর পড়েছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। সেখানে লাল লাল ফুল ফুটে উঠছে। আমি হাত বাড়িয়ে ফুল কুড়োতে যাই।

অনন্যা চিৎকার করে ওঠে, করছেন কী, করছেন কী, কাঁটায় আপনার হাত ছিঁড়ে যাবে।

আমি বলি, কাটা কোথায়, লাল লাল ফুল।

অনন্যা বলে, গাছে নয়, অন্য কোথাও।

আমরা একটি কাঁঠালগাছের ছায়ায় বসি; সবুজ রত্নের মতো ছায়া ঝরে পড়ছে। অনন্যার মুখে, আমার চুলে, অনন্যার শাড়িতে, আমার মুঠোতে। অনন্যা স্যান্ডল খুলে পা দুটি একটু সামনের দিকে বাড়িয়ে বসেছে, গম্বুজের মতো হাঁটুর ওপর রেখেছে হাত দুটি, আমি তার পাঁচটি সোনালি আঙুল দেখতে পাচ্ছি। তার আঙুল থেকে কী ঝরছে? জ্যোৎস্না? এখন রাত হলে ঘাসের ওপর আলো পড়তো, আলো দেখা যেতো; এখন আলো দেখা যাচ্ছে না, তবে আলোতে ঘাসগুলো আরো সবুজ হয়ে উঠছে। অনন্যার পায়ের পাতার নিচের ঘাসগুলো

সোনালি হয়ে উঠছে মনে হচ্ছে, এমন সোনালি ঘাস আমি কখনো দেখি নি; আমি একবার হাত বাড়িয়ে তার পায়ের নিচ থেকে একগুচ্ছ ঘাস। তুলে আনি।

অনন্যা চমকে পা সরিয়ে নিয়ে বলে, কী করছেন, কী করছেন?

আমি বলি, ঘাসগুলো সোনালি হয়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছিলো।

অনন্যা বলে, আপনি কি মাঝেমাঝে হেলুসিনেশন দেখেন?

আমি বলি, আগে কখনো দেখি নি।

অনন্যা বলে, কখন থেকে দেখছেন?

আমি বলি, আজ থেকে, সম্ভবত আজ থেকে।

অনন্যা হেসে বলে, আমার সাথে দেখা হলে প্রত্যেকেরই একটি নতুন রোগ দেখা দেয়, আমার খুব কষ্ট লাগে।

আমি বলি, আমার রোগ দেখা দেয় নি।

অনন্যা বলে, তাহলে কী?

আমি বলি, আমার রোগ সেরে যাচ্ছে।

আমি অনন্যার বা পায়ের পাতাটি আমার ডান হাতের সবগুলো আঙুল দিয়ে স্পর্শ করি; অনন্যা বলে, এ কী করছেন; কিন্তু আমি তার পায়ের পাতায় আঙুল বোলাতে থাকি। আমি একটি কবুতরের পিঠে হাত রেখেছি মনে হয় আমার; আমি তার মুখের দিকে তাকানোর সাহস করি নি, আমি জানি না সে কীভাবে তখন পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ছিলো, তার পায়ে চুমো খাওয়ার সাধ হয় আমার, আমি তার পায়ের পাতায় চুমো খাই; তার দিকে তাকাই। আমি দেখি সে চোখ খুলে ঘুমিয়ে আছে।

অনন্যা বলে, আমার কাছে মৃত্যুর মতো সুখকর মনে হলো।

আমি বলি, আমার কাছে জন্মলাভের মতো।

অনন্যা হেসে বলে, আমার ইচ্ছে হচ্ছে কাঁঠালগাছটিকে একটি বর দিই, কিন্তু বর দেয়ার শক্তি আমাদের নেই।

আমি বলি, তুমি শুধু একবার গাছটিকে ছুঁয়ে যেয়ো, তাহলে এটি চিরকাল বেঁচে থাকবে।

অনন্যা হাসতে থাকে, আমি দেখি গাছটি আরো সবুজ হয়ে উঠছে।

দু-তিনটি লোক আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেলো; খুব শান্ত নিরীহ গ্রামের মানুষ, মাছ ধরে বা খেত চষে ফিরছে।

অনন্যা বলে, এই লোকগুলো কী ভাবছে জানেন?

আমি বলি, ওরা বোধ হয় ভাবতে জানে না।

অনন্যা বলে, খুব জানে; ওরা ভাবছে আপনাকে খুন করে আমাকে যদি জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া যেতো!

সন্ধ্যায় আমাকে অফিসে নামিয়ে দিয়ে অনন্যা চলে যায়। আমিই নামিয়ে দিয়ে আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে উল্টোপথে ফিরতে হবে, তাই সে রাজি হয় নি। আমাকেই সে নামিয়ে দিয়ে যায়। দালানটিকে আমার একটি দশতলা মাণিক্যের খণ্ড মনে হয়। একবার অর্চিকে মনে পড়ে। আমার ঘরে গিয়ে টেবিলে একটি কাগজের। টুকরো পাই;–স্যার, আপনার জন্যে বসে থেকে থেকে ছটায় বাসায় যাচ্ছি, আপনার জন্যে কেমন লাগছে,- আমার সহকারিণী মেয়েটি বোধ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, পড়ে মায়া লাগলো ওর জন্যে। ওকে কি টেলিফোন করে জানাবো আমি ফিরেছি? থাক, ওর আরেকটুকু কেমন লাগুক, কেমন লাগার সময়ের মতো সুখের সময় আর হয় না; ও। আরেকটুকু সময় সুখে থাকুক। কাগজের টুকরোটি আমি ড্রয়ারে রেখে দিই। ফিরে। গিয়ে অনন্যার টেলিফোন করার কথা। অর্চিকে কি একবার টেলিফোন করবো? থাক। এমন সময় টেলিফোন বেজে ওঠে।

টেলিফোনে অনন্যা নয়, দেবী কথা বলছেন, আপনাকে দুপুর থেকে খুঁজছি, টেলিফোন করে করে পাগল হয়ে যাচ্ছি।

আমি বলি, হারিয়ে গিয়েছিলাম।

দেবী বলেন, কিন্তু আপনাকে আমার ভীষণ দরকার, এখনি দরকার; ধার চাই না, এখনি আপনাকে চাই।

আমি বলি, কোনো দুর্ঘটনা?

দেবী বলেন, অনেকের জন্যে।

কিন্তু অনন্যার টেলিফোন? আমি তার স্বর শুনতে চাই, তার স্বর দেখতে চাই, আরেকটুকু সেরে উঠতে চাই। টেলিফোন করে আমাকে না পেলে সে কি ভয় পাবে না? সে তো সব কিছুতেই ভয় পায়। ভাববে না আমি লিফটে আটকে গেছি, আমার লিফট, উঠছে আর নামছে, আমি চিৎকার করছি; কেউ শুনতে পাচ্ছে না? আমি বেরিয়ে পড়ি, দেবী আমাকে ডেকেছেন, ধার চাইছেন না, অনেকের জন্যে দুর্ঘটনা, আমি বেরিয়ে পড়ি। দেবীর বাসায় গিয়ে আমি অবাক হই। সরাসরি আমাকে তার শয্যাকক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়, আগে যা কখনো হয় নি। দেবী ভয়ঙ্কর সাজে সেজেছেন, মনেই হচ্ছে না তাঁর বয়স আটচল্লিশ, তাঁকে তনী দেবীই মনে হচ্ছে। তার পাশে এক স্বাস্থ্যবান যুবক বসে আছে। দেবী আমাকে দেখে দেবীর মতো হাসেন।

এ হচ্ছে শমশেদ মোল্লা, দেবী যুবকটির সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, জমশেদ মোল্লা সাহেবের পুত্র; আজ আমরা বিয়ে করছি।

জমশেদ মোল্লা সাহেব কোথায়? একটু চমকে একটু দুঃখ পেয়ে একটু বিবেচকের মতো আমি বলি।

তিনি সিঙ্গাপুর আছেন, দেবী বলেন, তাঁকে দরকার নেই। আপনাকে ডেকেছি আপনি সাক্ষী হবেন।

জমশেদ মোল্লা সাহেব, আমি বলি, ফিরে এসে গোলমাল করবেন না তো?

শমশেদ মোল্লা বলে, বাবারে আমি তাইলে ছিড়ুড়া ফালামু না? ভয় পাইয়েন না, বাবায় আমারে যমের মতন ডরায়।

যুবক খুবই বলিষ্ঠ, পিতার থেকেও, আমার সামনেই দেবীকে জড়িয়ে ধরে, দেবীর হাড় ভাঙার শব্দ যেনো আমি শুনতে পাই; দেবী তার বাহুর ভেতরে প্রজাপতির মতো পড়ে থাকে। কোনো ডানা ভেঙে গেছে কি না আমি বুঝতে পারি না; কিন্তু আমার অত্যন্ত সুন্দর লাগে ওই দৃশ্য। আবর্জনার ওপর চন্দ্রমল্লিকা পড়ে আছে দেখতে আমার। খুব ভালো লাগে। দেবীকে সে বাহু থেকে মুক্তি দেয় না, দেবী তার বাহুর ভেতর ভাঙতে থাকে; শমশেদ মোল্লা দেবীর গালে একটি কামড় দেয়ার চেষ্টা করে। কামড়টি দিতে। পারলে দেবীর গাল থেকে একশো গ্রাম মাংস উঠে আসতো। শমশেদ মোল্লা খুব উত্তেজিত, আজ রাতেই দেবীকে পাঁচ-সাতবার গর্ভবতী করে ছাড়বে।

এখন ছাড়ো, দেবী বলেন, অনেক সময় পাবে কামড় দেয়ার।

শমশেদ মোল্লা দেবীকে মুক্তি দেয়; দেবী আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, শমশেদ একটু জংলি, ওর জংলামোই আমার ভালো লাগে। দেখতে ইচ্ছে হয় গণ্ডারের নিচে কেমন লাগে।

শদশেদ মোল্লা বলে, তোমারে আইজও আমি পুরা পাই নাই। আইজ রাইতেই পাইতে চাই।

দেবী বলেন, পাইবা।

অর্চি আজ চলে যাচ্ছে, আমি অফিসে যাই নি, যেতে ইচ্ছে করে নি; ওকে বারবার দেখতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না, ওর ঘরে যেতে আমার সাহস হচ্ছে না, দেখে যদি আমার খুব কষ্ট লাগে, যদি ওর খুব কষ্ট লাগে। ও একবার আমাকে দেখে অবাক হয়েছে, বলেছে, তুমি অফিসে যাও নি? আমি বলেছি, আজ যাবো না; ও বলেছে, আলু, অফিসে যাও, বাসায় থাকলে তুমি কাঁদবে। আমি কাঁদি নি, অনেক বছর কাদি নি; কিন্তু ফিরোজা মাঝেমাঝে কাঁদছে।

অর্চি বলছে, আম্মু, তোমার কান্না দেখে আমার হাসি পাচ্ছে।

ফিরোজা বলছে, তোমার কান্না দেখেও একদিন কেউ হাসবে।

অর্চি কোমল হয়ে বলছে, আম্মু, কেঁদো না, আমার সাথে চলল।

ফিরোজা বলছে, যাবো।

ফিরোজা আরো কাঁদছে, অর্চিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে, আমি ঈর্ষা করছি। ফিরোজাকে, কেঁদে সে সুখী হয়ে উঠছে, আমি সুখী হতে পারছি না। ফিরোজা আর আমি কথা বলছি না, আমাদের কথা বলার কিছু নেই; অর্চি চলে যাচ্ছে তাতে কষ্ট আমাদের ব্যক্তিগত, ফিরোজারটা ফিরোজার আমারটা আমার, দুঃখটা আমাদের মিলিত নয়। আমরা অনেক দূরে সরে গেছি, দুঃখেও আমরা এক হতেপারছি না। ফিরোজা আর সবই স্বাভাবিকভাবে করছে, অর্চি আর আমাকে খাওয়াচ্ছে, দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছে, তার কান্নাভরা মুখটিকে আমার সুখের মুখ মনে হচ্ছে। বিকেলে অর্চির প্লেন, আমরা অনেকেই এসেছি, আমার অফিসের সবাই এসেছে, অর্চির নানুবাড়ির সবাই এসেছে, চাচারা এসেছে। অর্চি চলে যাওয়ার সময় আমি শুধু একটি চুমো খেলাম ওর গালে, জড়িয়ে ধরতে পারলাম না, অর্চি হেঁটে হেঁটে বান্ধবীদের সাথে বিমানে গিয়ে। উঠলো। অর্চির বিমান আমার চোখ ছিদ্র করে আমার শেষ দীর্ঘনিশ্বাসের মতো পশ্চিম আকাশের দিকে উড়ে মেঘে মিলিয়ে গেলো। অর্চি কি এখন ভয় পাচ্ছে? অর্চির কি এখন ফিরে আসতে ইচ্ছে করছে? আমি একবার অন্ধকার দেখি।

আমি গাড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম ফিরোজা আসবে মনে করে। আমি আজো এমন মনে করি? অন্যরা আমার কাছে আসছে না, বুঝতে পারছি তারা সাহস পাচ্ছে না, তারা আমার বেদনাটুকু আমাকেই অনুভব করতে দিচ্ছে, সবাই ফিরোজাকে ঘিরে আছে; সে কাঁদছে, তাকে জড়িয়ে ধরে আছে কেউ কেউ। ফিরোজা খুব সুখী। আমার সহকারিণী মেয়েটি একবার এসে দাঁড়িয়েছিলো, কিছু বলতে পারে নি। আমার একটু শূন্য মনে হচ্ছে নিজেকে। সবাই যদি আমাকে ঘিরে দাঁড়াতো, আমি কেঁদে ফেলতাম, তারা আমাকে জড়িয়ে ধরতো, আমি হাল্কা হয়ে উঠতাম; কিন্তু আমাকে ঘিরে কেউ দাঁড়াচ্ছে না, জড়িয়ে ধরছে

না। আমি বোধ হয় ফিরোজার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। আমি কি গাড়িতে উঠে চলে যাবো? আমি চলে যাচ্ছি না; আমি বোধ হয় ফিরোজার জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

তুমি যাও, আমি তোমার সাথে যাবো না, ফিরোজা বলে।

আজই, না কি কখনো যাবে না? আমি বলি।

তা পরে দেখা যাবে, ফিরোজা বলে।

আমি গাড়িতে উঠি, কিন্তু আমি কোথায় যাবো? গাড়ি চলতে শুরু করেছে, ড্রাইভার যখন শহরে ঢুকে জানতে চাইবে কোথায় যাবো, আমি কী বলবো? তাকে আমি কোথায় যেতে বলবো? আমার একটু পান করতে ইচ্ছে করছে, আমি পান করবো না, মনে হবে। আমি কাতর হয়ে পড়েছি, কাতর আমাকে দেখতে আমি পছন্দ করি না। পান করলে আমি খুব সৎ হয়ে উঠি, সরল হয়ে উঠি, নিজেকে খুলে ফেলি, আমি পান করবো না। শহরে ঢুকে আমি ড্রাইভারকে ছেড়ে দিই, হাঁটতে থাকি। সন্ধ্যা বেশ গভীরভাবে নেমেছে, সন্ধ্যা কি এভাবেই নামে সব সময়, না কি আজ অন্যভাবে নেমেছে। প্রতিটি আলোর রেখাকে রহস্যময় মনে হচ্ছে। কোথায় যেতে পারি আমি এখন? অর্চির কি কষ্ট লাগছে? অর্চির কি ফিরে আসতে ইচ্ছে করছে। অর্চির মুখটি কেমন? অর্চি কতো বড়ো? ওর চুল কি ঝাঁকড়া, ঢেউখেলা, পিঠের ওপর ছড়ানো? ও কি কোনো দিন ফিরে আসবে? ফিরোজা কি আজ নৃতাত্ত্বিকটির সাথে থাকবে অনন্যা এখন কী করছে? তাকে প্রতিদিন দুটি গোলাপ দেয় তার এক ছাত্র। আমি একটি পানশালায় ঢুকে পড়ি; একটু পান করি। পান করতে আমার ইচ্ছে করছে না, চারপাশের সবাই খুব কষ্টে আছে। আমি কারো « মুখ দেখতে পাচ্ছি না,

কিন্তু মনে হচ্ছে তারা খুব কষ্টে আছে, আমার থেকে অনেক কষ্টে আছে। একটি লোক বারবার কেঁদে উঠছে। তার কি মেয়ে মারা গেছে, একমাত্র মেয়ে? একটি কবি এসেছে বোধ হয় পানশালায়, সে বারবার সবার পা ধরে মাফ চাচ্ছে, তাকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্যে আবেদন জানাচ্ছে, কেউ তাকে ক্রুশবিদ্ধ করছে না বলে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি কি তাকে ক্রুশবিদ্ধ করার ভারটি নেবো? তার কোনো ভক্ত নেই, যে ওই কাজটি করতে পারে? লোকটিকে আমার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে, সে কততগুলো পচা পদ্য লিখেছে আমি জানি না, তাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। আমি বেরিয়ে পড়ি। একটি রিকশা নিই আমি, রিকশাটি অনন্যাদের বাড়ির রাস্তায় এসে উপস্থিত হয়, রিকশাটি বোধ হয় অনন্যার ঠিকানা জানে, অনন্যার গন্ধ শুকে শুকে এখানে এসে। গেছে। আমি রিকশা থেকে নেমে পড়ি। এখানেই তাকে নামিয়ে দিয়েছিলাম আমি? আমি রাস্তার এক কোণে দাঁড়াই, আমার একটু সুখ লাগছে, তাহলে এখানেই কোথাও অনন্যা থাকে, আমি দাঁড়িয়ে থাকি। মানুষের মুখগুলো আমার অদ্ভুত লাগতে থাকে। শহর কি দেবতায় ভরে গেছে, দেবীতে ভরে গেছে? সবাইকে আমার দেবতা আর দেবী মনে হচ্ছে। একটি লোক আমাকে সালাম দেয়, তাকে আমি চিনতে পারি না; লোকটি অবাক হয়ে সরে পড়ে। আমি রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে হাঁটতে থাকি। আমি। দেখতে পাই অনন্যা হাতের ঘড়ি দেখতে দেখতে একটি রিকশায় চলে গেলো, আমি তাকে ডাকতে চেষ্টা করি, আমার গলা থেকে কোনো শব্দ বেরোয় না।

কখন বাসায় ফিরেছি আমি জানি না, কাজের মেয়েটি দরোজা খুলে দিয়ে আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকায়। আমি আমার ঘরে গিয়ে দরোজা বন্ধ করে দিই। শুধু টেলিফোন বাজছে, টেলিফোন বাজছে, পৃথিবীতে আর কিছু নেই টেলিফোনের শব্দ। ছাড়া, আমি কোনো টেলিফোন ধরছি না, পৃথিবীর সাথে কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না। আমি একটি বোতল বের করি, পান করতে থাকি। অর্চি কি কষ্ট পাচ্ছে তার কি ফিরে আসতে ইচ্ছে

করছে? তার কি প্লেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছে হচ্ছে? আমার। ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছে হচ্ছে, মনে হচ্ছে আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছি, আমাকে ঘিরে আছে। অন্ধকার আকাশ। আমি নদীর পর নদী দেখতে পাচ্ছি, নদীর ওপর আমার ব্রিজগুলো দেখতে পাচ্ছি, মেঘবতী, যমুনা, করতোয়া, ফুলঝরি, ফুলমতি, সুরমা, একটির পর একটি ব্রিজ ধসে পড়ছে, ধসে পড়ার দৃশ্য আমার কাছে সুন্দর লাগছে। ফিরোজা কি এখন নৃতাত্ত্বিকটির বিছানায়? ফিরোজার বা স্তনটি লাফিয়ে উঠছে আমার চোখের সামনে, সেটিতে দুটি বড়ো বড়ো তিল আছে, আমার কামড়ের দাগ হয়তো মুছে গেছে। যতোই বয়স বাড়ছে ততোই সুন্দর হচ্ছে ওর স্তনযুগল। অনন্যা কী করছে, ঘুমোচ্ছে? তার ছাত্রটি? কতোগুলো গোলাপ সে ফেলেছে এ-পর্যন্ত? অনন্যা কি কখনো ঘুমিয়েছে কারো সাথে? তার ছাত্রটির সাথে? স্যার, আপনার জন্যে বসে থেকে থেকে ছটায় বাসায় যাচ্ছি, আপনার জন্যে কেমন লাগছে; লাগুক। আমি কি একবার ফোন করবো আমার সহকারিণীটিকে? অনন্যাকে না, আমি কাউকে ফোন করবো না। কলাপাতাটি কি বেঁচে আছে, মাহমুদা রহমান উদ্ধার পেয়েছেন? এখন হিন্দি ছবির যে-মেয়েটি নাচছে, তার বগলের লোমগুলো আমার ভালো লাগছে, ওর বগলের লোমে কে কে কে কে কে কে জিভ রাখে? অনন্যার বগলে কি লোম আছে? অনন্যা কি শেভ করে? বাঙালি। মেয়েগুলো শেভ করে, ওরা কোথায় শিখেছে কে জানে, বিচ্ছিরি লাগে; হয়তো অনন্যাও শেভ করে। মাহমুদা রহমান করত, দেবী করতো, ফিরোজাও করতো। আমাদের। কাজের মেয়েটিও বোধ হয় করে। নইলে আমার ফেলে দেয়া ব্লেডগুলো পাই না কেনো? আবদুর রহমান সাহেব কি এখনো সেই কাজের মেয়েটিকে নিয়েই থাকেন? না কি বদল করেছেন? বউ মারা যাওয়ার পর তিনি আরো ভালো আছেন; বছর বছর কাজের মেয়ে বদলাচ্ছে। তিনি আর বিয়ে করবেন না, প্রিয়তমা স্ত্রীর শোক ভুলতে পারছেন না, কাজের মেয়ে বদলাচ্ছেন, কাজের মেয়ে বদলাচ্ছেন।

৮. এখন যে-ফোনটি বাজছে

এখন যে-ফোনটি বাজছে, সেটি অনন্যার, শব্দ শুনেই বুঝতে পারছি; কিন্তু আমি। ধরতে এতো দেরি করছি কেনো? আমি কি ফোন ধরবো না? অথচ আমি আজ অফিসে এসেছি শুধু অনন্যার ফোনেরই জন্যে। কিন্তু আমি ফোন ধরছি না কেনো? ফোন একবার থামলো, আবার বাজতে শুরু করলো; অনন্যা অনেকক্ষণ ফোন ধরে রাখতে পারে, আবার থামলো, বাজতে শুরু করলো আবার। আটটা চল্লিশ বেজে গেছে, তবু অনন্যার ফোন বাজছে, সে কি তার নটার ক্লাশ ধরবে না? আজ তার নটার ক্লাশ নেই? কেননা নেই? তার কি অসুখ করেছে? সে কি যাবে কোথাও? তার কতোটুকুই আমি। জানি, আসলে কিছুই জানি না, জানতেও চাই না। তার ছাত্রটি তাকে কতোগুলো গোলাপ দিয়েছে এ-পর্যন্ত গোলাপ দিতে গিয়ে ছেলেটা অনন্যার হাত ছোঁয় না? অনন্যার তখন কেমন লাগে? অনেকক্ষণ আঙুল লেগে থাকে? ঘাস কি সত্যিই সোনালি হয়ে উঠেছিলো? আমি কি হেলুসিনেশন দেখি? আমি এবার ফোন ধরি।

আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, অনন্যা বলে, আপনি ফোন ধরছেন না দেখে। আধঘণ্টা ধরে রিং করছি।

তুমি আজ কি কলেজে যাচ্ছো না? আমি বলি।

না, আজ আর যাবো না; বুক কষ্টে ভরে গেছে, অনন্যা বলে।

তোমার ছাত্রটি গোলাপ কাকে দেবে তাহলে? আমি বলি।

আপনি কি ওকে ঈর্ষা করেন? অনন্যা বলে।

একটু ভেবে দেখতে হবে, আমি সম্ভবত মিথ্যা বলি।

আপনার কি অসুখ করেছে? অনন্যা বলে।

না তো, আমি বলি।

কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার অসুখ করেছে, অনন্যা বলে।

তুমি কি আমাকে সারিয়ে তুলতে পারো? আমি বলি।

নিজেকেই আমি সারাতে পারি না, আপনাকে কীভাবে সারাবো? অনন্যা বলে।

কিন্তু আমার মনে হয় তোমার আঙুলে আরোগ্য আছে, আমি বলি।

অনন্যা হাসে, আমি তার হাসি দেখতে থাকি; সে বলে, তাহলে আপনি আপনার সিংহাসনে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করুন, আমি ম্যাসাজ করে দিই।

আমি অনন্যার স্পর্শ অনুভব করতে থাকি; দশটি স্বর্ণচাপা আমার চুলের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে, আমার চোখের পাতার ওপর দিঘির ওপর কালো ছায়ার মতো স্থির হয়ে আছে,

স্বর্ণচাপা বয়ে চলছে আমার নাকের ওপর দিয়ে মুখের ওপর দিয়ে আমার গ্রীবার ওপর দিয়ে বুকের ওপর দিয়ে পিঠের ওপর দিয়ে আমার মাংসের ভেতর দিয়ে আমার রক্তের ভেতর দিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ছি স্বর্ণচাপা বয়ে চলেছে নদী বয়ে চলেছে ছায়া। স্থির হয়ে আছে আমি ঘুমিয়ে পড়ছি আমি স্বর্ণচাপা দেখছি ঘাস সোনালি হয়ে উঠছে পায়ে চুমো খাচ্ছি আমি অনুভব করছি আমার বুকের ওপর কে যেনো মাথা রাখছে অনন্যার শরীরের গন্ধ পাচ্ছি অনন্যার শাড়ির গন্ধ পাচ্ছি স্বর্ণচাপার গন্ধ পাচ্ছি।

একটু কি ভালো লাগছে। অনন্যা বলে।

খুব ভালো লাগছে, আমি বলি।

আমাকে কি আপনার দেখতে ইচ্ছে করছে না? অনন্যা বলে।

আমি তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, আমি বলি।

কিন্তু আমি তো আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না, অনন্যা বলে।

দুপুরে একসাথে খেলে কেমন হয়? আমি বলি।

বেশ হয়, অনন্যা বলে।

কোথায়? আমি বলি।

অনন্যা তার প্রিয় রেস্তোরাঁটির নাম বলে। চিংড়ি। অনন্যার একটি প্রিয় রেস্তোরাঁ আছে! অনন্যা টেলিফোন রাখতেই মাহমুদা রহমানের ফোন বেজে ওঠে, আমাকে এখনি তাঁর ওখানে যেতে হবে। আমার কোনো কাজ নেই, তবু বলি আমার অনেক কাজ; মাহমুদা রহমান তা শুনতে রাজি নন, আমাকে যেতেই হবে, এখন না গেলে হবে না। আমি গিয়ে দেখি মাহমুদা রহমান আর হাফিজুর রহমান দুজন দু-সোফায় বসে। আছেন। তারা কথা বলছেন না। আমাকে দেখে হাফিজুর রহমান মাথা আরো নামিয়ে নিলেন। কাউকে অপরাধীর মতো বসে থাকতে দেখলে আমার খারাপ লাগে, আমার খারাপ লাগলো। আমাদের সবারই তো অপরাধীর মতো বসে থাকার কথা, কিন্তু আমরা সবাই পুণ্যবানের মতো বসি, শুধু কেউ কেউ বসে অপরাধীর মতো।

আপনি আমাকে উদ্ধার করলেন না, মাহমুদা রহমান বলেন, কিন্তু আমি উদ্ধার করেছি নিজেকে, জানেন?

আমি বলি, না।

মাহমুদা রহমান বলেন, মেয়েটিকে খুন করি নি, বিয়ে দিয়েছি।

আমি বলি, কোথায়?

মাহমুদা রহমান বলেন, আমাদের ড্রাইভারের ভাগনের সাথে, দু-লাখ টাকা দিতে হয়েছে, বাচ্চাটা তারই হবে।

হাফিজুর রহমান বলেন, বাচ্চাটিকে আমি নিয়ে আসবো।

মাহমুদা রহমান বলেন, তা আনবে, পোলা হলে তো আনবেই, পোলার বাপ হবে আলহজ মোঃ হাফিজুর রহমান।

হাফিজুর রহমান বলেন, আজ আমি চলে যাচ্ছি, আগামী মাসে ডেলিভারির সময় আবার আসবো।

মাহমুদা রহমান বলেন, আজ চলে যাচ্ছে, কিন্তু বুকে একটা দাগ নিয়ে যেতে হবে তোমাকে। আমি একটু প্রতিশোধ নিতে চাই।

হাফিজুর রহমান বলেন, কী প্রতিশোধ?

মাহমুদা রহমান বলেন, আমি মাহবুব সাহেবের সাথে আজ রাতে ঘুমোবো এটুকু শুধু তোমাকে জানিয়ে রাখতে চাই। তুমি কিছু মনে কোরো না, মাহবুব সাহেবকে আমি পছন্দ করি, তাঁকে দেহটি দিতে চাই।

আমি কোনো কথা বলি না; ভালো মানুষের মতো বলতে পারি না, এ কী বলছেন, এ কী বলছেন, আমি চুপ করে থাকি, একটা সৎ মানুষের ভূমিকায় অভিনয় করতে আমার ভালো লাগছে না। হাফিজুর রহমানের মুখ কঠিন হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু তিনি আরো ভেঙে পড়ছেন; তিনি বানিয়েই বলতে পারতেন, তাতো তোমরা ঘুমাই, কিন্তু তার মুখে কোনো

কথা আসে না। তাতে মাহমুদা রহমান সুখ পাচ্ছেন না, তিনি সুখ পেতেন যদি হাফিজুর রহমান সাড়া দিতেন। সাড়া জাগানোর জন্যে মাহমুদা রহমান। তীব্র হয়ে উঠতে থাকেন।

আমি শুধু ঘুমোবা না, মাহমুদা রহমান বলেন, আমি মাহবুব ভাইয়ের দ্বারা প্রেগন্যান্ট হবো।

হাফিজুর রহমান একবার নড়েচড়ে বসেন, আমি পাথর হয়ে যাই।

মাহবুব ভাই রাজি না হলে, মাহমুদা রহমান বলেন, আমি আমার ড্রাইভারের সাথে ঘুমোবো, ড্রাইভারের দ্বার প্রেগন্যান্ট হবো।

হাফিজুর রহমান এবার নড়েচড়ে বসতেও পারেন না, একটু কাৎ হয়ে পড়েন সোফার ওপর।

মাহমুদা রহমান বলেন, ড্রাইভার রাজি না হলে ড্রাইভারের ভাগনের সাথে ঘুমোবো, আমি পেটে তার একটা পোলা নেবো।

আমি উঠে পড়ি, কোনো কথা বলি না। অনন্যার প্রিয় রেস্তোরাঁয় যেতে হবে আমাকে, সে বলছে সেটি খুব সুন্দর, ঢুকলেই মন ভরে যায়। মেয়েরা একটু পরেই আসে বলে জানি আমি, তাই একটু দেরি করেই ঢুকি, গিয়ে দেখি অনন্যা। আলোঅন্ধকারাচ্ছন্ন এক কোণে বসে আছে। সে বসে আছে দেখে আমি বিব্রত হই, আমারই আগে আসা উচিত ছিলো।

একা একা অপেক্ষা করতে আমার ভালো লাগে, অনন্যা বলে, তাই আমি একটু আগেই এসে বসে আছি।

দেরি করে আসতে আমার খারাপ লাগে, আমি বলি, আরেকটুকু আগে এলে তোমাকে আরেকটুকু বেশি দেখতে পেতাম।

তাহলে একটু দেরি করে বেরোবো আমরা, অনন্যা বলে।

কিন্তু আগের সময়টুকু কোথায় পাবো? আমি বলি।

আমি কোনো খাবারের নাম মনে রাখতে পারি না, কিন্তু অনন্যার দেখছি সব মুখস্থ, হয়তো নম্বরগুলোও মুখস্থ। সে একেকটির নাম, রেসিপি, আর স্বাদ বলতে থাকে, তার ঠোঁট থেকে নামগুলো খুব সুস্বাদু হয়ে বেরোচ্ছে। অনেক বছর পর খাবার আমার কাছে সুস্বাদু মনে হয়। আমি সুপ নেড়ে নেড়ে চিংড়ি খুঁজতে থাকি, অনন্যা চমৎকার মশলা। মিশিয়েছে সুপে, তার আঙুল থেকে সুস্বাদ গলে গলে নেমেছে সুপের পেয়ালায়। আমার মনে পড়ে প্রথম যেদিন চোচিংচোতে সুপ খেয়েছিলাম, সেদিন আমার খুব হাসি পেয়েছিলো।

আমি যদি সেদিন মরে যেতাম তাহলে আপনার সাথে দেখা হতো না, অনন্যা বলে।

আমি একটি সুন্দর লাশ দেখতে পেতাম, আমি বলি, খুব কষ্ট লাগতো; জানতে ইচ্ছে করতো জীবিত সে কেমন ছিলো।

আমাকে আপনার কেমন লাগে? অনন্যা বলে।

ভালো ও সুন্দর, আমি বলি।

সুন্দর দেখলে আপনার কেমন লাগে? অনন্যা বলে।

আমি কোনো উত্তর দিই না, দিতে পারি না, আমি যেনো বুঝে উঠতে পারছি না সুন্দর দেখলে আমার কেমন লাগে।

বলুন, আমার শুনতে ইচ্ছে করছে, অনন্যা বলে।

আমার সম্পূর্ণরূপে ভোগ করতে ইচ্ছে করে, আমি বলি, ছেলেবেলায় আমি চাঁদটাকে জড়িয়ে ধরে কামড়াতে চাইতাম।

আপনি তো ভয়ঙ্কর, অনন্যা বলে, সব কিছুকেই কামড়াতে চান?

চুলোর লাল টুকটুকে আগুনকেও আমার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করতো, আমি বলি, সম্পূর্ণরূপে ভোগ করতে ইচ্ছে করতো।

আমাকে ভোগ করতে আপনার ইচ্ছে করছে না? অনন্যা বলে।

আমি অনন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, ঘাস সোনালি হয়ে উঠছে দেখতে পাই।

না, আমি বলি।

কেনো? অনন্যা বলে।

তোমাকে আমার সুন্দরের থেকে বেশি মনে হয়, আমি বলি।

তাতে কী? অনন্যা বলে।

আমি তা বুঝতে পারছি না, আমি বলি, তবে আজো তোমাকে ভোগ করার কোনো ইচ্ছে আমার হয় নি। কোনো দিন হতে পারে।

আপনার চোখ দেখে আমি তা বুঝতে পারি, অনন্যা বলে, কিন্তু জানেন আমি যেখানেই যাই সবাই আমাকে ভোগ করতে চায়, হয়তো সব মেয়েদেরই চায়।

আমিও সাধারণত চাই, আমি বলি।

আমার ছাত্রটি আমাকে ভোগ করতে চায়, অনন্যা বলে, ওই গোলাপের অর্থ আমি বুঝি।

চুপ করে হাসে অনন্যা, এবং বলে, বুড়ো প্রিন্সিপালটি আমাকে ভোগ করতে চায়। ইলেক্ট্রিক বিল দিতে গেলে কেরানিটি এমনভাবে তাকায়! কোর্টে আমাদের একটি মামলা আছে,

আমিই দেখাশোনা করি, আমাদের প্রত্যেকটি উকিল আমাকে ভোগ করতে চায়, আমি বুঝি, তাদের চার পাঁচটি করে বাচ্চা আছে।

খোঁড়া ভিখিরিকে পয়সা দেয়ার সময় খেয়াল কোরো, দেখবে সেও তোমাকে ভোগ করতে চাচ্ছে, আমি বলি, মনে মনে ভোগ করছে।

এমনকি আমার তিনটি সহকর্মিণীও চাচ্ছে, অনন্যা বলে, আমি ওদের সাথে ভোগে সঙ্গী হই।

তা চাইতে পারে, আমি বলি, সব সময় পুরুষ লাগে না।

ওরা হোস্টেলে থাকে, অনন্যা বলে, আমাকে জোর করে নিয়ে যায়, ভালো খাওয়ায়, আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওরা ঘুমোয়, আমাকে কিছু বলে না।

ওরা ভাবছে এক সময় তুমি নিজেই অংশ নেবে, আমি বলি।

আমি শিগগিরই বোধ হয় অনেক দূরে চলে যাবো, অনন্যা বলে, কষ্ট হয় আপনার সাথে দেখা হবে না।

কোথায় যাবে, কেননা দেখা হবে না? আমি বলি।

আমি নিজেও জানি না, অনন্যা বলে, হয়তো কেউ জানবে না। তার আগে আমরা একদিন বেড়াতে যাবো।

তার আগে তুমি আমার সাথে বেড়াতে যাবে, আমি বলি, তাহলে আমি তোমার সাথে কোনো দিন বেড়াতে যাবো না। তখন তুমি আর অনেক দূরে যেতে পারবে না।

বেড়াতে না গেলেও হয়তো আমাকে চলে যেতে হবে, অনন্যা বলে, চলুন না। আজই বেড়াতে যাই।

না, না, না; আমি বেড়াতে যাবো না, আমি বলি।

অনন্যাকে আজ মধুরতম মনে হচ্ছে, আর কিছুক্ষণ থাকলে হয়তো আমার বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করবে, হয়তো তাকে ভোগ করার বাসনা জেগে উঠবে, আমার রক্ত জ্বলে উঠবে। আমি উঠে পড়ার প্রস্তাব দিই, অনন্যা আরো কিছুক্ষণ থাকতে চায়, কিন্তু আমি উঠতে চাই।

আপনার কি কোনো জরুরি কাজ আছে? অনন্যা বলে।

না, কোনো কাজ নেই; বেরিয়ে কোথায় যাবো, তাও জানি না; কিন্তু আমি উঠতে চাই।

কেনো? অনন্যা বলে।

আর কিছুক্ষণ থাকলে আমার মনে ভোগ করার সাধ জাগবে, আমি বলি।

জাগুক না, অনন্যা বলে।

আমি অনন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি; কিন্তু এখনো আমার ভোগ করার সাধ জাগছে না, অনন্যার শরীর পরিমাপ করার আগ্রহ হচ্ছে না, মনে হচ্ছে আমার ভেতর। কোনো পুরুষ নেই, লিঙ্গ নেই। অদ্ভুত লাগে আমার।

আমাকে দেখে যাদের সাধ জেগেছে, অনন্যা বলে, তাদের জন্যে আমার কোনো সাধ জাগে নি; আমার ইচ্ছে হচ্ছে যার জন্যে আমার সাধ জেগেছে আমার জন্যে তার একটু সাধ জাগুক।

হয়তো কোনো দিন জাগবে, আমি বলি।

তখন হয়তো আমি থাকবো না, অনন্যা বলে।

অনন্যা ওঠে, আমি তাকে একটি রিকশয় উঠিয়ে দিই। অনেকক্ষণ রিকশটির দিকে তাকিয়ে থাকি। একটু আগে আমার মনে হচ্ছিলো কোথায় যাবো আমি জানি না, কিন্তু এখন আমার তা মনে হয় না। আমার বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করে। খুব দুঃখ পেলে আমি খুব সুস্থ হয়ে উঠি। ছেলেবেলা জেগে ওঠে আমার মধ্যে, যখন আমি চরম কষ্টে পড়ি তখনি এটা হয়, দুঃখ পেলে আমি কেমন করে যেনো নিজেকে গুটিয়ে আনি নিজের মধ্যে। এখন যদি আমি রাস্তায় বসে ভিক্ষে চাইতে শুরু করতাম, সেটা অস্বাভাবিক। হতো না, আমার ভেতরটা তেমনি করছে; যদি আমি ট্রাকটির নিচে ঝাঁপিয়ে পড়তাম, সেটা অস্বাভাবিক হতো না,

আমার ভেতরটা তেমনি করছে; কিন্তু আমি বাসার দিকে হাঁটতে থাকি। একটি রিকশ নিই, কাজের মেয়েটি আমাকে দেখে অবাক হয়। মেয়েটির মুখ দেখে ওকে নিঃসঙ্গ লাগে, ও আমার থেকেও নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে। একটু হুইস্কি খাবো? না। একটা এক্সএক্সএক্স ছবি দেখবোর না। আমার সহকারিণীটিকে ফোন করবো? না। আমি আমার বইগুলো আবার খুঁজতে শুরু করি, অনেক দিন বই পড়ি নি, একটি পাগলা কবির কবিতার বই আমার হাতে পড়ে, এককালে ওর কবিতা ভালো। লাগতো, ওর পাগলামো আমি পছন্দ করতাম; আমি পড়তে শুরু করি, পাগলামো। আমার আবার ভালো লাগতে শুরু করে। আমি ওর কবিতা পড়তে থাকি, উঁচুকণ্ঠে ..পড়তে থাকি, আমার মুখস্থ হয়ে যেতে থাকে, বাইরে সন্ধ্যা হয়ে যেতে থাকে। বারবার ফোন বাজতে থাকে, আমি ধরি না, আমার কোনো বাইরের জগৎ নেই। কিন্তু ফোনের শব্দে আমার চারপাশ ভেঙে পড়তে থাকে; আমি ফোন ধরি।

মাহবুব সাহেব, মাহমুদা রহমান বলেন, আপনাকে পাবো ভাবি নি, কিন্তু একটি খবর দেয়ার জন্যে আপনাকে চারদিকে ফোন করছি।

কী খবর বলুন?

এয়ারপোর্ট যাওয়ার পথে হাফিজের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, মাহমুদা রহমান বলেন, হাফিজ মারা গেছে।

আমি খুব দুঃখিত, আমি বলি, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

কিন্তু আমার কোনো কষ্ট লাগছে না, মাহমুদা রহমান বলেন।

হাফিজুর রহমানের লাশ দেখতে কি যেতে হবে আমাকে? মাহমুদা রহমান আমাকে যেতে বলেন নি, আর হাফিজুর রহমান বলে কেউ ছিলেন, তাঁর সাথে আমার পরিচয়। ছিলো, আমার মনে পড়ে না; তার চেহারা কেমন ছিলো? আমার মনে পড়ে না। অর্চিকে মনে পড়ে আমার, অর্চির মুখটি মনে পড়ে না। অর্চি কি পৌঁছে ফোন করেছে? অর্চি কি পৌচেছে? অর্চির প্লেন কি এখনো উড়ছে, চিরকাল উড়তে থাকবে? অর্চির এখন ফিরে আসতে ইচ্ছে করছে? অর্চি কে? আমার মেয়ে? অর্চির অনেক ছবি আছে অ্যালবামে, এখনি আমি বের করে দেখতে পারি, দেখতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু দেখতে গেলে ছবিগুলো যদি কাঁদে, ছবিগুলোর চোখে যদি জল দেখা দেয়? অনন্যা কি বাসায় ফিরেছে, না কি। সে অনেক দূরে যাবে বলেছে, অনেক দূরে যাত্রা করেছে? কতো দূর যাবে? আমি কি অনন্যাকে একবার ফোন করবো? আমি ফোন করলে সে ভয় পাবে, মনে হবে আমার কিছু হয়েছে।

ফিরোজা ফোন করেছে, তার বেশি কথা নেই, একটি মাত্র তার কথা।

আমি তোমার থেকে পৃথক থাকতে চাই, ফিরোজা বলে।

ঠিক আছে, আমি বলি।

ফিরোজার কথা আমার মনেই পড়ে নি কয়েক দিন, তার ফোন পেয়ে মনে হলো সে আমার স্ত্রী ছিলো, এখনো আছে; তবে এখন দূরে থাকতে চায়, কিছু দিন পর হয়তো। বিচ্ছেদ চাইবে। একলা থাকতে আমার খারাপ লাগছে না, ব্রিজ ভেঙে পড়লে ব্রিজের খারাপ লাগে

না, খারাপ লাগে অন্যদের, আমার খারাপ লাগছে না। আমার ব্যক্তিগত সহকারিণীটিকে খুব বিষণ্ন দেখাচ্ছে, বিষণ্নতায় সে সুন্দর হয়ে উঠছে। কার জন্যে, কী জন্যে?

তোমাকে এতো বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেনো? আমি বলি।

সে চমকে ওঠে, আমার থেকে সে এমন প্রশ্ন আশা করে নি; কিন্তু আমার প্রশ্ন শুনে সে খুশি হয়ে উঠছে।

কই, না স্যার, এমনি, সে বলে।

বিষণ্ন হওয়ার কথা আমার, আমি বলি।

কেনো স্যার? সে বলে।

আমার মেয়ে চলে গেছে, বউ পৃথক থাকতে চাচ্ছে, আমি বলি।

মেয়েটি আবার বিষণ্ন হয়ে পড়ে।

আমাদের লিমিটেড এখন গোটা দশেক ব্রিজের কাজ করছে, তার মধ্যে একটি বড়ো ব্রিজ রয়েছে, কিন্তু এখন আমি ভাবছি সুড়ঙ্গপথের কথা। ব্রিজ দেখে দেখে আমার ক্লান্তি এসে গেছে। যে-শহরটিতে আমি থাকি, সেটি জঙ্গলে পরিণত হয়ে গেছে, ওর দম আটকে আসছে, ওর রাস্তাগুলো নিশ্বাস ফেলতে পারছে না। আমি সুড়ঙ্গপথের কথা। ভাবছি, একটি

পরিকল্পনা এসেছে আমার মাথায়। শহরের কেন্দ্র থেকে উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিমে সুড়ঙ্গ খোঁড়া যেতে পারে, তার পরিকল্পনা করছি আমি মনে মনে, কিছুটা। কাগজে কম্পিউটারে; আমার মনে হচ্ছে এটা করার এখন সবচেয়ে ভালো সময়। আমার। আমার শরীরকাঠামো ততোদিন টিকবে না, আমি একটিও সুড়ঙ্গপথ দেখে যাবো না, কিন্তু তার পরিকল্পনা করার এটাই ভালো সময়। আমাদের কয়েকজনের। সাথে আমি আলাপ করেছি, তারা হেসেছেন, একজন আমাকে স্বপ্নদ্রষ্টা উপাধি দিয়েছেন, কিন্তু আমার ভালো লাগছে। বাস্তবের থেকে স্বপ্নকেই বেশি ভালো লাগছে আমার।

অনেক দিন পর নুর মোহাম্মদ আর বেগম নুর মোহাম্মদকে দেখে ভালো লাগলো আমার আগের মতোই বারান্দায় তারা একজন দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন, চোখ আরেকটুকু ঘোলা হয়েছে মনে হয় নুর মোহাম্মদ সাহেবের; আরেকজন চায়ের। পেয়ালা নিয়ে পুব দিকে তাকিয়ে আছেন, চা খাচ্ছেন না। আমার কি বেশ ভালো। লাগলো? কী সুখ এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বসে থেকে? তাঁরা কী করে পারছেন? তাঁদের ক্লান্তি লাগছে না? ক্লান্তিকে তাঁরা এতো মহৎ করে তুলছেন কীভাবে? একদিন আমি। তাদের সাথে গিয়ে বসবো? আলাপ করবো? তারা কি আলাপ করবেন আমার সাথে? তার কি বুঝতে পারছেন তাঁরা ক্লান্ত? একটি বেজি দৌড়ে ওপাশের জঙ্গলে ঢুকলো, বেজিটাকে আমার ঈর্ষা করতে ইচ্ছে করছে; নুর মোহাম্মদদের ঈর্ষা করছি না। অনেক দিন ধরে আমি কাম বোধ করছি না, আমার একটু বোধ করতে ইচ্ছে করছে; আজ অফিসে গিয়ে দেখবো সহকারিণীটিকে দেখে আমার কামবোধ হয় কি না।

আপনার সাথে বেড়াতে যেতে চাই, অনন্যা ফোনে বলছে, আপনি কেনো রাজি হচ্ছেন না?

তাহলেই তো তুমি অনেক দূরে চলে যাবে, আমি বলি।

চলে যে যাবোই তা তো আমি নিশ্চিতভাবে জানি না, অনন্যা বলে, যেতেও পারি, তার আগে চলুন না গাছ দেখে আসি নদী দেখে আসি।

আমি নদী আর গাছ অনেক দেখেছি, আমি বলি।

একলা নদী দেখা একলা গাছ দেখার থেকে দুজনে গাছ আর নদী দেখা ভিন্ন, অনন্যা বলে।

আমার থেকে সবাই আজকাল দূরে চলে যেতে চায়, আমি বলি।

আজ আমার আব্বার মৃত্যুর দিন, অনন্যা বলে, তাই আজ বেড়াতে যেতে খুব ইচ্ছে করছে।

তোমার আব্বা নেই? আমি বলি, তুমি তো কখনো বলে নি।

অনন্যা কাঁদতে থাকে, আমি তার কান্না দেখতে পাই।

চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি, অনন্যা বলে।

না, আমি বলি।

আমার সহকারিণীটিকে দেখে আমি কামবোধ করছি, সে এখন অনেক বেশি স্বাভাবিক হয়ে উঠছে আমার সামনে, মাঝেমাঝে দু-একটি কথা বলছে, ঝিলিকের মতো লাগছে আমার।

স্যার, আজকে কি আমাকে বিষণ্ন লাগছে? সে বলছে।

না, খুব ঝলমলে দেখাচ্ছে, আমি বলি।

আমাকে তো আপনি পছন্দ করেন না, স্যার, সে বলে।

কে বললো তোমাকে? আমি বলি।

আমার মনে হয়, সে বলে, আমার একটি খবর আপনাকে দিতে ইচ্ছে করছে, স্যার।

বলো, আমি বলি।

আমার বিয়েটা কয়েক দিন আগে ভেঙে গেছে, সে বলে, এখন ভালো আছি, স্যার।

আমার সাথে তুমি আজ বেড়াতে যাবে? আমি বলি।

যাবো, সে বলে।

আমি ফোন করে পাঁচতারা হোটেলের দশতলায় একটি কক্ষ বুক করি, দেবীর সাথে গিয়েছিলাম যে-কক্ষটিতে।

আমি আজ তোমাকে ছুঁতে চাই, আমি বলি।

আমিও চাই, সে বলে।

আমরা দশতলার কক্ষটিতে প্রবেশ করি, মেয়েটি উড়ছে বলে মনে হচ্ছে; গাড়িতে প্রজাপতির মতো করছিলো, বারবার জানালার কাঁচে লেগে ফিরে ফিরে আসছিলো। ভেতরে, বদ্ধতা বোধ হয় তার সহ্য হচ্ছিলো না। আমি ঘরে ঢুকে তার দিকে তাকাই, আমাকে সে জাগিয়ে তুলছে মনে হচ্ছে। আমি এতো দিন খেয়াল করি নি সে একটি চমকার শরীর, হাঁটার সময় অনেকটা নাচার মতো ভঙ্গি করে। এক সময় হয়তো। নাচতো, এখনো নাচে? তাকে আমি কী করে জড়িয়ে ধরবো? আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। আমি একটি সোফায় বসে পড়ি, সে মেঝেতে বসে।

তুমি মেঝেতে বসলে কেনো? আমি বলি।

আপনিও বসুন স্যার, সে বলে, আপনার ভালো লাগবে।

আমি মেঝেতে বসি, তার থেকে অনেকটা দূরে।

তুমি আবার আমাকে বিয়ে করতে পাগল হয়ে উঠবে না তো? আমি বলি।

না, সে বলে।

আমাকে সে আর স্যার বলছে না, আমি স্বস্তি পাচ্ছি।

তোমার কি মনে হবে না যে আমি তোমাকে শোষণ করেছি? আমি বলি।

না, আমি তো অনেক দিন ধরে মনে মনে চাচ্ছি, সে বলে।

শরীর অনেক দিন পর আমাকে মুগ্ধ করে, আমি একটি নতুন শরীর লাভ করতে থাকি; আমার খোলশ খসে পড়তে থাকে, নতুন হয়ে উঠতে থাকি আমি। এ-নতুনকেই আমি চেয়েছিলাম। তার শরীরের স্বভাব আমাকে বিস্মিত করে; তার ডান হাতের একটি আঙুল আমি খেলাচ্ছলে ছুঁই, তারপর দুটি-তিনটি আঙুল ছুঁই, দুবার আস্তে ঠোঁটে ঘষি, আর অমনি সে মাথাটি কাঁধের ওপর বাঁকা করে রেখে ঘুমিয়ে পড়ে; আমি তার মুখে আঙুলের টোকা দিয়ে চিবুক নেড়ে ঠোঁট টেনেও তার ঘুম ভাঙাতে পারি না। তাকে। ঘুরিয়ে আমি যেভাবেই রাখি ঘুমের মধ্যে সে সেভাবেই থাকে। সে এমন সম্মোহিত হলো কীভাবে? আমি তার একটি হাত ওপরের দিকে তুলে ধরি, হাতটি সেভাবেই থাকে; মুখটি আমি একটু ঘুরিয়ে দিই, সেভাবেই থাকে। এমন সম্মোহিত শরীর আমি কখনো দেখি নি। মেয়েরা নিষ্ক্রিয় আমি জানি, নারীবাদী দুটি নারীও আমি দেখেছি, তারাও স্বল্প সক্রিয়তার পর সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে; কিন্তু এ সম্পূর্ণ সমর্মাহিত। আমি এক এক করে তাকে বস্ত্র থেকে মুক্ত করে আনি, বিস্ময়কর সব দেহখণ্ড বেরিয়ে পড়তে থাকে। তার স্তন দুটি পর্যন্ত সম্মোহিত হয়ে আছে। আমি দুটিকে একে অন্যের সাথে মিলিয়ে দিই, তারা দুটি যমজ বোনের মতো মিলে

থাকে; আমি দুটিকে দূরতম দূরত্বে সরিয়ে দিই, তারা দূরবর্তী দ্বীপের মতো ভাসতে থাকে। আমি যদি শিশু হতাম। বিস্ময়কর এ-বস্তু দুটি নিয়ে বছরের পর বছর খেলতাম। আমি তাকে জাগানোর চেষ্টা করতে করতে ক্লান্ত ও উদ্দীপ্ত হয়ে পড়ি, সে কিছুতেই জাগে না; আমার মনে হতে থাকে পরম পুলকের আগে সে জাগবে না। তার একটি দীর্ঘ অঙ্কুর রয়েছে, আমার কড়ে আঙুলের সমান, গোলাপি আভা আছে তাতে, আর সেটিও সম্মোহিত। তার শরীরের যে-অংশ আমি গলাতে চাই, সেটুকুই গলতে থাকে; দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘ সময় কেটে যেতে থাকে, তিন ঘণ্টার মতো হবে, সে তখন সম্পূর্ণ গলে যায়, এবং এক সময় সে চিৎকার করে ওঠে।

আমি কোথায়? সে চিৎকার করে ওঠে।

আমার সামনে, আমি বলি।

নিজেকে সে সম্পূর্ণ নগ্ন দেখে একটু লজ্জা পায়, কিন্তু নিজেকে ঢাকার কোনো চেষ্টা করে না; আমার দিকে তাকিয়ে হাসে।

আমি মরে গিয়েছিলাম, সে বলে।

তিন ঘণ্টার ছোটো মৃত্যু, আমি বলি।

তিন ঘণ্টা?, সে ঝলমল করে ওঠে, আর বলে, এমন মৃত্যুই আমি চেয়েছি, কিন্তু ওই লোকটি তা বোঝে নি, তাই ভেঙে গেলো।

অনন্যা দু দিন ধরে ফোন করছে না, আমি উদ্বিগ্ন বোধ করছি; প্রতিটি কোষে আমি সময় বোধ করছি। আমার শরীরের ভেতর সময়ের কাটা ঘুরছে না স্থির হয়ে আছে? সময় আশ্চর্য ভারী জিনিশ। সবচেয়ে ভারী কী, কৃষ্ণ গহ্বর? একটি কৃষ্ণ গহ্বর আমার ওপর এসে পড়েছে। অনন্যা কি তাহলে খুব দূরে চলে গেছে? কেননা সে খুব দূরে যেতে চায়? আমি কিছুই তার কাছে জানতে চাই নি, সে বলতো না হয়তো। তার জন্যে আমি রক্তে এমন টান বোধ করি কেনো? আমার সহকারিণীটি একবার বলেছে, স্যার, আপনাকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। আমি কিছু বলি নি। আমি একবার বেরিয়ে পড়ি, একটা রিকশ নিই, রিকশ নিলে এখন আর কেউ কিছু মনে করে না, আমার ভালো লাগে, অনন্যাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হই, আমার বয়স হয়েছে, একটি চায়ের দোকানে ঢুকে চা খাই, আবার পথে দাঁড়াই। আমার ভালো। লাগে। তারপর অফিসে ফিরি।

বিকেলে ফিরোজা ফোন করে, তুমি কেমন আছো?

আমি বলি, ভালো।

ফিরোজা বলে, আমি ফিরে আসতে চাই।

আমি বলি, এভাবেই তো ভালো আছি।

ফিরোজার কান্নার শব্দ শুনতে পাই, আমি টেলিফোন রেখে দিই।

ফিরোজ কেনো ফিরে আসতে চায়? নৃতাত্ত্বিকটির সাথে কি তার মিল হচ্ছে না, না কি নৃতাত্ত্বিকটি এখন তরুণীতর নৃতত্ত্ব চর্চায় মন দিয়েছে? ফিরোজার জন্যে একটু সহানুভূতি হয়, কিন্তু আমি কোনো অভাব যন্ত্রণা বোধ করি না। অনন্যার জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে, অর্চির জন্যে কষ্ট হচ্ছে,-অর্চির প্লেন কি নেমেছে, ফিরোজার জন্যে হচ্ছে না, যদিও আমি চাচ্ছি তার জন্যেও আমার রক্তে কিছুটা কষ্ট দেখা দিক। আমি কি তাকে ফিরিয়ে নিতে পারি না? কেনো পারি না? নৃতাত্ত্বিকটির সাথে সে ঘুমিয়েছে বলে? তাতে কী হয়েছে? অন্যের সাথে ঘুমোলে মানুষ নষ্ট হয়ে যায়? যারা অন্যের সাথে ঘুমোয় না, তারা কি খাঁটি থাকে? আমি কি নষ্ট হয়ে গেছি, অন্যের সাথে আমি অনেক ঘুমিয়েছি। বলে? সন্ধ্যার দিকে দেখি ফিরোজা ফিরে এসেছে; একা আসে নি, সাথে তার আম্মা আর বোনও এসেছে। তাহলে সে ধরেই নিয়েছে সে অধিকার হারিয়ে ফেলেছে, একা। এলে অধিকার ফিরে পাবে না; কেউ তাকে অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। আমি বাইরে যাবো বলে ভেবেছিলাম, তারা আসায় আমি যেতে পারি না। ফিরোজা কাঁদছে দেখে। আমার খারাপ লাগে, কিন্তু তাকে কষ্ট বলা যায় না। তার বোন হাল্কা ভঙ্গিতে কথা বলছে যেনো কিছুই হয় নি।

ফিরোজাকে নিয়ে এলাম, তার বোন বলেন, ও খুব কষ্টে আছে।

আমি বলি, সে তত পৃথক থাকতে চায়।

তার বোন বলেন, ওটা ওর বিভ্রম, তুমি কিছু মনে কোরো না।

আমি বলি, আমাদের আর একসাথে থাকা সম্ভব নয়।

তার আম্মা বলেন, তোমার হাতে ধরছি, বাবা।

ফিরোজা বলে, তুমি কি আমাকে ঘেন্না করো।

আমি বলি, না।

ফিরোজা বলে, আমি তোমার কাছে ফিরে আসতে চাই।

আমি বলি, না।

আমরা চারজন বসে আছি, কথা বলছি না; ফিরোজার বোন কথা বলছিলেন, এখন তিনিও কথা বলছেন না; তবে তারা আরো দেখবেন, হয়তো সারারাত দেখবেন, তারপরও দেখার জন্যে আরো দিনরাত পড়ে থাকবে। আমি না-টিকে ফিরিয়ে নিতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না; ফিরোজার সাথে আমার বাঁশের সাঁকো ভেঙে গেছে, ওটি আবার আমি তৈরি করতে চাই না। আমি আর কোনো সাঁকোই তৈরি করতে চাই না, প্রথাগত সাঁকো তো নয়ই। স্বামী-স্ত্রী শব্দগুলো ঘিনঘিনে মনে হচ্ছে আমার কাছে, নিজেকে আমি আর স্বামী ভাবতে পারছি না কারো, কাউকে আমার স্ত্রী ভাবতে পারছি না। কাবিনের নোংরা কাগজে অনেক আগে আমি একবার সই করেছিলাম, তার কবল থেকে আমি বেরিয়ে পড়তে চাই। এমন সময়, সন্ধ্যে সাড়ে আটটা হবে, ফোন বেজে ওঠে।

এটা মাহবুব সাহেবের বাসা, মাহবুব সাহেবের বাসা? অন্য প্রান্ত থেকে এক মহিলা। আর্ত চিৎকার করছেন, কোথাও হয়তো আকাশ ভেঙে পড়েছে।

বলছি, আমি বলি, আমি মাহবুব বলছি।

আমি ডাক্তার তাহমিনা, তিনি আরো আর্ত চিৎকার করেন, আমি এলিফ্যান্ট রোডের মুক্তি ক্লিনিক থেকে বলছি।

বলুন, আমি বলি।

আপনি অনন্যা নামের কাউকে চেনেন? তিনি বলেন, আমি খুব বিপদে আছি।

কেনো? আমি বলি।

সে বিকেলে আমার ক্লিনিকে এমআর করানোর জন্যে এসেছিলো, তিনি বলেন, তার দেরি হয়ে গিয়েছিলো, তার আর জ্ঞান ফিরে আসে নি।

আমার টেলিফোন নম্বর কোথায় পেলেন? আমি বলি।

তার ব্যাগে একটি ফিজিক্সের বইয়ের ভেতর নাম আর নম্বর পেয়েছি, মহিলা কেঁদে ফেলেন, আমি তিন হাজার এম আর করেছি, আগে এমন আর হয় নি।

এ-নামের কাউকে আমি চিনি না, আমি বলি, এ-নামের কাউকে আমি চিনি না।

আমি টেলিফোন রেখে দিই। অনন্যা নামের কাউকে আমি চিনি না।

আমি স্তব্ধ হয়ে চেয়ারে বসি, অনন্যা নামের কাউকে আমি চিনি না। আমার ঘেন্না লাগতে থাকে, ওরা তিনজনই আমার সাথে কথা বলতে চায়, কী যেনো বলে, আমি শুনতে পাই না। আমার ঘেন্না লাগতে থাকে। আমি কোনো কথা বলি না, ওরা তিনজন আমাকে কী বলছে আমি শুনতে পাই না। ওরা আর কথা বলছে না মনে হয়, হয়তো ভয় পেয়ে গেছে। আমি অনন্যা নামের কাউকে চিনি না। দশটা বাজলো মনে হয়, ঘড়িটা থামছে না, সারা পৃথিবীতে ঘড়িটা দশটা বাজার সংবাদ পৌঁছে দেবে মনে হচ্ছে। আমি একটি পায়ের পাতা দেখতে পাই, পায়ের পাতার নিচে ঘাস সোনালি হয়ে উঠছে। আমার বুক খুব ভারী হয়ে উঠছে। আমি অনন্যা নামের কাউকে চিনি না। এগারোটা বাজলো, ওরা তিনজন আমার সামনে বসে আছে, খুব গুরুত্বপূর্ণ কী যেনো বলতে চাচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি না। বারোটা বাজলো, ঘড়িটা সারা সৌরজগতে বারোটা বাজার শব্দ পৌঁছে দেয়ার পণ করেছে। একটা বাজে; কার জন্যে বাজে?–আমি আর বসে থাকতে পারছি না, আমি উঠে দাঁড়াই, দরোজা খুলে বাইরে বেরোই। আমি রাস্তার দিকে হাঁটতে থাকি, এলিফ্যান্ট রোড আমি চিনি, এলিফ্যান্ট রোডের দিকে হাঁটতে থাকি। এখন কটা বাজে আমি জানি না। আমি চৌরাস্তায় এসে দাঁড়াই। মহিলা কোন ক্লিনিকের নাম যেনো বলেছিলো? মডার্ন, নবজীবন, আরোগ্য, আবেহায়াত? আমি কোনো নাম মনে করতে পারছি না। কতো নম্বর এলিফ্যান্ট রোডঃ ১০, না ১০০, না ১০০০? আমি মনে করতে পারছি না। আমি প্রতিটি দালানের দরোজায় দরোজায় যেতে থাকি, প্রত্যেকটি দরোজা বন্ধ; আমি নাম পড়তে চাই, কোনো নাম পড়তে পারি না। আমি দরোজা থেকে দরোজায় দৌড়ে যেতে থাকি, চিৎকার করতে থাকি নাম ধরে, কোনো দরোজা খোলে না। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না, চারদিকে প্রচণ্ড অন্ধকার নামছে। আমার সামনে একটি দালান ভেঙে পড়ছে আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি দৌড়ে অন্য

দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছি, একটির পর একটি দালান ভেঙে পড়ছে; ওপাশের দালানগুলো ভেঙে পড়ছে, এপাশের দালানগুলো ভেঙে পড়ছে, সামনের দালানগুলো ভেঙে পড়ছে, পেছনের দালানগুলো ভেঙে পড়ছে, মহাজগত জুড়ে ভেঙে পড়ার শব্দ। হচ্ছে; আমি ভাঙা দালানের ভেতর দিয়ে ছুটছি, দালানের পর দালান ভেঙে পড়ছে, শহর ভেঙে পড়ছে, আমি অন্ধকারে ভেঙে পড়া দালানের পর দালানের ভেতর দিয়ে ছুটছি, কী যেনো খুঁজছি, আমার চারদিকে দালান ভেঙে পড়ছে, শহর ভেঙে পড়ছে, সব কিছু ভেঙে পড়ছে।